

মুক্তাভস্ম

প্রাণতোষ ঘটক

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ দশহরা ১৩৬২

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ফ্যান্সী প্রিন্টিং কোম্পানী

বাঁধাই
এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর করকমলে

এই লেখকের :

আকাশ পাতাল—দুই খণ্ডে (উপন্যাস)
বাসক সজ্জিকা (গল্প সঙ্কলন)
বাসিফুলের মালা (উপন্যাস)
ভুয়া ভুঁইয়া (উপন্যাস)
রত্নমালা (সমার্থাভিধান)
কলকাতার পথঘাট (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)

গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত চন্দনপুরের সীমানা।

ওধারে কোম্পানীর সেই সেকেলে রেল লাইন। শাড়ীর পাড়ের মত দু'জোড়া লাইন এঁকে বেঁকে চলে গেছে যেদিকে কলকাতা সেদিকে। চন্দনপুরে শহরের গন্ধ পাওয়া যায়, চন্দনধামের বিশালাকৃতি ল্যাণ্ডো যখন পথের ধূলো উড়িয়ে যাওয়া আসা করে, ডায়নামোর আলো যখন সন্ধ্যাশেষে জ্ব'লে ওঠে চন্দনধামের সদর-মহলের হলগুলোয়; অল্-ওয়েভ রেডিও যখন বিদেশিনীদের গীতিমাল্য শোনাতে থাকে মধ্য-রাত্রে, তখন।

একশো বিঘা জায়গা জুড়ে চন্দনধাম।

জমিদারবাবুদের বাস্তগৃহ। ত্রিশ বিঘা বাস্ত, সত্তর বিঘা জমি-জায়গা। ফুল-বাগান, কুঞ্জবন, সায়র-দীঘি, ঝিল। চন্দনধামের শাখা উপশাখা হালের, সাবেককালের নামটির কিন্তু অক্ষয়-প্রাপ্তি হয়েছে। চন্দনধামের ফটকের পাশে শ্বেত-পাথরের 'পরে কৃষ্ণকায় অক্ষরগুলি কালের গ্রাসে চ'টে গেলেও, পুরাণো ক্ষত-চিহ্নের মত বেশ চোখে পড়ে। দূর থেকে নয়, কাছাকাছি এগোলে বাঙলা অক্ষর নজরে পড়ে। দেখা যায়, বোঝা যায়, পাঠোদ্ধার করা যায়—লেখা আছে 'চন্দনধাম' নাম।

চন্দনধামের ছাদে উঠলে কাছে দূরে অন্য কারও ইটের ইমারত দৃষ্টি-গোচরই হয় না, সে-আনন্দে বাবুদের বুক সদাই যেন দশহাত হয়ে আছে। বাবুদের গর্ব্ব-স্ফীত বক্ষ কে না দেখেছে! আর দেখে কে না ভয় পেয়েছে!

বিগত মহাযুদ্ধের মেশোপটামিয়া ফেরৎ যোদ্ধা দিলবাহাদুর।

ফটকের সামনে বসে থাকে ছোট একটি তিনপায়া টুলের ওপর।

ফাঁকা দোনলাটায় মরচে ধরেছে বটে, দিলবাহাদুর সেটাকে সগর্ব্বে উঁচিয়ে ধরে, যখন বাবুদের কেউ যাওয়া আসা করেন। আসেন কিংবা যান। কাক তাড়িয়েই আনন্দ পায় দিলবাহাদুর, পল্লীর শিশুদের ভয় দেখায়। একটা কাঠ-বিড়ালীকে পর্য্যন্ত চন্দনধামের চতুঃসীমানার মধ্যে পা দিতে দেয় না।

ছাদে উঠলে আর কারও কোঠা বাড়ী চোখে পড়ে না, সেই আনন্দেই আত্মহারা বাবুরা। রাস্তায় পা দিলে চলন্ত পথিক পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ায়। প্রতিবেশী নত হয়ে আদব জানায়, দোকানী বিক্রী রেখে উঠে দাঁড়ায় সসঙ্কোচে—বুক ফুলে ওঠে জমিদারবাবুদের। পথে যেতে যেতে ফরাস-ডাঙ্গার নরুণ-পাড় কোঁচানো ধুতির কোঁচা ইচ্ছাকৃত লোটাতে থাকে মাটিতে, পথের ধূলোতে।

যদিও জমিদারবাবুদের মধ্যে আবার সিকি পয়সারও সরিক আছে। ভাগে পড়বে হয়তো ক'খানা ইট—তবুও প্রত্যেকের নামান্তে 'জমিদার' লেখা চাই। বাবুদের একরত্তি ছেলেগুলো পর্য্যন্ত সেলাম চায় দিলবাহাদুরের কাছে।

সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবুও ষাট বছরের গৃহকর্ত্তার স্নানের জলে চন্দনের তাল ঢালতে হয়। গামছায় আতর। পানীয় জলে কেওড়ার নির্য্যাস। কথায় কথায় মাথায় গোলাপ জল।

গৃহকর্ত্তার রূপটি অপূর্ব্ব। কে বলবে কর্ত্তা ষাটে পা দিয়েছেন।

সায়েবদের মত রঙ, ঈষৎ কুঁজো হ'য়ে পড়েছেন। চুলে কলপ দিতে হয় এই যা দুঃখ। গৃহকর্ত্তার রূপের মত নামটিও অপরূপ। কর্ত্তার নাম কে না জানে, ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত। সরকারী আমন্ত্রণের

সম্মানী অতিথিদের লিষ্টিতে লেখা আছে চন্দনপুরের জমিদার-কর্ত্তা অনঙ্গমোহনেরও নাম।

মাননীয় অনঙ্গমোহন মুখার্জ্জী।

বাবুদের সামাজিক স্থানও সর্ব্বোচ্চ। জাতে যে তাঁরা জাতিশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। জাতের গুরু,কিন্তু পেটে বোমা মারলেও অনেকে নিজের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারবেন না, তবুও বাবুরা ব্রাহ্মণ্। শুদ্ধ উপবীতের খাতিরে সমাজ-শীর্ষে বাবুদের আসন। বিয়ের বাজারে বাবুদের ছেলেদের চড়া মূল্য!

অনঙ্গমোহনই শুধু লেখা-পড়া জানা, কেতাদুরস্ত।

সায়েব-সুবোর সঙ্গে এককালে মেলামেশা করেছেন খুব বেশী। বিদ্যালয়ে পাঠ নেননি কখনও, শুধু দেখে আর ঠেকে শিখেছেন। এককালে অনঙ্গমোহন ছিলেন সাতটা লজের সভ্য। বিলেতী ঠাট ও ঠমক আয়ত্ত করতে হয়েছিল পাকেচক্রে প'ড়ে। ধূতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, স্যুট ধরেছিলেন। পাদুকার বদলে সু-জুতো। একেক হপ্তায় ক'দিন ক'রাত্রি থাকতেন কলকাতায়। শহর কলকাতার চন্দনধামে। মাসের মধ্যে পনেরো দিন কলকাতায় যেতে হ'ত, তাই খুশীমত আর পছন্দ মাফিক বানিয়েছিলেন কলকাতার গৃহ—চৌরঙ্গীর এক অঞ্চলে। পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানার কাছাকাছি কোথায়।

সাতকালে গিয়ে এককালে ঠেকলে কি হবে এখনও অনঙ্গমোহনের জন্য আছে ডিনার ও লঞ্চের ব্যবস্থা। চপ, কাটলেট, ফ্রাই। পাঁউরুটি আর মাখন। ব্রেড এণ্ড বাটার। মনে-প্রাণে সায়েব হ'লে কি হবে, সময়ের কোন জ্ঞান নেই অনঙ্গমোহনের। মোটেই পাঙ্কচুয়াল নন। জমিদার, তাই ঘড়ির তোয়াক্কা করেন না। এখনও বেলা দশটায় ঘুম থেকে ওঠেন, বারোটায় ব্রেকফাষ্ট্ বা প্রাতরাশ খান আর সূর্য্যাস্তের সময় লঞ্চে বসেন। তারপর দিবানিদ্রা কিছুক্ষণ।

ওঠেন রাত্রি ঘন হয় যখন।

ঘরে ঘরে যখন ডায়নামোর আলো জ্বলে। রঙীন বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠনের মধ্যে জ্বলে বিজলী আলোর বালব্।

দিবানিদ্রা শেষে অনঙ্গমোহন তাঁর ঘরের সমুখের দরদালানে গিয়ে বসেন। আজকেও ঘুমন্ত দু'চোখে আঙুল চালাতে চালাতে অভ্যাসানুযায়ী দরদালানটিতে বসতে যাবেন এমন সময় বার-বাড়ীর হলঘরগুলো চোখে পড়লো তাঁর, যখন চোখ থেকে হাত নামালেন।

দরদালানের উন্মুক্ত জানালা থেকে দেখলেন দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে। ভুল দেখলেন না তো অনঙ্গমোহন? বয়স যে ষাটের কোঠায়।

সদরের হলগুলোয় এত আলো কেন?

অনঙ্গমোহনের মিহি ও কম্পিত কণ্ঠে কথা ফুটে উঠলো। বললেন, —বারবাড়ীতে আজকে কি হচ্ছে শ্যামাপদ? এত আলো কেন? ডায়নামোটা যদি ফেল্ করে! কি মুশকিলেই না পড়তে হবে তখন! শ্যামা কথা কও না কেন?

—কি বলবো হুজুর? আমাদের মুখে ওসব কথা শোভা পায় না। আমরা হুজুর চাকর, চাকরই থাকি।

স্থির দৃষ্টিতে আরেকবার দেখলেন অনঙ্গমোহন সদর মহলের আলোক-উজ্জ্বল বাতায়নসমূহ। লাল ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে জানলা দরজায়।

অনঙ্গমোহন যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ভাঙ্গা গলায় বললেন, —আমার কাছে কথা চাপছো শ্যামাপদ? তোমার তো সাহস বড় কম নয়! হল-ঘরের দরজার চাবি দিলে কে? ঘর খোলার পারমিশনই বা কে দিয়েছে!

শ্যামাপদ নিরুপায়! কি বলবে সে! বললে,—কথা কি আর আপনার কাছে চাপা থাকবে? আমাদের ছোটমুখে কি বড় কথা শোভা পায় হুজুর?

—শ্যামাপদ! ধমকে উঠলেন অনঙ্গমোহন। সজোরে। বললেন,—যা জানো তাই বল' না তুমি! কথার এত ঘোরপ্যাঁচ করছো কেন?

—কলকাতা থেকে হুজুর বাইজী আসছে। নাচ-গান হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলি কোন রকমে বলে ফেললে শ্যামাপদ। কথা শেষ করেই ত্যাগ করলো দরদালান।

অনঙ্গমোহনের কপালে রেখা ফুটলো।

নিমেষের মধ্যে যেন কত দুশ্চিন্তা অনঙ্গমোহনের মন আর মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে তুললো। ঈষৎ কুঁজো হয়ে পড়লেন অনঙ্গমোহন। তারপর ক্ষিপ্র গতিতে দরদালান থেকে ঘরে চ'লে গেলেন। আলো ঝলমল ঐ সদর মহল যেন তার চোখের দৃষ্টিকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।

—বাইজী আসছে কলকাতা থেকে? মাইফেল চলবে বুঝি?

নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন অনঙ্গমোহন। স্বগত করলেন,—উনুনে হাঁড়ি চড়ছে না, ঘরের মেয়ে-বৌয়ের অঙ্গে ছিন্নবাস, তবুও এখনও কলকাতা থেকে বাইজি আসবে? শ্যামা! শ্যামা! শ্যামাপদ গেলে কোথায়?

আশপাশের কোন্ ঘর থেকে সাড়া দেয় শ্যামাপদ। বলে,—কোথাও যাইনি হুজুর, আপনার চায়ে দুধ ঢালছি। পাঁউরুটিতে মাখন মাখাচ্ছি। টোষ্ট্ বানাচ্ছি।

আরাম-কেদারার ফর্সা গদীতে দেহ এলিয়ে দিলেন অনঙ্গমোহন।

নিজেকে যেন তাঁর এই প্রথম মনে হয়েছে যে তিনি কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি, সদরের হল-ঘরের দরজা খুললো,

অথচ তাঁর অনুমতি চাইলো না কেউ ? কাছারীর নায়েব ক'টারও মনে পড়লো না এই অসামান্য বিষয়টা! ক্ষীণ কণ্ঠ হ'লে কি হবে, আবার গর্জ্জে উঠলেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—শ্যামা, শ্যামা!

ডাক কানে পৌছতে না পৌছতে সান্ধ্য-ভোজনের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলো শ্যামাপদ। বললে,—অহেতুক চেঁচাবেন না হুজুর। শরীরটা আপনার আগের মত আছে কি যে এত চেঁচামেচি সহ্য হবে!

সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গমোহনের কণ্ঠ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। বললেন,—শ্যামা, ফটকের পাহারাওলাটাকে একবার ডাকতে পারিস ? তোদের ঐ বুড়ো দিল্‌বাহাদুরকে ?

আরাম-কেদারার পাশেই অনঙ্গমোহনের টেবিল।

কি আছে আর কি যে নেই এই টেবিলে। বিগত কয়েক মাসের ষ্টেটসম্যান পত্রিকা। চিঠি লেখার টেবিল-সরঞ্জাম। সোডার শূন্য বোতল ক'গণ্ডা। লজের মেনু। জামা-কাপড়ের ইস্ত্রী। হেজলিন স্নো, বেবী জন্‌শন পাউডার, জবাকুসুম তেলের শিশি। লালেবাই সাবানের বাক্স। ছুরি, কাঁচি, আলপিন, ক্লিপ। আরও কত কি!

শ্যামাপদ বুঝেছিল তার প্রভুর মনের কথা। বললে,—দিল্‌বাহাদুরকে আর কেন হুজুর ?

অনঙ্গমোহন বললেন,—দিল্‌বাহাদুরকে বলতাম যে ঐ নায়েব ক'টাকে দূর ক'রে দেবে কাছারী থেকে। কি করতে আছে ওরা ? নাচগানের টাকা জোগাচ্ছে কে ?

নীরব শ্যামাপদ। সে কি বলবে! কি জানে সে!

প্রথম রাত্রির স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়ার বেগে ঘরের ঝুলন্ত আলোগুলি দুলছে। জানলার পর্দ্দা ক'টাও দুলছে। চায়ের পেয়ালায় চামচ চালাতে লাগলেন অনঙ্গমোহন। এলানো দেহ তুলে সোজা হয়ে কখন বসেছেন

ইতিমধ্যে। উত্তেজনার ছায়া যেন তাঁর চোখে মুখে। দেহের শুভ্র বর্ণ কিঞ্চিৎ লাল হয়ে উঠেছে।

চায়ের পেয়ালায় চামচ-চালনা হঠাৎ বন্ধ করলেন অনঙ্গমোহন।

কে কোথায় কাঁদে! কান্নার স্বর শুনলেন কি তিনি! কে কাঁদলো কে! নারীকণ্ঠের ক্রন্দন না! অনঙ্গমোহন ভেবেছিলেন তার কর্ণেন্দ্রিয় হয়তো বিকল হয়ে গেছে। হয়তো ভুল শুনেছেন।

সেই কান্নার স্বর, ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়।

কোন্ নারী-কণ্ঠের চাপা কান্নার স্বর অনঙ্গমোহনের দিকে যেন এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে কথা বললেন।

—কে কাঁদছে শ্যামাপদ? কাঁদছে না কে?

—তাইতো শুনছি। অদূরে যেন কে কাঁদছে।

ভুল শুনেছেন কি অনঙ্গমোহন! চায়ের উষ্ণ পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিলেন। চা না খেয়ে আর বুঝি থাকতে পারছেন না। মন খিঁচড়ে আছে। মাথা ব্যথা করছে।

এমন সময় রুক্ষকেশ, স্খলিতবেশ কে এক নারী অশ্রুসজল চোখে ঘরে ঢুকেই অনঙ্গমোহনের পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো। দস্তুরমত চমকে উঠেছিলেন অনঙ্গমোহন। হাতের কাচের পেয়ালাটা আরেকটুর জন্য বেঁচে গেছে, নয়তো হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো।

—কে?

—জ্যাঠামশাই. আপনি বেঁচে থাকতে আমার এমন হবে?

ক্রন্দনরতা নারী কথা বললে কান্নার স্বরেই।

অনঙ্গমোহন কাঁপতে কাঁপতে শ্যামাপদকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন,

—কে ?

—সেজবাবুর পুত্রবধূ। ছোট বৌমা। আপনাদের কল্যাণী।

—কল্যাণী ? ছোট বৌমা ?

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রেখে কেদারা থেকে উঠে পড়লেন অনঙ্গমোহন। একেই তাঁর শরীর ন্যুব্জ-কুব্জ, মেঝেয় লুটিয়ে-পড়া বধূটিকে আরও আনত হয়ে দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কল্যাণীর মুখ দেখা যায় না। পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। রুক্ষ এলো চুলের বোঝা তার পিঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কল্যাণী।

—কি হয়েছে কি ? প্রশ্ন করলেন অনঙ্গমোহন।

শ্যামাপদ ঘরের বাইরে ছিল। বললে,—নাচ্‌গানের টাকা জোগাচ্ছে কে জানতে চাইছিলেন না হুজুর ? বোধহয় সেই সকল ঘটনারই কিছু একটা ঘটেছে।

অনঙ্গমোহন ধমকে উঠলেন,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস শ্যামাপদ ? ছোট বৌমাকে ওঠা, উঠিয়ে বসা। আমার কি আর সে সাধ্য আছে যে—

—ছোটবৌমা, কেঁদে কি হবে ? উঠে ব'স তুমি। কি হয়েছে খুলে বলো হুজুরকে।

শ্যামাপদ ভৃত্য ! সে কি ধ'রে তুলতে পারে কোন গৃহবধূকে !

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠে বসলো। মুখের 'পরে নেমে-আসা এলো চুলের রাশি সরিয়ে ফেললো। শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললে, —জ্যাঠামশাই, উনি আমার গা থেকে গয়না চেয়েছিলেন। আমি দিতে চাইনি তাই চাবুক দিয়ে মেরেছেন আমাকে। এই দেখুন—আমার সর্ব্বাঙ্গে তার চিহ্ন। গলা থেকে হার ছিঁড়ে নিয়ে গেছেন। টানাটানিতে কতখানি কেটেছে দেখুন।

কথা বলতে বলতে চিবুক তুললো কল্যাণী।

রক্তের রাঙা চিহ্ন দেখলেন অনঙ্গমোহন। কল্যাণীর বাহুতে চাবুকের আঁকাবাঁকা ক্ষতচিহ্ন। শিউরে উঠলেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—ইস্, মেরে ফেলেছে বৌটাকে! ওঠ মা, ওঠ তুমি। আমার তো কিছু করবার নেই। শরিক কখনও শরিককে শাসন করতে পারে!

—আমরা কাকে বলবো জ্যাঠামশাই?

কাতরকণ্ঠে কথা বললে কল্যাণী। মাথায় ঘোমটা তুলতে তুলতে।

অনঙ্গমোহনের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাজা রক্ত দেখে। যেন আলতা মেখেছে বৌটা!

পরণের কাপড়খানার বহু জায়গায় শোণিতরেখা। কল্যাণীর চোখে নিরাশ দৃষ্টি, মুখাকৃতিতে হতাশা। কান্নার আবেগে লাজলজ্জার বালাই ঘুচে গেছে। সেমিজের বোতামগুলো খোলা—জামাটিকে কে যেন টেনে হিঁচড়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। বাধা দিয়েছিল কল্যাণী। প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। দেহে প্রাণ থাকতে কিছুতেই নিতে দেবে না আর একটি গয়নাও। অনেক দিয়েছে সে এতদিনে। প্রায় সর্ব্বস্বই দিয়েছে। মুখের কথায় কোন কাজ হয়নি। কাকুতি মিনতি করেছিল প্রথমে। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারেনি, মুখ ছুটিয়েছিল। স্বামীর মুখের ওপর কথা বলেছিল। তখন অদম্য অপমানে স্বামী তার গায়ে হাত তুলেছিল। শক্তি প্রয়োগ করেছিল। গায়ে যত জোর আছে। স্বামীর জুলুমই শেষে জয়ী হয়েছিল। হাতের ক'গাছি চুড়ি খুলে নিয়েছিল স্বামী। গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছিল এক টানে।

ভয়ার্ত্ত-চোখ অনঙ্গমোহনের।

গৃহের এক বংশধরের কুকীর্ত্তি দেখতে দেখতে চক্ষু মুদিত ক'রে ফেললেন,—উঠে পড় বৌমা। কাঁদতে নেই, ছিঃ! স্বামীর দুর্নাম

ছড়িয়ে পড়বে তুমি যদি ভেঙ্গে পড়' এমন! লোকে যে গায়ে থুথু দেবে! আমি যে মা আজ হাত-পা বাঁধা।

—জানতে কি কারও বাকী আছে জ্যাঠামশাই। এ বাড়ীর ছেলেদের কে না চেনে! রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দেয় কল্যাণী। পরণের শাড়ী ঠিকঠাক করতে করতে উঠে পড়ে।

অনঙ্গমোহন কম্পিতকণ্ঠে ডাকেন,—শ্যাম, শ্যাম, শ্যামা! শ্যামাপদ!

কোথায় চলে গেছে শ্যামাপদ। হয়তো চোখে দেখতে পারেনি এই কুকীর্ত্তি। এই মারাধরা। এই রক্তপাত।

নিষ্ফল আক্রোশে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কল্যাণী।

গলার ক্ষতে আঁচল চেপে ধ'রে কি সব বকতে বকতে বেরিয়ে যায়। অনঙ্গমোহন বললেন,—বৌমা, শুনে যাও।

ফিরে দাঁড়ালো কল্যাণী!

ক্রোধ আর বিদ্বেষের আধিক্যে ওষ্ঠাধর তার থরথরিয়ে কাঁপছে। রাঙা ঠোঁট কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

অনঙ্গমোহন বললেন,—বৌমা শ্যামাপদকে বল এই মুহূর্ত্তে যেন টিনচার আইডিন বুলিয়ে দেয়। নয়তো যদি বিষিয়ে যায়!

—যাক্ বিষিয়ে! বললো কল্যাণী। যে পথে এগিয়েছিল পুনরায় চললো সেদিকে। বললে,—আর আইডিন দিয়ে কাজ নেই! বিষিয়ে যেতে বাকী আছে কিছু?

কল্যাণীর সব ক'টি কথাই কানে পৌঁছেছিল অনঙ্গমোহনের। তিনি শুধু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—শ্যামাটা যখন তখন কোথায় যে পালিয়ে যায়।

অন্দরের অন্ধকারে বিলীয়মান-হয় কল্যাণী।

ভয় পেয়েছে সে। কিসের যেন ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছে। এত ঘন অন্ধকার, তবুও যেন দৃকপাত নেই। হঠাৎ কি একটি ভয়ের

কথা মনে জেগেছে কল্যাণীর। ভয় আর ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছে ক্ষণিকের মধ্যে।

নিজের ঘর উন্মুক্ত রেখে নালিশ জানাতে এসেছিল বৌ।

আবার যদি তিনি আসেন! এসে ঘর খোলা পেয়ে স্বামী যদি আলমারীটাই ভেঙ্গে খুলে ফেলেন! সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাবে তা হ'লে কল্যাণী। সব ঘুচে যাবে তার, যা আছে তাও যাবে। আর কিই-বা আছে! মাত্র ক'খানা গয়না। তাও যদি যায়।

গয়না না নিয়ে যদি থানকতক বেনারসী শাড়ীই টেনে নিয়ে যান তিনি! যত ভাবে তত ভয় পায় কল্যাণী। যত ভয় পায় তত দ্রুত ছুটতে থাকে। ঘর যে খুলে হাট ক'রে রেখে এসেছে সে। ঘরে ছেলেটা আছে, কিন্তু সেও নেহাতই শিশু। তার মুখে কথা ফোটেনি এখনও। ব্যাপার দেখে সেই শিশুও ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

কতক্ষণ ধ'রে নিজেকে সামলেছেন অনঙ্গমোহন।

দেখেশুনে শরীরটা তাঁর ঠকঠকিয়ে কাঁপছে এখনও। আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়েছেন ফের। কাপের চা ওদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গৃহের একটি বধূ এসে তাঁকে নালিশ জানিয়ে গেল, দেখিয়ে গেল দেহে তাজা রক্তের ধারা বইছে—তবুও তিনি কিছু করতে পারলেন না। নির্ব্বাক দর্শক হয়েই রইলেন?

অপমানের লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে আছেন অনঙ্গমোহন! কি করতে পারেন তিনি! কল্যাণীর স্বামী রাসমোহন যদি তাঁকে অপমান করে একবাড়ী লোকের সমুখে, তখন? কোন্ অধিকারে প্রতিকার করতে যাবেন? অনধিকার-চর্চ্চা করতে গিয়ে এই বৃদ্ধবয়সে কি তিনিও মার

খাবেন! তার ওপর কল্যাণীর স্বামী রাসমোহনটা এমনিতেই মারমুখো হয়েই আছে। রুক্ষ মেজাজ তার। পান থেকে চূণ খসতে দেয় না!

—দাদু, চকোলেত খাবো।

মুদিতচক্ষে কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। হঠাৎ শিশুকণ্ঠ শুনে চমকে উঠলেন। চোখ খুললেন।

—কে দাদু? এসো, ভাই এসো।

—চকোলেত খাবো। চকোলেত দাও।

একটি শিশুর আধো আধো বুলি। অনঙ্গমোহন শিশুটির হাত ধ'রে কাছে টেনে নিলেন। কেমন লজ্জা পেয়ে বললেন,—চকোলেট তো নেই ভাই। তুমি বরং মিছরী খাও এক টুকরো। কেমন?

শিশু রাজী হ'ল না। মুখে বিকার ফুটলো তার। বললে,—না। চকোলেত দাও।

—ছিঃ খোকা! দাদুকে বিরক্ত করে না। দাদু যা বলছেন তাই খাও। মিছরী খাও।

শিশুর পিছু পিছু হয়তো এসেছিল শিশুর জননী। কাছাকাছি ছিল কোথায়। ছেলের বায়না দেখে যেন কথা বললে। কথার শেষে ঘরের দরজায় দেখা দিলো।

অনঙ্গমোহন দৃষ্টি ফিরিয়ে একবার দেখে বললেন—কে? মালতী বৌমা?

—হ্যাঁ। আপনি চা খেলেন না? মাথার গুণ্ঠন ঈষৎ টেনে দিয়ে বললে মালতী।

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো যে যেমনকার চা এখনও তেমনিই পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হয়তো। মাখন-মাখানো পাঁউরুটির টোষ্ট কখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

গৃহের অন্য এক বধূ মালতী।

নামটি তার আকারে ছোট করে নিয়েছেন শ্বশুরকুল, নয়তো নামটি আরও দীর্ঘ। শুধু মালতী নয়, মধুমালতী। সান্ধ্য-বাতাসে মধুমালতীর নীলাম্বরী শাড়ীর প্রান্তভাগ উড়তে থাকে। গুণ্ঠন থাকে না মাথায়।

—ঐ শিশিটা থেকে এক টুকরো মিছরী ওকে দাও মালতী মা।

টেবিলের উপরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলেন অনঙ্গমোহন। সঠিক দেখিয়ে দিলেন কোন্ শিশিটা। আরও অনেক শিশি আছে যে। মিছরী না দিয়ে ভুল ক'রে যদি ফটকিরিই এক টুকরো দিয়ে দেয়!

কথার শেষে চায়ের পেয়ালা মুখে তুললেন অনঙ্গমোহন।

এক চুমুকে শেষ করে ফেললেন কাপটা! মিছরীর শিশির ঢাকা খুলতে খুলতে মধুমালতী বললেন,—টোষ্ট্ মুখে তুললেন না জ্যাঠামণি?

—না মা। মুখে উঠলো না। রুচলো না। ও টোষ্ট তুমিই খেয়ে নাও আজ। কথায় মিনতি মাখিয়ে বললেন অনঙ্গমোহন।

অপ্রস্তুত হয় মধুমালতী। লজ্জার ক্ষীণ রেখা দেখা দেয় মধুমালতীর পান-খাওয়া লাল ঠোঁটের ফাঁকে। বলে,—নাঃ। আপনি খেলেন না, আমি ওগুলো খাবো!

—তাতে দোষ নেই। বললেন অনঙ্গমোহন।

ঈষৎ লজ্জানত হয়ে রেকাবী থেকে মাখন-মাখানো পাঁউরুটির ফালি দুটো তুলে নেয় মধুমালতী। সেই কখন বেলা একটায় ভাত খেয়েছিল, তারপর এখনও পর্য্যন্ত এক কাপ চা পর্য্যন্ত খেতে পায়নি।

ঘরে চা আছে। দুধও আছে। চিনি নেই।

মধুমালতীর দেরাজের হাত-বাক্সে যে ক'টা পয়সা আছে সে ক'টা তার শিশুপুত্রের মাথায় ছোঁয়ানো। মানতের পয়সা। খোকার জর-জ্বালায় কবে মেনেছিল মধুমালতী।

কত লোক বর্ম্মা চুরুট খায়, কিন্তু সত্যিকার বর্ম্মার চুরুট কজন আর খায়? অনঙ্গমোহন দাঁতের-ফাঁকে-ধরা চুরুটে দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে বললেন,—রাসমোহনের কাণ্ডটা দেখলে মালতী মা? রক্তারক্তি করলে এতগুলো চোখের সামনে?

পাঁউরুটির টোষ্ট চিবোতে চিবোতেই কথা বলে মধুমালতী। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠের কথা। বলে,—আপনি যেন জ্যাঠামণি ওপর-পড়া হয়ে কিছু বলতে যাবেন না! মান-সম্মান থাকবে না। তা বলে রাখছি।

অনঙ্গমোহন এখনও সত্যিকার বর্ম্মা চুরুট ছাড়া মুখে তোলেন না। কলকাতায় রাধাবাজারের কাছাকাছি কোন দোকান থেকে প্রতি মাসে আনিয়ে নেন। আজে বাজে নয়, একেবারে খাঁটি জিনিষ।

কি অপূর্ব্ব এক গন্ধ ছড়ালো ঘরময়।

চুরুটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দেওয়ার পর অনর্গল ধুম্র উদ্গীরণ করতে করতে বললেন,—সে কথা তুমি আমাকে বলে দেবে বৌমা? আমি এ বাড়ীর বয়োঃজ্যেষ্ঠ হ'লে কি হবে, মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলাম, যখন রাসমোহনের স্ত্রী এসে এই তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানে আছড়ে পড়লো! রাসমোহনের কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না এখনও?

মধুমালতীর ক্ষুধায় কাতর শুষ্ককণ্ঠ কথা বলে,—হোক্, না হোক, আপনি কোন কথা বলবেন না। শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

অনঙ্গমোহন শুধোলেন,—তোমার পতি দেবতাটি কোথায়? সদরের জলসায় নাকি? মাইফেলের আড্ডায় না কি?

লজ্জা না ঘৃণা, শঙ্কা না সঙ্কোচে নিশ্চুপ হয়ে গেল মধুমালতী। টেবিলের ওপর থেকে জলের গেলাস তুলে নিলো মুখে। পাঁউরুটি গলা দিয়ে নামছে না যে। ক্ষুধায় কাতর শুষ্ককণ্ঠ মধুমালতীর। জলের পাত্রটি শূন্য হয়ে

গেছে কয়েক মুহূর্ত্তে। ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিল বৌ। মুখ ফুটে কিছু বলে না, নয়তো ক্ষুধায় সত্যিই জ্বলছিল জঠর।

সেই কখন বেলা একটায় দু'মুঠো ভাত খেয়েছে, তবুও দেখলে কে বলবে যে মধুমালতীর বুকে ক্ষুধার জ্বালা! মুখ দেখলে কে বলবে যে হাতও তার শূন্য। তবুও এখনও কথায় কথায় হাসির ঝিলিক ছোটে মধুমালতীর পানরাঙা মুখে।

সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর রেখা।

কপালে গুঁড়ো সিঁদুরের টিপ। তাম্বুলরাগারক্ত অধর। লাল পাড় তাঁতের পাৎলা সাদা শাড়ী। লাল শালুর ব্লাউজ। পায়ে আলতা।

সোনার মত রঙ মধুমালতীর, এতই উজল।

টানা টানা ঘন কালো চোখ। উন্নত নাসা।

ঘরের বিজলী আলোয় মধুমালতীর নোজ-জুয়েলটাও ঝিলিক তুলছে যখন তখন। ছোট্ট একটি হীরে। তবুও ব্যবহারম্লান।

—কথা কইলে না মালতীমা? চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কথা বললেন অনঙ্গমোহন।

অনেক দুঃখে কথা বললে মধুমালতী। বললে,—আজকাল হপ্তায় কদিনই বা তিনি বাড়ীতে থাকেন!

—কেন? বিস্মিত কণ্ঠ অনঙ্গমোহনের!—তাই না কি?

—হ্যাঁ। বললে মধুমালতী। বেশ দীপ্তকণ্ঠেই বললে। কোন কিছু গোপন না করেই বললে।

—একেবারেই জাহান্নমে গেলো? আটকাতে পারলে না মা? অনঙ্গমোহন স্বর নত ক'রে বললেন কথাগুলি। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো যেন মধুমালতীর। চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। মুখাকৃতির এ কি পরিবর্ত্তন! কেমন যেন উগ্রতা মধুমালতীর মুখে। প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি।

মধুমালতী বললে,—কলকাতার যাত্রার দলে রাজা সাজবার জন্যে যে দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখছে আর পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা করে বেড়াচ্ছে, তাকে কখনও ফেরানো যায় জ্যাঠামণি?

—যাত্রা করছে না কি হরিমোহন?

—হ্যাঁ। দীপ্তকণ্ঠে জবাব দিলে মধুমালতী। বললে,—আর কিছু তো জানে না। তাই দেখছে যদি জমিদারী চেহারাটা দেখিয়ে যাত্রায় নেমে কিছু উপার্জ্জন করতে পারে!

—সে কি কথা বৌমা? আমাদের বাড়ীর ছেলে যাত্রা করবে কি? তুমি প্রশ্রয় দাও না কি? অনঙ্গমোহনের কণ্ঠস্বর কত নত। শোনা যায় কি না যায়।

—জানিনা জ্যাঠামণি। আপনাদের বাড়ীর ছেলেদের তো শুধু জমিদারী করবার কথা। তবে ইদানীং জমিদারীর টাকায় জমিদারী যে চলছে না তাতো আপনিও দেখছেন।

কথা বলতে বলতে ছেলের হাত ধরে টেনে নেয় মধুমালতী। কেমন যেন ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ছেলের হাত ধ'রে।

—তাই বলে যাত্রা করবে আমাদের বাড়ীর বংশধর? বললেন অনঙ্গমোহন, সবিস্ময়ে।

মধুমালতী ঘরে থাকলে এ কথার জবাব দিতে পারতো। কিন্তু সে তখন ঘর থেকে দালানে গিয়ে পৌঁছেছে। অনঙ্গমোহন কথা শেষ ক'রে দেখলেন কথা শোনার লোক আর নেই সেখানে। জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকলেন ঘন ঘন মনটা যেন তার ভেঙ্গে পড়েছে। সেই সঙ্গে কি শরীরটাও!

—শ্যাম! শ্যামা! শ্যামাপদ!

ভাঙা-মনে ডাকলেন অনঙ্গমোহন। ঘরে এখন তিনি শুধু একা। আর কেউ নেই। শিশুর মতই থেকে থেকে কেমন যেন ভীত হয়ে ওঠেন তিনি। একা থাকতে পারেন না। কোন্ এক অশরীরী আত্মা যেন তাঁর আশেপাশে বিচরণ করছে। অনঙ্গমোহন শুনতে পান বুঝি তার চলাফেরার পদধ্বনি। কার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ! কার চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ!

সে কি এসেছে! অনঙ্গমোহনের চতুর্দ্দিকে ঘোরাফেরা করছে কি!

অনঙ্গমোহন দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ঐ তো তার আলেখ্য। আবক্ষ ছবি। আলোকচিত্র। চৌরঙ্গীর বোর্ন এণ্ড সেফার্সের তৈরী রঙীন আলোকচিত্র। যেন ঠিক জীবন্ত। শুধু মুখে যা কথা নেই।

এলোমেলো সান্ধ্য-বাতাস ঘরে যেন সহসা দাপাদাপি করতে থাকে।

টেবিলের কাগজ-পত্র, জানলার পর্দা, আনলায় ঝুলানো পোষাক— এরা যেন সব সজীব হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তের মধ্যে। বাতাসে কি সুমিষ্ট গন্ধ! কনকচাঁপার গন্ধ। কাছাকাছি গৃহপ্রাঙ্গনের কোথায় আছে কয়েকটা আকাশস্পর্শী চাঁপাগাছ। ফুল ধ'রেছে সেই গাছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে।

—ডাকছিলেন হুজুর?

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে শ্যামাপদ। ভয়ে ভয়ে বললে।

ইদিক সিদিক দেখলেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—আচ্ছা শ্যামা, তোর মাঠাকরুণ কি এসেছেন? ত্যাখ দেখি, খুঁজে ত্যাখ দেখি!

একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললে শ্যামাপদ।

একটু ম্লান হাসলো। দুঃখের হাসি। বললে,—আপনি কি ক্ষেপে গেলেন হুজুর? মা ঠাকরুণ আসতে যাবে কোন্ দুঃখে! তিনি স্বর্গে গেছেন, স্বর্গেই থাকবেন।

—স্বর্গে কি সে গেছে? যেতে পেরেছে? তার কি স্বর্গবাস হবে?

দুঃখমিশ্রিত কথার ধ্বনি অনঙ্গমোহনের। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল।

—নিশ্চয়ই গেছেন হুজুর। বললে শ্যামাপদ। সজোরে বললে।— তাঁর মত সতী লক্ষ্মীর স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও স্থান নেই।

কার কথা বলতে চান অনঙ্গমোহন।

কোন্ স্বর্গতার কথা! কে তিনি!

ঐতো দেওয়ালে ঝুলছে সেই পতিব্রতার ছবি। আলোকচিত্র। আহা, যেন জীবন্ত! মুখেই শুধু যা কথা নেই। তাকিয়ে আছেন অপলক দৃষ্টিতে, অনঙ্গমোহনের প্রতি। কি অপরূপ রূপের অধিকারিণী ছিলেন তিনি! বাড়ীর বড় বৌ অনুপমা। অনঙ্গমোহনের অর্দ্ধাঙ্গিণী।

কবে চলে গেছেন মরজগত থেকে, এখনও ভুলতে পারলেন না অনঙ্গমোহন। দেওয়াল-গাত্রে ঝুলন্ত আলোকচিত্রটি বহু পয়সা খরচায় করিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। অনুপমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। অনুপমার জীবদ্দশায় ততটা আদর-যত্ন করতে পারেননি অনঙ্গমোহন— সেই আফশোস এখনও বুকে বাজে সময়ে অসময়ে।

—ও সব কথা নাই-বা চিন্তা করলেন হুজুর!

শ্যামাপদ তার মনিবের মন ফেরাতে চায়।

হতাশ হেসে বললেন অনঙ্গমোহন,—আমি কি আর চাই, কেবলই যে দেখতে পাই তাকে চোখের সামনে। যেমনটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো আমার পাশটিতে, ঠিক তেমনি যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি যে তার নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত কানে শুনতে পাই। বড্ড দুঃখকষ্টে আছি শ্যামাপদ। অনুর জন্যে কেন কে জানে সদাই অস্থির হয়ে থাকি! কবে যে আবার আমরা দু'জনে এক হব কে জানে!

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠেন বক্তা।

শ্যামাপদ বললে,—মা ঠাকরুণ ঠিক আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না হুজুর। দেখে নেবেন।

হতাশ হাসি হাসলেন অনঙ্গমোহন। দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসলেন। বললেন,—সে গেছে স্বর্গে, সেখানে কি আমার মত পাপিষ্ঠের ঠাঁই আছে?

কি এমন পাপ করেছেন অনঙ্গমোহন, যেজন্য এই ধরণের উক্তি করলেন! কি দোষ করলেন! কি অন্যায়?

ছবির অনুপমার কিন্তু কোন বিকারই নেই।

চিরকাল ঐ একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অনঙ্গমোহন ঘরের মধ্যে যেখানেই থাকুন, অহোরাত্রি স্বামীর প্রতি চেয়ে আছেন অনুপমা। পলকহীন চোখে।

অনঙ্গমোহন নতকণ্ঠে বললেন,—জানিস শ্যাম, আমারও যখন তখন মনে হয় আমিও ঐ অনুর মত আত্মহত্যা করি। সকল জ্বালা জুড়াই। কিন্তু, কিন্তু আত্মহত্যার চেয়ে বড় পাপ আর কি কিছু আছে। নরকেও যে ঠাঁই হবে না।

আত্মহত্যা করেছিলেন অনুপমা! কোন্ দুঃখে!

অনঙ্গমোহন যখন তখন লজ্ আর ক্লাব আর পার্টি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

চন্দনধামের কলকাতার শাখায় থাকতেন। সপ্তাহান্তে একদিন ফিরতেন কি ফিরতেন না, তার কোন ঠিক ছিল না। একসঙ্গে কতগুলো লজের মেম্বার, কতগুলো ক্লাবের। প্রায় প্রত্যহ দিনে রাত্রে দু'দুটো পার্টি! তাতেও কোন দুঃখ ছিল না অনুপমার, কোন ক্ষোভই ছিল না। কিন্তু অনুপমা যেদিন মিস্ মার্গারেটের নাম শুনলেন, সেদিন আর স্থির থাকতে

পারলেন না। অপমান, অবহেলা আর অনাদরের লজ্জায় একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। রুদ্ধদ্বারকক্ষে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তিলে তিলে দগ্ধ করলেন নিজেকে। জীবনভোর দুঃখভোগের কাছে সেই অগ্নিদাহনের কষ্ট নাকি অতি সামান্যই!

সে যুগে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে নাকি ঝাঁপ দিতো নারী-জাতি। অনুপমা স্বামীর অপকীর্ত্তির দুঃখে স্বামী থাকতে থাকতেই মৃত্যু বরণ করলেন কেরোসিনের আগুনে। তাই মনে হয়, কে বলেছে সতীদাহ উঠে গেছে দেশ থেকে? সতীদাহপ্রথা?

—আত্মহত্যার তুল্য পাপ আর নেই হুজুর। এমন কাজটি করবেন না। শ্যামাপদ কথা বললে বিস্ফারিত চোখে। চোখ বড় ক'রে। অনাগত ভয়ের আশঙ্কা ফুটলো তার চোখেমুখে।

শ্যামাপদ যে স্বচক্ষে দেখেছে একটা আত্মহত্যা।

অনুপমা ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে পুড়ছেন। ঘরের বাইরে জানালা থেকে সকল ঘটনাই দেখেছে শ্যামাপদ। কত চেষ্টাতেও বাধা দিতে পারেনি। কত অনুরোধ জানিয়েছিল শ্যামাপদ। নিষেধ ক'রেছিল কত। কত কাকুতি মিনতি করেছিল। ঘরের একটা জানলা সজোর ধাক্কায় কোন রকমে খুললেও ঘরের বন্ধ-দরজা সে কোনমতেই খুলতে পারেনি। অবশেষে অনেক পরে যখন খুলেছিল তখন অনুপমার দগ্ধ দেহে কোন সাড়ই ছিল না। দেহটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হ'তে পায়নি।

তবুও অপরূপ রূপের অধিকারিণী অনুপমাকে দেখে কেউ আর চিনতে পারলো না। কেমন যেন বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন অনুপমা। কি বিশ্রী সেই অগ্নিদগ্ধ রূপ!

অনঙ্গমোহন তখন নাকি আদপেই ছিলেন না। চন্দনপুরেই ছিলেন না।

ছিলেন কলকাতায়। পার্ক স্ট্রীটের মিস্ মার্গারেটের বাসায়। মার্গারেটের নির্জন-গৃহকোণে। মার্গারেটের প্রেমচ্ছায়ায়। স্ত্রী অনুপমার মৃত্যু-সংবাদটি শুনে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না। আত্মহত্যার অবিশ্বাস্য সংবাদ শুনে হুইস্কির প্রবল নেশায় হেসেছিলেন প্রচুর। তারপর কলকাতা থেকে মোটরযোগে দ্রুত চন্দনপুরে পৌঁছে যখন স্বচক্ষে দেখলেন তখন বহু বিলম্ব হয়ে গেছে।

চোখে দেখেও বুঝি বিশ্বাস হয় না অনঙ্গমোহনের।

সে কি রূপ অনুপমার! কি বীভৎস রূপ! দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়।

সোনার মত গায়ের রঙ ছিল অনুপমার। সেই সৌন্দর্য্য জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। অনুপমার রাশি রাশি কোঁকড়া চুলের বোঝা, দাউ দাউ জ্বলে ছাই হয়ে যায়। মাথায় কেরোসিন ঢেলেছিলেন অনুপমা।

এখনও, এতকাল বাদেও, সেই দৃশ্য চোখে কিংবা মনে ভেসে উঠলে দস্তুরমত শিউরে ওঠেন অনঙ্গমোহন। মাঝে মাঝে রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে দেখেন।

আহা, মার্গারেট যদি অনঙ্গমোহনের জীবনে না আসতো!

মিস্ মার্গারেটকে যদি চোখে না দেখতেন অনঙ্গমোহন! যেদিন সর্বপ্রথম দেখলেন মার্গারেটকে, সেদিন তখন আকাশে কনে-দেখা-আলো ফুটেছিল। আউটরাম ঘাটের ধারে কেল্লার সমুখের প্রলম্বিত পথ ধ'রে মন্থরগতিতে চলেছিল মিস্। হাতে ছিল এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল। গোলাপী রঙের গোলাপ ফুল। ফুল, কুঁড়ি আর কচি গোলাপ পাতা।

অনঙ্গমোহন ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে।

রাইডিং-শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরছিলেন, এমন সময় প্রথম দেখলেন মার্গারেটকে, পিঙ্ক রঙের সিল্কের গাউনে। অনঙ্গমোহন তার সোনালী

চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেই বৈকালিক কনে-দেখা-আলোয় প্রথম দৃষ্টিতেই।

মিস্ মার্গারেটকে হাতের নাগালে পেয়ে ক্রমে এমনই বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে চন্দনপুরকেই এক রকম ভুলতে বসেছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরতে চাইতেন না। গৃহে মন বসতো না। যতক্ষণ না মার্গারেটকে দেখতে পেতেন চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে থাকতেন।

অনুপমার মত স্ত্রীকেও মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন অনঙ্গমোহন? যৌবনের জোয়ারে তখন তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে; সপ্তসমুদ্রপারের সাসেক্স্ নগরীর এক পলাতকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম কি একটি সম্বন্ধ বাধিয়েছিলেন বন্ধু ও আত্মজনের চক্ষুর অন্তরালে থেকে; এক কথায় ঐ নীল-চোখ, সোনালী-চুল সাসেক্স-কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন অনঙ্গমোহন। যাকে বলে, ইন ডীপ্ লভ্।

—হুজুর! ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিন।

ঘরের বাইরে থেকে এক পুরুষ-কণ্ঠের আবেদন। স্রেফ্ স্বপ্ন দেখতে মশগুল ছিলেন অনঙ্গমোহন।

অনুপমা আর মার্গারেটের কথা ভাবতে ভাবতে কোন্ সে-দুনিয়ায় চলে গিয়েছেন, দুঃখ আর সুখের কত কথাই মনে প'ড়েছে। কেন কে জানে অনঙ্গমোহন এতকাল বাদে ঐ দু'জনার মধ্যে যেন জীবন-মৃত্যুর ছায়া দেখলেন একজন পরিপূর্ণ জীবন, অন্যজন মৃত্যুর হিমশীতল প্রতিমূর্তি। মার্গারেট জীবন আর অনুপমা মৃত্যু!

কার কথায় ভাবনার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্পষ্ট কথা কইলেন। শুষ্ককণ্ঠে বললেন,—শ্যাম, কে কথা বলছে?

—পুরোহিতমশাই এসেছেন হুজুর।

—সে কি রে? আমার ঘরে পুরোহিত আসবে কেন? ছাখ্, ছাখ, শোন্ গিয়ে, কি বলতে চান। ঘরে যেন এসে না পড়েন।

কথায় কথায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গৃহকর্ত্তা।

পুরোহিতই বললেন, সরবে,—আমি এখান থেকেই বলছি, ঘরে যেতে ছান আর না ছান, একটি অভিযোগ ছিল। একটা নালিশ ছিল।

—অভিযোগ! নালিশ!

অনঙ্গমোহনের কপালে বলিরেখা স্পষ্টতর হয়। চোখের তন্দ্রিমা মুছে যায় যেন। বলেন,—আমি একটা ম্লেচ্ছ মানুষ, আমার কাছে আবার কিসের অভিযোগ! আমিতো জাত কুল খুইয়েছি কবে কোন্‌কালে! লঙ্, লঙ্ এগো!

—আপনাদের মন্দিরের মূর্ত্তির চোখের রত্ন উপড়ে নেওয়া হয়েছে। পুরোহিতের কণ্ঠ ভীষণ ক্রোধ-গম্ভীর। বললেন,—কথাটি আগে ভাগে জানিয়ে রাখতে এসেছি। ভবিষ্যতে আমাকে যেন না চুরির দায়ে ধরা পড়তে হয়!

কি শুনছেন অনঙ্গমোহন!

নিজের কানকে যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। কে এই দুষ্কার্য্য করলো এই পাপকার্য্য! এই মহাপাপ!

গৃহদেবতা আছেন গৃহে। মুরলীধর আছেন।

চন্দনধামের পেছনে চন্দনঝিলের তীরে গৃহদেবতার মন্দির আছে। দেবভোগ্য সম্পত্তি। ভিন্ন ভিন্ন শরিক, দেবতার পূজা শরিকদেরই হাতে। যখন যে শরিকের পালা পড়ে তখন তাকে পূজার ভার নিতে হয়। নিজে খেতে পাও আর না পাও, দেবতাকে অভুক্ত রাখলে চলবে না। যেখান থেকে হোক পূজার উপচার জোগাড় করতে হবে। তাই পালার ভয়ে

একেই অতিষ্ঠ হয়ে থাকে শরিকের দল। কখন কার পালা পড়ে কে জানে!

চন্দনধামের পেছনে গৃহ-দেবতা মুরলীধরের মন্দির।

কত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয় মন্দিরের। পুরোহিতের চোখে ঘুম আসে না। ভয়ে ভয়ে জেগে থাকতে হয়। প্রদীপের আলোর সামনে পুঁথি খুলে পড়েন তিনি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়েন। তস্করের দল গভীর-রাত্রে আসে মন্দিরের আনাচে কানাচে, আসে পচা-কলা খাওয়ার লোভে। হাঁক ছাড়েন পুরোহিত,—হিস্, হিস্, যাঃ—।

সভয়ে রাত্রি জেগে বসে থাকতে হয় বাবুদের জন্যে। কখন কে আসেন, তার ঠিক কি! মুরলীধরের গায়ের অলঙ্কার চুরি করতে আসেন। দোষ হবে পুরোহিতের, তাই তাঁর যত ভয়।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হয়নি অনঙ্গমোহনের। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—শ্যাম, কি বললেন পুরোহিত মশাই? বুঝলাম না ঠিক।

দুঃখের হাসি হাসলো শ্যামাপদ। বললে,—কি আর বলবেন! ঠাকুরমশাই বলছেন যে আপনাদের গৃহের অধিষ্ঠিত মুরলীধরের চোখের রত্ন উপড়ে নিয়েছে কে যেন!

—চোখের রত্ন উপড়ে নিয়েছে? নিজের মনে নিজেকে যেন প্রশ্ন করেন অনঙ্গমোহন। বলেন,—মুরলীধরের চোখের রত্ন?

কথা শেষ করতে না করতেই সসঙ্কোচে জিব কাটলেন। ভুল করেছেন তিনি, নিজের অজ্ঞাতে একটি বিষম ভুল করেছেন,—মুরলীধরের নাম উচ্চারণ ক'রে ফেলেছেন উত্তেজনার বশে। লজ্, ক্লাব আর পার্টি নিয়ে একদা মেতে উঠেছিলেন অনঙ্গমোহন। মিশেছিলেন অজাত কুজাতের সঙ্গে। কত কি অখাদ্যই না খেয়েছিলেন!

গৃহ-দেবতা মুরলীধরের নাম পর্য্যন্ত এই সব কারণে মুখে আনতে চান না তিনি। উত্তেজনার বশীভূত হয়ে নামটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র অনঙ্গমোহন তাই জিব কাটলেন। যেন মস্ত এক পাপ করে ফেলেছেন এমনি তাঁর ভয়ার্ত্ত মুখভঙ্গী।

—কে এমন কাজ করলে? নরাধমটি কে?

হঠাৎ সজোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অনঙ্গমোহন। ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন শ্যামাপদর প্রতি।

পুরোহিত বললেন,—বাবুদের মধ্যে ক'জনা ছিলেন দেখি নাই। অনেকেই ছিলেন। আমার অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত করলেন না। আমাকেই শাসালেন।

অনঙ্গমোহনের শরীর যেন ঠকঠকিয়ে কাঁপছে।

হস্তপদ কেন কে জানে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে যায়। পা কাঁপে। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত কম্পমান। ক্ষণেকের জন্য নিজেকে সামলে উত্তেজিত সুরে বললেন,—এ বছর কার পালা চলছে? তাকে এ বিষয়ে অবগত করা হোক্।

কার পালা! শরিকদের পালা। একেক শরিকের একেক বছরের পালা।

পুরোহিত বললেন,—হুজুর, যাঁর পালা তিনিও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই দুষ্কীর্তির মধ্যে। তাঁকে আর কি বলবো?

অনঙ্গমোহন হতাশার নিশ্বাস ফেললেন। আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে একটি সুদীর্ঘ শ্বাস টানলেন। কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় হাঁফিয়ে উঠেছেন হয়তো। বললেন,—তবে? তবে আর কি হবে? থেন্, হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু? আমি কি করতে পারি! আই অ্যাম্ হেল্প্লেস্।

পুরোহিত বললেন,—আমার কর্ত্তব্য আপনাদের অবগত করা। কার কাছে যাই? আপনি এই বংশের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সেজন্য আপনাকেই নিবেদন করছি। জেনে রাখুন।

এ কথার কোন প্রত্যুত্তরই দিলেন না অনঙ্গমোহন।

জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশে চোখ তুললেন। অবসন্ন ও কাতর দৃষ্টি। পরাজিত যোদ্ধা যে-দৃষ্টিতে তাকায় সেই চাউনি চোখে। কালো আকাশে কি নক্ষত্র ফুটেছে! আকাশে তারার ঘুম ভেঙেছে কি! প্রসারিত দৃষ্টি, তবুও কিছু দেখতে পান না অনঙ্গমোহন। ঝাপসা দেখেন। দৃষ্টিশক্তি আছে কি আর চোখে! হয়তো যা আছে তা সামান্যই। সে-দৃষ্টিতে আকাশের সোনালী তারা দেখা যায় না, দেখা যায় নিজের হাত-পা। দেখা যায় অতি নিকটে যে আছে তাকে, দূরের কা'কেও নয়।

আকাশ থেকে চোখ ফেরালেন অনঙ্গমোহন।

চোখ আপনা হ'তেই স্থির হয়ে যায় ঘরের একটি ছবিতে। অনুপমার ছবি। ঘরময় আসবাবপত্র, দেওয়ালে আছে আরও কত কা'র ছবি, তবুও একটি ছবিই কি বারম্বার চোখে পড়ছে! বোর্ণ এণ্ড সেফার্সের তৈরী রঙীন আলোকচিত্র অনুপমার, ছবিতে কত আকর্ষণ! একেই অপ্সরীর রূপ ছিল অনুপমার। মুখশ্রী ছিল অপূর্ব্ব। দুঃখ এই, অনুপমার রূপে আকৃষ্ট হননি অনঙ্গমোহন কোনদিনই। এখন, এতকাল পরে বুঝি ছবির অনুপমার মুখে পেয়েছেন গভীর আকর্ষণ। কতদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, সত্যিই রূপবতী ছিল অনুপমা। কি সুন্দরই না দেখতে ছিল! কতদিন ঐ ছবির অনুপমাকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখতে দেখতে একা একা কেঁদেছেন অনঙ্গমোহন। শব্দহীন কান্না, কেবলমাত্র দরদর অশ্রুপাত। কতদিন এমন অবস্থায় বিভ্রান্ত হয়ে কতবার বলেছেন,—আই এ্যাপলজাইস্, আমাকে ক্ষমা কর' অনু।

—টাকার কি এমন দরকার পড়লো যে গৃহদেবতার চোখের রত্ন উপড়ে নিতে হবে? হঠাৎ কথা বললেন অনঙ্গমোহন। প্রশ্নটা শ্যামাপদকেই করলেন তার দিকে চোখ ফিরিয়ে।

শ্যামাপদ রহস্যময় হাসি হাসলো।

পেটের পীলায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে,—শুনছি কলকাতা থেকে নাকি বাইজী আসছে ক'জন।

—হোয়াট্ ননসেন্স্!

কথার শেষে চোখ ছ'টি বন্ধ ক'রলেন অনঙ্গমোহন।

ঘরের দরজার বাইরে তখনও ছিলেন পুরোহিত, অপেক্ষা করছিলেন। যদি কিছু বলেন রত্ন উপড়ানোর কারণটা শুনে। কিন্তু কিছুই আর বললেন না গৃহকর্ত্তা। নিমীলিত চোখে প'ড়ে রইলেন আরাম-কেদারায়। একান্ত নির্জীবের মত। শ্বাস চলছে কি না চলছে বোঝা যায় না।

শ্যামাপদ কিন্তু বোঝে। কতগুলি যুগ কাটলো!

কতদিন কাজ করেছে শ্যামাপদ। কতদিনের লোক! শ্যামাপদ বোঝে তার মনিবের শরীরতত্ত্ব। কখন ঘুম, আর কখন যে তাঁর জাগরণ, সব কিছুই বুঝতে পারে শ্যামাপদ। মুখ দেখলেই বুঝতে পারে!

ভরা ছুপুর গ্রীষ্মের উত্তাপ ছিল। ঘরে বিজলী পাখা থাকলে কি হবে, ঘর-দোর তেতে উঠেছিল। ছাদে দালানে পা দেয় কার সাধ্যি! সারাটা ছুপুর, আজ কেন কে জানে অন্য অন্য দিনের মত চোখে-পাতায় করতে পারেননি। ছাড়া ছাড়া, ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হয়েছিল। তাই হয়তো অনঙ্গমোহনের চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। এতক্ষণ যাও-বা হেসে ছুটো কথা বলছিলেন, পুরোহিতের অভিযোগ কানে পৌঁছানো পর্য্যন্ত আর সে-হাসি থাকলো না। উবে গেল যেন ঠোঁটের কোন থেকে। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন।

কপালের বলিরেখা যেন আর সোজা হবে না।

চোখ দুটি বন্ধ রেখে, ঝিমিয়ে প'ড়ে কি এত আকাশ-পাতাল ভাবছেন অনঙ্গমোহন! চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দুশ্চিন্তা।

—দাদাবাবু তো হুজুর এখনও কলকাতা থেকে ফিরলেন না? ছটা পঁয়ত্রিশের ট্রেন বহুক্ষণ চলে গেছে।

শ্যামাপদ বললে হঠাৎ। কি মনে হয়, তাই হয়তো বলে।

শিউরে উঠলেন যেন অনঙ্গমোহন!

মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম এক উপশিরা ধ'রে কে যেন টান মেরেছে। চমকে উঠেছেন তাই। বললেন,—কে? মনিমোহন?

শ্যামাপদ বলে,—হাঁ হুজুর, আমাদের দাদাবাবু।

অনঙ্গমোহন চোখ খুললেন। বললেন,—কেন বল্ তো এখনও আজ আসছে না? আমিও তো সেই কথাই ভাবছি কতক্ষণ ধ'রে। কথা বলতে বলতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন বক্ষের অন্তস্থল থেকে শ্বাস পড়লো। বললেন,—হয়তো আজ হেরে গেছে! গড্ নোজ, হোয়াট্ হ্যাপেন্ড্!

—হেরে যাবেন কেন? বললে শ্যামাপদ। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যেন বললে,—হেরে যেতে যাবে কেন! নিশ্চয়ই জিত্ হয়েছে দাদাবাবুর। হেরে ফিরে আসবে, সে ছেলে দাদাবাবু নয়। আপনি হুজুর চিন্তা করবেন না। একটা ট্রেন ফেল্ করলে আর একটা আছে।

অনঙ্গমোহনের মুখে হতাশ হাসি ফুটলো।

নিরাশার স্মিত হাসি। বললেন,—ফর্ নাথিং কি কোন লোক এমন দিনের পর দিন হেরে যায়! আমার লাক্‌টা কিছুকাল ধ'রে বেজায় বেয়াড়াপনা করতে শুরু করেছে। আই এ্যাম্ লুজিং এভ্‌রিথিং।

দিন নেই রাত্রি নেই, সদাক্ষণ কেউ ম্রিয়মান হয়ে থাকলে ভাল লাগে

আর কোন্ মানুষের! শ্যামাপদও কখনও কখনও বিরক্ত হয়, অখুশী হয়। শ্যামাপদর মুখেও বিরক্তির স্পষ্ট ছায়া দেখা দেয়। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে ভীষণ গুমরোতে থাকে। মুখে তখন কোন কথা জোগায় না, গুম মেরে যায় শ্যামাপদ। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। অসহ্য মনে হয় শ্যামাপদর।

ঘরের বাইরে অন্ধকার।

দালান, উঠান অন্ধকার। দূরে কোন কোন ঘরের বিজলীর সোনা রঙ দেখা যায়। কার ঘরে আলো জ্বলছে কে জানে। কত অসংখ্য ঘর এই বাড়ীতে। কত কে আছেন।

মধ্যিখানে শান-বাঁধানো উঠান।

চতুর্দ্দিকে ঘর, সারি সারি। ঘরের কোলে লম্বা লম্বা দালান।

একটা দালান ধ'রে এগিয়ে চললো শ্যামাপদ। ইটের ইমারত হ'লে কি হয়, এই খাঁচার মধ্যে থেকে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শ্যামাপদ। কোথাও যেন মুক্তি নেই, মুক্ত আকাশ চোখে পড়ে না। শ্যামাপদ চললো হনহনিয়ে।

—শ্যাম, তোমার হুজুর কি করছেন?

—কি আর করবেন, যেমনকার তেমনি পড়ে আছেন। আরাম-কেদারায় এলিয়ে প'ড়ে আছেন।

—তুমি এমন ব্যস্ত হয়ে কোথায় চললে?

—কোথায় আর যাবো দিদিমণি! যাওয়ার কি কোন' চুলো আছে যে যাব? একটু ফাঁকায় যাচ্ছি। দম বেরিয়ে যাওয়ার দাখিল হয় যেন কাছে থেকে থেকে।

—তোমাকে যদি ডাকেন এখুনি? রাঙাদাদুকে একা রেখে তোমার যাওয়া উচিত নয় শ্যাম। একেই অথর্ব্ব হয়েছেন!

মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে শ্যামাপদর।

নেহাৎ অন্ধকার, তাই দেখা যায় না কিছু, শ্যামাপদর মুখে হতশ্রদ্ধার ভাব। বিরক্তিতে বিশ্রী দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে সে,—অত যদি রাঙাদাদুর জন্যে দরদ দিদিমণি, যাওনা দু'দণ্ড কাছে গিয়ে বস'গে না। আমিতো দিনরাত্তিরই আছি। আর পারি না আমি, যা হবার হোক।

শেষের কথাগুলি স্বগত করলো সে।

—আমি রাঙাদাদুর কাছে থাকছি কিছুক্ষণ, যাও তুমি ঘুরে এসো শ্যাম। রাঙাদাদু ঘুমিয়ে পড়েননি তো?

—না গো দিদিমণি, না। ঘুমিয়ে পড়বে এখন? সবে ঘুম ভেঙ্গেছে বলে! দিবানিদ্রা থেকে এই খানিক আগে উঠেছেন।

—তবে আমিই যাচ্ছি। শীঘ্রি এসো কিন্তু শ্যাম। দেরী ক'র না যেন।

—না গো দিদিমণি না। যাবো আর আসবো।

নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শ্যামাপদ। কথার শেষে আরেক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়ার দাখিল হয়েছে, চাই মুক্ত আকাশ চাই। চার দেওয়ালের বাইরে ফাঁকায় চলে যায় শ্যামাপদ। অনেকটা এগিয়ে গেছে, কি মনে পড়তে ফিরে আসতে হয়। শ্যামাপদ তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে আসে। বলে,—রাধাদিদি?

লম্বা দালানের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছিল রাধা।

অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। শুধু অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে আন্দাজে পা চালিয়েছিল। ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়। বলে,—আবার ফিরলে কেন?

—একটা কথা শুধোতে এয়েছি রাধাদিদি। কথায় যেন শ্যামাপদর লজ্জার প্রলেপ।

—কি বলবে বল ? কি বিশ্রী ঘুটঘুটে অন্ধকার ! ভয় করে যেন ! ঈষৎ ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কথা বলে রাধা ।

শ্যামাপদ বললে,—হ্যাঁ দিদিমণি, বেজায় আঁধার এখানে। এটা যে বারোয়ারীর দরদালান ! কে আর গাঁটের কড়ি খরচা করে আলো জ্বালাবে বল ।

সভয়ে হাসলো রাধা। ভয়ে যেন শিউরে আছে, তবুও হাসলো স্মিত হাসি। বললে—তা জানি আমি। কি বলবে বলছিলে ?

একেই শ্যামাপদ বেতনভোগী ভৃত্য। সে ভাবছিল কথাটি বলবে কি বলবে না। তার ছোট মুখে কি মানাবে বড়দের কথা! তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললে,—হাঁ রাধাদিদি, সেদিনে যাঁরা তোমাকে দেখে গেলেন, শেষ পর্য্যন্ত কি জানালে ? মেয়েতো আমাদের অপছন্দের নয়। তবে ?

এক দুঃসহ লজ্জা আর অপমানের জ্বালা ধরলো যেন রাধার দেহ আর মনে ।

পায়ের তলায় ভূমি কাঁপতে থাকলো। বুকের স্পন্দন অনুভব করতে হয়। নেহাৎ আলো নেই তাই, নয়তো দেখতে পাওয়া যেতো রাধার ফর্সা মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। রাধা নীরব নির্ব্বাক।

অপ্রস্তুত হ'ল শ্যামাপদ। কথাটা না পাড়লেই বুঝি ভাল ছিল। রাধাকে দেখতে এসে পছন্দ করলে কিংবা পছন্দ হওয়ার পর বিয়ের দিনটি ধার্য্য হ'লে কি জানতে পারতো না শ্যামাপদ ! নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করে সে। ভাবে, কি প্রয়োজন ছিল তেমন কথা বলার, যে-কথার কোন উত্তর পাওয়া যায় না ? কথা বলার শেষে নিজেকে যেন মনে হয় শ্যামাপদর, সে একটা মূর্খ, একটা আহাম্মক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কথা বলতে

হ'লে স্থান কাল পাত্রের বিচার করতে হয়, তাও তার জানা নেই। এই বুড়ো বয়সে এটুকু জ্ঞানও সঞ্চয় করতে পারলো না ?

বেশ কিছুক্ষণ অতীত হওয়ার পর রাধা বিনম্র সুরে কথা বলে। লজ্জানম্র কণ্ঠে বলে,—পছন্দ হয়েছিল, যা টাকা চাইলে তাতেই পিছিয়ে এলেন বাড়ীর লোক।

কথার জবাব পেয়ে বাঁচলো যেন শ্যামাপদ।

দুঃখকাতর হাসলো কথাগুলো শুনে। হাসতে হাসতে বললে,— আজকাল, দেখেছো রাধাদিদি, শালার ছেলেরা টাকা না পেলে বিয়েই করতে চায় না! তোমার মত মেয়েকে রাধাদিদি যে বিয়ে করবে সে টাকা চাইবে কেন? তোমার মত মেয়ে—

শ্যামাপদ বলে যায় কত কথা।

কিন্তু কথা যে শুনবে সে তখন আর সেখানে নেই। বিয়ে না হওয়ার অসহ্য লজ্জায় আর একটি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করেনি। শব্দহীন পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। যেন রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল রাধা, লজ্জা ও সঙ্কোচের আবেগে বেসামাল হয়ে প্রস্থান করলো দ্রুত পায়ে।

শ্যামাপদ একজন বেতনভোগী চাকর, তাতেই যত লজ্জা।

নয়তো রাধার কাছে এসব কথা অতি পুরানো। মামুলী কথা। রাধাকে যেই দেখে সেই শুধোয়। যে মুখ ফুটে বলতে পারে না সে নিশ্চয়ই মনে মনে এই বিয়ে না হওয়ার কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করে। কত সময়ে ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলেছে সে। যতদিন দেহে শাড়ী উঠেছে হয়তো ততদিন ধরে এক নাগাড়ে রাধা শুনে আসছে এমন ধারার কথা। কত কে বলেছে। এখনও বলাবলি করে। অন্য কেউ বললে তাই এখন আর গায়ে মাখে না। শ্যামাপদ যে একজন দীন দরিদ্র! মাইনের চাকর!

আরাম-কেদারায় আরাম নেই।

কালো অয়েল-ক্লথের তলায় তবু নরম তুলো। বর্মার কারুকার্য। আরাম-কেদারার গদী বুঝি বা কণ্টকশয্যা মনে হয়! বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেননি অনঙ্গমোহন। উঠে পড়েছেন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গেছেন ঘরের সমুখের দালানের ঐ খোলা-জানালার ধারে। দূরের কিছুই স্পষ্ট দেখতে পান না, তবুও নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জানলার বাইরে—যেদিকে সদর; যেদিকে সদরের নাচঘর।

বাইরে অসীম অন্ধকার। রাত্রির কালো আঁচলের আড়ালে লুকানো প্রকৃতির কিছুই দৃষ্টিপথে দেখা যায় না। শুধু অদূরে দেখা যায় আলো-উজ্জ্বল সারি সারি বাতায়ন। লাল ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে।

নাচঘরে আলো, তবুও স্পষ্ট দেখতে পেলেন না অনঙ্গমোহন। ঝাপসা দেখলেন। শুধু দেখলেন আলোর হলুদ-আভায অদূরে। দেখতে দেখতে বুকের পাঁজরা ক'খানা যেন শির শির করতে থাকে। বাদশা কিংবা আমীর কিংবা ওমরাহের মত পেছনে দু'টি হাত একত্রে রেখে ঈষৎ নত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনঙ্গমোহন। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় কিনা দেখতে সচেষ্ট হন। কান পেতে থাকেন।

সারেঙ্গীর গুমরানি ভেসে আসে কৈ! কৈ কিছুই তো শোনা যায় না। বুকের পাঁজরা ক'খানা শিরশিরিয়ে উঠলেই মনে মনে যেন ভীষণ বিরক্ত হন অনঙ্গমোহন। সারেঙ্গীর গোঙানি শুনবেন কোথায় তা নয়, বাইরে শুধুই ঝিঁ ঝিঁর কীর্ত্তন। আর এলোমেলো বৈশাখী বাতাস।

গ্রামের নাম চন্দনপুর।

নামের সঙ্গে গ্রামের কোন যোগ-সম্পর্কই নেই। নামেই চন্দনপুর। খাল বিল গড় চন্দনপুরের শিরা উপশিরা। তরুশাখার আড়ালে নিজেকে লুকিয়েছে চন্দনপুর। ঘন বাঁশবনের ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিকে। আকাশ-চাঁচা

তাল আর নারকেলের সারি ডোবা পুকুরের ধারে। আগাছার ঝোপ। গড়খাতে জল নেই, মরা নদীর শুকনো বুকে ঝোপ আর জঙ্গল গজিয়েছে কবে কোন কালে। চন্দনপুরের এই বিশুষ্ক গড়খাতের নাম কঙ্কর সেনের গড়।

কঙ্কর সেনের না কিঙ্কর সেনের গড়?

ইতিহাসে বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। একদল বলছেন কিঙ্কর সেন, একদল বলেন, না কঙ্কর সেন।

তখন মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙলার দেওয়ান। কঙ্কর সেন হুগলীর ফৌজদারে পেস্কারের কাজ করতেন। বাদশা শা আলম বাহাদুর শার 'দেওয়ান বেউতাৎ', অর্থাৎ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ জেয়াদীন খাঁ তখন হুগলীর ফৌজদার। জেয়াদীন কেবল ফৌজদার নয়, পূর্ব্ব উপকূলের ও বঙ্গোপসাগরের রণতরীসমূহের ভারও তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। কঙ্কর সেন হুগলী ফৌজদারীতে পেস্কারের কাজ করতেন।

গড়খাতে ঝোপ আর জঙ্গল। পূর্ব্বে গঙ্গা নদীর সঙ্গে আঁতাত ছিল, যোগাযোগ ছিল, তখন কঙ্কর সেনের গড়ে সাত মানুষ জল। এখন জল নেই, জলা আছে কোথাও।

কাছে মশা ভোঁ ভোঁ করে।

দূরে বিরামবিহীন ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। সারেঙ্গীর গোঙানি তবে কি ঝিঁ ঝিঁর ডাকে চাপা পড়লো। অনঙ্গমোহন আর কতক্ষণ মশার কামড় সহ্য করবেন। তবুও সাদা সুতোর ঢিলে পায়জামা পরেছেন। গায়ে বিলীতি সামার কুল গেঞ্জী।

—রাঙাদাদু!

—কে?

—তুমি কোথায় ?

—তুমি যে কে তাই শুনি আগে।

—আমি রাধা। রাধারাণী।

দালান ছেড়ে ঘরে চললেন অনঙ্গমোহন।

এ আবার কি শোনাতে এলো! বহন করে আনলো হয়তো কি এক এক দুঃসংবাদ। বিজলী আলোর আলোয় দেখলেন অনঙ্গমোহন। রাধারাণীকে দেখলেন, তার মুখাকৃতি দেখলেন। শোকের এক প্রতিমূর্তি কোন্ অদৃশ্য ছায়ালোক থেকে আবির্ভূতা হয়েছে কি!

রাধারাণী ঘন-নীল নীলাম্বরী পরেছে।

রাত্রির নকল আলোয় ঘন-নীল রঙ চেনা যায় না ঠিক। ঘন কালো রঙ ব'লেই ভুল হয়। রাধারাণীর নীলাম্বরীতে কত যে সেলাই আছে, কেউ জানে না। প্রায় শতচ্ছিন্ন শাড়ী, দেখলে কিন্তু কেউ বুঝবে না। রাধারাণীর চোখের কোলে কালিমা। কপালে চূর্ণ কুন্তল কয়েকটি। রুক্ষ চুলের বাসি খোঁপা মাথায়। শতচ্ছিন্ন শাড়ীর সঙ্গে কি দৃষ্টিকটুই না রাধারাণীর জামা! বেগুনী আলপাকার চোখ ঝলসানো ব্লাউস। বুকে টিপ-কলের বোতাম ছিল, ছিঁড়ে গেছে অতি ব্যবহারে, তাই রাধারাণীর বুকে সেফটিপিনএর এক রাজত্ব গ'ড়ে উঠেছে যেন।

—রাধা, তুমি কি মনে ক'রে ?

ঘরের আলোয় এসে বললেন অনঙ্গমোহন। বলতে বলতে টেবিলের কাছাকাছি এগোলেন। ছাই-দানে কখন রেখে দিয়েছিলেন আধ-খাওয়া চুরুট। তুলে নিলেন চুরুট। দেশলাইটাও তুললেন।

রাধারাণী বললে,—রাঙাদাদু, তোমার কাছে বসতে এসেছি।

অনঙ্গমোহন বললেন,—তোমার অশেষ কৃপা, আমার কি সৌভাগ্য!

দেশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বেলেছিলেন কথা বলতে বলতে। বৈশাখের

দিন-শেষের এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ায় আগুনের শিখা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, মুহূর্তের মধ্যে সে-আগুন নিভে গেল। আবার একটি কাঠি, ফস ক'রে জেলে মুখাগ্নি করলেন নিজের। আসল বর্মা চুরুটের উগ্র গন্ধ ছড়ালো ঘরে।

ঘরের দু' দেওয়ালের দুই বিপরীতে ছিল দু'খানি বেলজিয়ান কাঁচের আয়না। কাঁচেরই ফ্রেম! ফ্রেমেও টুকরো টুকরো আয়না। আয়নায় দেখলো রাধারাণী, কি বিশ্রী হয়ে আছে তার মাথার চুল। আয়নায় দেখতে দেখতে বাসি খোঁপার কাঁটা তুলে বিনুনীটা আরেকবার জড়িয়ে নেয় সে। দাঁতের সূক্ষ্ম কামড়ে ধ'রে থাকে ক'টা লোহার কাঁটা।

—আমার চাকর শ্যামকে দেখলে? কোথায় যে যায় ষ্টুপিড্‌টা!

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললেন অনঙ্গমোহন। কালো অয়েল-ক্লথের গদী দেওয়া আরাম-কেদারায় বসলেন। টেবিল থেকে ছাইদানটি কাছে এগিয়ে নিলেন।

দাঁতে লোহার কাঁটা ক'টা ধরা আছে, তবুও চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয় রাধারাণী। বলে,—শ্যাম আসছে এখুনি। আমি তোমার কাছে আসছি দেখে বল্লে যে, সে যাবে, আর আসবে। শ্যামকে তোমার কি দরকার তা না হয় আমাকেই বললে।

—দরকার? দরকার তেমন কিছুই নেই। তা রাধারাণী, তুমি একটি কাজ করতে পারবে?

অনঙ্গমোহনের কণ্ঠে শিশুসুলভ কাকুতি। কথায় যেন অনুরোধের সুর।

বাসি খোঁপায় কাঁটা বসাতে বসাতে রাধারাণী বলে,—কি রাঙাদাদু?

—আমার ঘরের ঐ বাইরের দালান থেকে দিদি দেখতে পারো, নাচ-ঘরে বেলেল্লাপনা শুরু হয়ে গেছে কি?

কণ্ঠস্বর অসম্ভব ধীর অনঙ্গমোহনের। যেন ফিস ফিস কথা।

মুচকি হাসলো রাধারাণী। কপালের পরে নেমে আসা কতগুলি চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে দিতে দিতে দালানের দিকে এগিয়ে চললো।

—সারেঙ্গীর গোঙাণি শোনা গেল না এখনও ?

ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন অনঙ্গমোহন।

রাধারাণী ঘরের বাইরে থেকে বললে,—না রাঙাদাছু, এখনও কৈ কিছু শুনছি না তো! নাচঘর তো নিস্তব্ধ। কোন সাড়া শব্দই নেই। সারেঙ্গী দূরের কথা।

তু' পায়ের দশ আঙ্গুলে দেহের ভর রেখে, খানিক উঁচু হয়ে দেখতে হয় রাধারাণীকে। দালানের জাফরি-জানলা খুব নীচে নয়; বেশ উঁচুতে। রাধারাণী যে তেমন দীর্ঘাঙ্গী নয়। কুড়ির ঘর কবে পেরিয়ে গেছে, রাধা যেমনকার তেমনিই আছে। কি এক গুপ্তবিদ্যায় যেন যৌবনকে যেতে দেয়নি, ধ'রে রেখে দিয়েছে, দেহের কানায় কানায়।

—কলকাতা থেকে বাঈজী আসবে। নাচঘরে এখন কোথায় কে!

ঘরের বাইরে থেকে দ্বিতীয়বার কথা বললে রাধারাণী। কথার শেষে ঘরে প্রবেশ করলো। একটা সেফটিপিন বড্ড বেশী এঁটে গেছে। নরম বুকের কোথায় যেন বিঁধছে থেকে থেকে; সেফটিপিনটি খুলে আবার লাগিয়ে নিয়েছে রাধা, দরদালানের আড়াল-অন্ধকারে।

—কলকাতা থেকে বুঝি বাঈজী আসছে ?

রাধাকে দেখে শুধোলেন অনঙ্গমোহন। চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন একমুখ।

এমন সময়ে ঝিলের ধারের মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে থাকলো হঠাৎ। সন্ধ্যারতির শব্দ শুনে আরও যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অনঙ্গমোহন।

রাধারাণী ছু'হাত জোড় ক'রে কপালে তুললো। গৃহদেবতাকে স্মরণ করলো হয়তো।

—হ্যাঁ রাঙাদাছ। কলকাতা থেকে নাকি ছু' ছু'জন বাঈজী আসছে। নায়েব মশাই ইষ্টিসানের গাড়ীর জন্যে ফটকে ধর্ণা দিচ্ছে কতক্ষণ থেকে!

—আমার ছেলে এখনও কেন ফিরছে না বলতে পারো। ছ'টা পঁয়ত্রিশের ট্রেন মিশ্ করবে, মণিমোহন আমার সে ছেলে নয়। কি যে হ'ল আজ কে জানে!

রাধারাণী কৌতূহলী হয়ে শুধোলে,—মণিকাকা কেন কলকাতায় গেছেন রাঙাদাছ? কেন, জরুরী কাজ ছিল বুঝি?

মুখখানা অনঙ্গমোহনের কালো হয়ে যায় রাধার প্রশ্নে।

এক মুহূর্ত্তে মুখের আকৃতির কত পরিবর্ত্তন হ'তে পারে মানুষের! মুখের চুরুট মুখেই থাকে, নামে না আর। দাঁতের চাপে আটকে থাকে। অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অনঙ্গমোহন বললেন,—আমিই পাঠিয়েছি। আমার কাজেই গেছে সে। আমিই তাকে পাঠিয়েছি।

রাধারাণী আর কিছু বলে না। আর কৌতূহল প্রকাশ করে না।

তার রাঙাদাছর মত ব্যস্তও হয় না সে। মনে মনে হাসে। রাধারাণী জানে, বেশ ভালই জানে। তাই আর বেশী কথা ব'লে অনঙ্গমোহনকে অপ্রস্তুত করতে চায় না, লজ্জা দিতে চায় না।

কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! অথচ ঘরে একটিও বাড়তি চেয়ার নেই। কারও বসতে ইচ্ছা হয় ঘরের খালি মেঝেয় বসতে হবে তাকে। তবুও রাধারাণী খেয়ালের বশে ভুল করলো। অনঙ্গমোহনের খাটের ছুগ্ধফেননিভ বিছানার এক কিনারায় বসেছে কি বসেনি রাধারাণী, হঠাৎ বিকট চীৎকার করলেন অনঙ্গমোহন। কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলে বললেন,—এই, এই এই যাঃ!

চীৎকার শুনে আর বসলো না রাধারাণী।

খাটের কাছ থেকে স'রে ক' হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। অনঙ্গমোহন এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—তোমাকেও এখনও ব'লে দিতে হবে রাধা? তোমরা জানো যে আমি আমার বিছানায় বসতে পর্য্যন্ত কাকেও এ্যালাউ করি না, তবুও কথাটা অ্যাট অল্ মনেই পড়লো না! করলে কি বল' দেখি! দাও, বিছানার ওখানটা ঠিক করে দাও। চাদরটা ভাঁজ খেয়ে গেছে, ঠিক কর' এখন।

রাধারাণী হেসে ফেললো। বললো—রাঙাদাদু যেন কি! আমরা কি অস্পৃশ্য? অশুচি?

—না ভাই তা নয়। আন্‌টাচেবিলিটির কোশ্চেন নয়, আই ওয়াণ্ট্ ক্লিন্‌লিনেস্। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আর কিছুই নয়। অনঙ্গমোহন কথা বললেন ভীষণ ধীর কণ্ঠে। কে বলবে যে, তিনি আবার এই কণ্ঠ পঞ্চমেও তুলতে পারেন!

সত্যিই বিলাস কিংবা অস্পৃশ্যতা নয়, পরিচ্ছন্নতা।

যেখানকার যেটি সেখানেই সেটি থাকবে। ধূলি-মলিন হলে চলবে না। অনঙ্গমোহনের দৃষ্টিতে পড়লে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন তিনি। যতক্ষণ না সাফ করা হচ্ছে ততক্ষণ শান্ত হবেন না। অনঙ্গমোহনের ঘরে কত কি আছে প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের, কিন্তু এক কণা ধূলো কোথাও নেই। সাজানো গোছানো ঘর না দেখতে পেলেই অশান্তি। দুগ্ধফেনানিভ বিছানার কোথাও খাঁজ পড়বে না; একটি বালিস নড়বে না; অনঙ্গমোহন ছাড়া কারও স্থান হবে না। বিছানায় বসতে পর্য্যন্ত দেবেন না কাকেও, তা সে যতই নিকটতম হোক। অপরিচ্ছন্ন শয্যায় কিছুতেই ঘুম আসবে না তাঁর; ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

—এই বইগুলো কি বই রাঙাদাদু?

ঘরের এক কোণে ছিল একটি তেপায়া। সেখানে ছিল একই আকারের অনেকগুলি চটি বই। ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা। সেগুলোর প্রতি আঙুল দেখিয়ে কথাগুলি বললে রাধারাণী। মুখে তার চাপা হাসি। নীলাম্বরীর আঁচলে চাপা ওষ্ঠাধর।

অনঙ্গমোহন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন বইগুলির প্রতি। তাঁর কর্ণমূল রক্তাভ হয়ে উঠলো। মাথাটি তিনি নত করলেন। নতমুখ হয়েই বললেন,—সব কিছুতেই কি তোমার দরকার? তুমি বুঝবে না ওসব বই। রেখে দাও, হাত দিও না।

রাধারাণী হাসি লুকিয়ে বললে—উপন্যাস কিম্বা গল্পের বই তো আর নয় যে হাত দেবো! তা আমি জানি। তবুও বল না কি বই? কি আছে এ বইয়ে?

কথার কোন জবাব দিলেন না অনঙ্গমোহন।

পরিপূর্ণ বিরক্তিতে মুখের রেখাসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিব্রত বোধ করছেন তিনি। লজ্জানুভব করছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছেন না তিনি। মিথ্যা কথা বলবেন কি বার্দ্ধক্যে পদার্পণের পরেও।

রাধারাণী খিল খিল শব্দে হঠাৎ হেসে ফেললো।

চোখে-মুখে আঁচল চেপে সে কি হাসি! যেন কখনও থামবে না সে হাসি। কি এক গোপন তথ্য যে ফাঁস হয়ে গেছে! অনঙ্গমোহন যেন ধরা পড়ে গেছেন। চোর-চোর খেলায় আসল চোরটি যেন ধরা পড়েছে। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছেন অনঙ্গমোহন। তবুও তিনি বললেন,—দু' একখানা উপন্যাস কি তুমি পড়তে চাও? আমার বইয়ের আলমায়রা খুলে নিয়ে নাও।

রাধারাণী হাসির বেগ সামলাতে পারে না। হাসতে হাসতেই বলে,

—উপন্যাস পড়তে নিয়ে যাই তোমার কাছ থেকে, তারপর মা যখন ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসবেন ?

অনঙ্গমোহন বললেন,—তোমার মা তা হ'লে দেখছি খুবই কড়া। ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে, সে আবার কি ! সত্যি কথা না কি ?

হাসি থামায় রাধারাণী। হাসির বেগে তার দু'চোখ সজল হয়ে গেছে। হাসি থামিয়ে বলে,—হ্যাঁ গো রাঙাদাদু। মা যে এত রাগতে পারে কোন দিন আমি দেখিনি।

কথার প্রসঙ্গটির মোড় ঘুরছে দেখে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হন অনঙ্গমোহন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অল্প হেসে বললেন,—কেন, তুমি কি দোষ ক'রেছিলে ? তোমার অপরাধ ?

প্রায় চুপি চুপি কথা বলে রাধারাণী। মুখের আঁচল খসিয়ে দিয়ে বললে,—আমার অপরাধ ? আমি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পড়ছিলুম শরৎবাবুর 'পরিণীতা'। জানালার ফাঁক থেকে মা দেখতে পেয়েছিলেন।

—তাই জন্যে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসতে হবে! সহাস্যে বললেন অনঙ্গমোহন। অল্প হাসি হেসে বললেন,—সে কি কথা !

রাধারাণীর মুখে অল্পক্ষণের জন্য ভয়ের আশঙ্কা দেখা যায়। সে যেন এখনও চোখে দেখতে পায় তার মায়ের রুদ্রমূর্ত্তি। 'পরিণীতা' বইখানি মেয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন বাড়ীর পুকুরে। যা মুখে এসেছিল বলেছিলেন। শুধু মারতে বাকী রেখেছিলেন।

কপালের 'পরে নেমে আসা রুক্ষকুন্তল হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে রাধারাণী বললে,—একেবারে ঝাঁটা নিয়ে সত্যিকার তেড়ে না এলেও সত্যি সত্যিই মা সেদিন কি ভীষণ চ'টে গিয়েছিলেন। মায়ের অমন রাগ কোনদিন দেখিনি।

অনঙ্গমোহন কথা বলছেন, কিন্তু অন্য মনে।

মন তাঁর প'ড়ে আছে অন্য কোথাও। ছেলে এখনও ফিরলো না আজ। ট্রেণ ফেল করলো কি না কে বলতে পারে! হয়তো হেরে গেছে আজ, গোহারাণ হেরে গেছে মণিমোহন, তাই ফিরলো না আর। ট্রেণভাড়ার পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না। কত আকাশ-পাতাল কল্পনাই করেন অনঙ্গমোহন। মন যেন তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে। মুখে কথা আসছে না। চুরুটে টান দিয়ে চলেছেন একের পর এক।

—ও বইগুলো যে তোমার ঘোড়দৌড়ের বই, তা আমি জানি রাঙাদাদু, তুমি যতই লুকোও। আজ পর্য্যন্ত ঘোড়দৌড়ে কত টাকা ঢাললে বলতো?

সহসা এ কি এক প্রসঙ্গ তুললো রাধারাণী! যার ভয়ে এত লজ্জার ভয় পেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন, ঠিক সেই আসল কথাটি এত সহজে বলে দিলো তার মুখের ওপর! কি নির্লজ্জ রাধা!

বেজায় অপ্রস্তুত হলেন মানুষটি। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলেন ক্ষণেকের মধ্যে। ছাইদানে চুরুটের ছাই ফেলতে থাকলেন। একেবারে নিরুত্তর অনঙ্গমোহন। শুধু ঘোড়দৌড়ের বই ঘরে থাকলে কোন লজ্জাই ছিল না, কিন্তু ঘোড়ার খুর আঁকা ঐ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছেন অনঙ্গমোহন স্বয়ং। আর আছে জড়িয়ে কত যে অজস্র টাকা! অনঙ্গ-মোহনের জয়পরাজয়ের কত ইতিকথাই না লেখা আছে কেউ জানে না।

আরাম-কেদারা ত্যাগ করলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে যাতে বিচ্ছেদ টানা যায় তাই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ঈষৎ আনত হয়ে চললেন। বয়সের প্রাচুর্য্যে মেরুদণ্ড বাঁকতে বসেছে। ঘরের বাইরে দরদালানে চ'লে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

আঃ!

উন্মুক্ত আকাশ। মুক্ত বাতাস। বাতাসে রাত্রির স্নিগ্ধতা।

দীর্ঘ দালানের জাফ্রি-জানলার প্রায় সবই খোলা। হাওয়ার অবাধ যাওয়া আসায় দালানে যেন একটা ছোট খাটো ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। চায়ের পাত্রে তুফান!

অনঙ্গমোহনের মনেও বুঝি বা তুফান বইতে থেকেছে। রাধার মত একটি মেয়ের একটি মাত্র কথায় যেন তার ওলট-পালট হয়ে গেছে। কি অপরিসীম লজ্জাই না পেয়েছেন। দালানের অন্ধকারে গিয়ে মুখ লুকোতে হয়েছে শেষে কি না।

রাধারাণীও ক্রমে বুঝলো, তার রাঙাদাদু মনে মনে নিদারুণ লজ্জিত হয়েছেন! হার স্বীকার করে পালিয়ে গেছেন ঘর থেকে। হার মেনে নিয়েছেন নীরবে।

ঘোড়দৌড় বা রেশ্-খেলার লজ্জায় অনঙ্গমোহনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে রাধারাণীও দুঃখ অনুভব করলো। সেও এতক্ষণে লজ্জা পায়। কেন যে মরতে বলতে গেল এই ধরণের কথা, যে-কথায় এতটা বিব্রত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছেন রাঙাদাদু! দিন দিন কেমন যেন রাধারাণীর প্রকৃতিটা ঐ মাথার রুক্ষকেশের মতই রুক্ষ হয়ে উঠছে! যাকে তাকে বলছে এমন ধারার কথা, যে-কথায় মিষ্টি নেই শুধুই তিক্ততা। বড় যেন কটুভাষী হয়ে পড়ছে রাধারাণী!

—রাঙাদাদু!

ডাকলো রাধারাণী। ডাকলো স্নেহভরা কণ্ঠে।

কোন সাড়া মিললো না। অনঙ্গমোহন নিরুত্তর। নির্ব্বাক।

আবার ডাকলো রাধারাণী,—ও রাঙাদাদু!

ডাক শুনে আর নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। সাড়া দেন। বলেন,

—কি বলবে বল।

রাধারাণী বলে,—রাঙাদাদু, সদর থেকে খোঁজ নিয়ে আসবো? মণি কাকা কলকাতা থেকে ফিরলো না যে এখনও!

—যাও না ভাই। বড্ড উপকার হয়। শ্যামাপদটা যে কোথায় ডুব মারলো কে জানে। ডেকে দিতে পারো ষ্টুপিডটাকে?

অনঙ্গমোহন কথা বলেন সবিশেষ আগ্রহের সঙ্গে। কে বলবে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তিনি এত লজ্জা পেয়েছেন! রাধারাণীর প্রস্তাবে স্বস্তির শ্বাস ফেলেন।

—যাই, তবে যাই।

বললো রাধারাণী। ঘরের আয়নায় তখনকার মত নিজেকে সে শেষ দেখে নেয়। কি উগ্রই না দেখতে হয়েছে! রুক্ষকেশের বাসি খোঁপা যেন মাথা থেকে ঝুলে পড়তে চাইছে। অবাধ্য কুন্তলগুলি হাওয়ায় উড়ছে থেকে থেকে। ফর্সা রঙ; রুক্ষতায় আরও যেন শুভ্র হয়ে গেছে রাধারাণীর মুখ, হাত, পা। চোখের কোলে কি বিশ্রী কালি পড়েছে!

রাধারাণী তার নীলাম্বরীর নীল আঁচল উড়িয়ে অকস্মাৎ কখন যে বেরিয়ে গেছে। অনঙ্গমোহন দরদালানে থেকে চুপিসাড়ে দেখছিলেন, মেয়েটা কি ঘর থেকে গেছে! ঘর শূন্য হয়েছে দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'লেন। কিন্তু আবার যদি আসে ঐ মুখকাটা বাচাল মেয়েটা!

চন্দনপুরের বাতাসে চুরুটের উগ্রগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছেন অনঙ্গমোহন। মনের মধ্যে অধীর প্রত্যাশা ও নিবিড় ব্যাকুলতা। কত ঘন ঘন চুরুটে টান দেন আজ। তেমনি অনর্গল ধূম্র উদ্গীরণও করেন। মাথার মধ্যে ঘোর দুশ্চিন্তা। অন্ধকার শূন্যে চোখ তুললেন অনঙ্গমোহন। কোথাও কিছু চোখে পড়ে না নিঃসীম আঁধারে! দূরে বহুদূরে গাছ-গাছড়ার ফাঁক থেকে উঁকি মারে ইতস্তত কয়েকটি আলোকবিন্দু। এখানে সেখানে ছড়িয়ে

আছে, মৃতকল্পের আত্মার মতই যেন ধুক পুক করছে। যে-কোন ক্ষণে দপ্ করে নিবে যেতে পারে।

চন্দনপুরের দরিদ্র বাসিন্দাদের খড়ের চালায় আলো জ্বলছে।

বিজলী নয়, তৈল-প্রদীপ। আলোর তেজ নেই, তাই ক্ষণস্থায়ী। অনঙ্গমোহন বহু চেষ্টা সত্বেও আর কিছু দেখতে পান না। সদরের ঘরে ঘরে উজ্জ্বল-আলো জ্বলতে দেখেন! ঘোর রক্তবর্ণ ভেলভেটের পর্দ্দা ঝুলছে দেখেন।

কিন্তু, সারেঙ্গীর গুমরানি শুনলেন না কেন এখনও! নিজের কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রতি সন্দেহ জাগে। হয়তো সারেঙ্গীতে সুর ধরা হয়েছে, তাঁর কানেই শুধু পৌছালো না।

আকাশে কি তারা ফুটেছে!

অনঙ্গমোহন আকাশে চোখ তুললেন। আকাশের ইদিক-সিদিক দেখলেন। ঘন তমসাবৃত আকাশ। সোনালী তারা জ্বলছে মাত্র কয়েকটি। কত দূরের ব্যবধান একের মধ্যে একের।

কিন্তু মণিমোহন এখনও পর্য্যন্ত ফিরলো না কেন?

সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসে আছে হয়তো, এই একটি কথাই বার বার উঁকিঝুঁকি মারে মনশ্চক্ষে। যখনই মনে পড়ে হতাশার শ্বাস ফেলেন। দীর্ঘশ্বাস।

রেশখেলার সময় নয় এখন। ঘোড়দৌড়ের সীজন এটা নয়।

তথাপি, কলকাতার মত দুনিয়ার এক বিখ্যাত আজব শহরে জুয়ার আড্ডার অভাব নেই! কোথায় আছে সহজে জানা যায় না, খুঁজে নিতে হয়! ঘোড়দৌড়ের ঋতুতে আর কোন বালাই থাকে না। অনঙ্গমোহন তখন তাঁর ছেলে মণিমোহনকে সোজা গড়ের মাঠে পাঠিয়ে দেন। মণিমোহনের জামার পকেটে দিয়ে দেন খেলার টাকা, আর তার মগজের মধ্যে দিয়ে দেন কয়েকটি বিশিষ্টতম ঘোড়ার নাম—যাদের জন্ম-ইতিহাস

আছে, যাদের পূর্ব্বপুরুষ কৌলিন্যের প্রতিভূ ছিল। তাদের নাম আর দেহের ওজন। কয়েকজন জকীর নাম!

এখন ঘোড়দৌড়ের সময় নয়।

এ খেলা যখন তখন খেলা যায় না। দিনক্ষণ থাকে এ খেলার। পালে-পার্ব্বনে খেলতে হয়। তাও বেশীর ভাগ খ্রীশ্চানী পর্ব্বে। এক্সমাস্ আর গুড ফ্রাইডের মহালগনে।

খোলা মাঠের খেলা নাই বা চললো।

তাই বলে বন্ধঘরের খেলা বন্ধ থাকবে না কি! কলকাতার মত আজব শহরের অলিতে-গলিতে আছে এমন অনেক রুদ্ধদ্বারকক্ষ, যেখানে দিবারাত্র টাকার খেলা চলেছে। টাকা টাকা খেলা। জুয়া খেলা।

সন্ধান খুঁজে পাওয়া গেলে আর আড্ডার পুরানো জুয়াড়ীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে, যে কোন লোক সেখানে গিয়ে কড়ি ফেলে তেল মাখতে পারে। নির্ব্বিবাদে।

মণিমোহনও গেছে কলকাতায়। কোন জুয়ার আড্ডায়।

পাঁচ টাকাকে দশ টাকায়, দশকে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো টাকায় পরিণত করতে গেছে। অবশ্য যদি ভাগ্যে থাকে, নয়তো সবই যাবে। এক কপর্দ্দকও থাকবে না। মণিমোহনকে স্বেচ্ছায় পাঠিয়েছেন অনঙ্গমোহন। আজ নয়, অনেক দিন থেকেই পাঠাচ্ছেন। যতদিন থেকে জমিদারী ভাগাভাগি হয়েছে। যতদিন থেকে জমিদারীর আয় কমেছে। প্রজার দলকে দল মুখ ফিরিয়েছে।

ছেলেকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন বাবা।

টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার গোপন রহস্যগুলি শিখিয়েছেন অনঙ্গমোহন। ছেলে মণিমোহনের বুঝতে সময় লেগেছে। একদিনে কিংবা এক বছরেই সে পাকা হয়নি। বছরের পর বছর ধ'রে কত অজস্র

টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে তবে মণিমোহন এ লাইনের কিছু কিছু বুঝেছে। জেনেছে।

কি এক শব্দ শুনেছেন অনঙ্গমোহন।

কার পায়ের শব্দ! যেন চেনা চেনা। মুখের চুরুট নামিয়ে রাখলেন ছাইদানে। তাড়াতাড়ি এগোলেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন সাগ্রহে।

কিছু কি ছাই দেখা যায়!

বাবুদের ঘরে ঘরে আলো জলছে। বাবুদের খাসকামরায় পঁচাত্তর থেকে একশো বিদ্যুৎশক্তির বল্ জলছে। অন্দরের দালানগুলোয় কে জ্বালবে আলো! কার দায় পড়েছে যে বারোয়ারী দালানে আলো জ্বালতে যাবে!

তাই কে আসে আর কে যায়, দেখা যায় না।

আর কতক্ষণ রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকবেন অনঙ্গমোহন।

থাকতে পারছেন না যেন! বললেন,—কে, মণিমোহন না কি?

—হ্যাঁ বাবামশায়।

—এত দেরী কেন? আমিতো ভেবেই সারা হচ্ছি।

এতক্ষণ যার জন্য মিনিট গুণছিলেন অনঙ্গমোহন, তাকে চোখের সুমুখে দেখতে পেয়ে যেন বিলকুল দুশ্চিন্তা ভুলে গেছেন। মনের ক্ষোভ মুছে গেছে। ঘর্মাক্ত জামা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকলো মণিমোহন।

ভেতরের ছিঁড়ে-যাওয়া গেঞ্জীটা একেবারে ভিজে গেছে ঘামে। ঘরের বিজলী পাখার সুইচটা টিপে, জামাটি আনলায় রাখতে রাখতে মণিমোহন বললে,—মিশ্ করেছি বিকেলের ট্রেনটা।

—আমিও তাই আন্দাজ করেছি। বললেন অনঙ্গমোহন! আরাম-

কেদারায় নিশ্চিন্তায় বসতে বসতে বললেন!—আন্দাজ করেছি তো ঠিক। মনটা যে আনচান করতে থাকে যতক্ষণ না ফিরতে দেখি তোমাকে!

মণিমোহন বিজলী পাখার নীচের মেঝেয় ব'সে পড়লো।

বড় বেশী ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। সেই সকাল সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেতে হয়েছিল কোন রকমে চান-খাওয়া সেরে। নাকে-মুখে গুঁজে দৌড়তে হয়েছিল চন্দনপুর ষ্টেশনের পথে! ষ্টেশনে যখন পা দিয়েছিল, ঠিক তখন প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা ব্রেক্ কষতে কষতে ঢুকছে ষ্টেশনে। যদিও বা প্রায় ছুটতে ছুটতে ষ্টেশনে পৌছানো গেল মুখে রক্ত তুলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে পেরোতে হয়েছিল ওভার-ব্রীজ—কাটতে হয়েছিল থার্ড ক্লাসের টিকিট একখানা। সওয়া ছ' আনার।

তারপর ট্রেনে উঠে সে কি ভীড়ের সঙ্গে লড়াই! শুধু মাত্র দাঁড়ানোর জন্য একটুকু স্থানলাভের জন্য কি ভীষণ ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি! সহযাত্রীরা সকলে মানুষের মত মানুষ হ'লেও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র জায়গা কেউই ছাড়তে চায় না। সহযাত্রীদের সঙ্গে কলকাতার বাজারের জন্য বৈশাখী ফলমূলও যে চলেছে। আম কাঁটাল লিচুর ঝুড়ি। কাঁদি কাঁদি কলা। ঘরে কাটানো ছানার টুকুরী শত শত। ট্রেনের মধ্যে পা দেয় কার সাধ্য! ছানার চুয়ানো জলে জলময় হয়েছিল কামরাখানা।

—হুজুর কত ব্যস্তই না হচ্ছিলেন আপনার তরে! কথা বলতে বলতে শ্যামাপদ আসে। দু'হাতে তার চায়ের পিরিচ-পেয়ালা আর খাবারের রেকাবী।

মেঝেয় নামিয়ে দিতে তর সয় না যেন মণিমোহনের।

কি জ্বালাময়ী ক্ষুধায় যে সে জ্বলছে, কে জানবে, কে বুঝবে! এই যে সারাটি দিন কলকাতার মত শহরের জুয়া আর জুয়াড়ীদের আড্ডায় কাটিয়ে এলো মণিমোহন, কে তার সঙ্গে ছিল? কেউ নয়। একটিও চেনা মুখ

নেই। একজনও নেই। কত জাতের মানুষই না দেখে মনিমোহন! জুয়ার আড্ডায় পৃথিবীর কত জাতের মানুষই না আসে। দেশীর সঙ্গে বিদেশীর এক হওয়ার এমন বিচিত্র মিলন-মন্দির দুনিয়ায় আর কি আছে! মাঝে মাঝে হাসি পায় মনিমোহনের, ইংরাজ-কবি রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্‌-এর কাব্য-পঙক্তি মনে পড়লে মনিমোহন হাসে। কিপলিং নাকি কাব্যি করে বলেছিলেন, ইষ্টএর সঙ্গে ওয়েষ্টএর মিলন নৈব নৈব চ।

একটা টোষ্ট্‌, নুন-মরিচ মাখানো একটা টোষ্ট এক নিমিষে যেন খেয়ে ফেললে মনিমোহন। আরেকটি টোষ্ট মুখের কাছে তুলে ধ'রে বললে,— সদরে আজ এত আলো কেন?

এক অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটলো অনঙ্গমোহনের মুখে। এতক্ষণে হাসলেন যৎসামান্য। সারা দিনে এই বুঝি প্রথম হাসলেন। বললেন,— শুনছি, আজকে নাকি হোল্‌ নাইট্‌ পারফরমেন্স্‌। কলকাতা থেকে বাঈজী আসছে।

—তাই নাকি? বাঈজী আসছে?

টোষ্টে কামড় দিতে দিতে বললে মনিমোহন। কথার শেষে চায়ের পেয়ালা তুললো অন্য হাতে। গলা ভিজিয়ে নিতে চায় হয়তো।

—হ্যাঁ, তাইতো শুনছি। কিন্তু—

কথা শেষ করলেন না অনঙ্গমোহন।

শ্যামাপদ যে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে! সে ভৃত্য, তার সামনে কখনও বলতে পারেন! সামলে নিলেন কথা।

চায়ের পেয়ালায় গোটা দুয়েক চুমুক দিয়ে মনিমোহন বললে,—কিন্তু?

—আচ্ছা, আই উইল্‌ টেল্‌ ইউ আপ্‌টারওয়ার্ডস্‌। পরে বলছি তোমাকে। তুমি আগে খেয়ে নাও। ফিনিশ্‌ ইওর মিল্‌।

শ্যামাপদর প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলেন অনঙ্গমোহন।

মনিমোহন চোখের ইসারায় কি যেন বললে শ্যামাপদকে। ক্ষীণ হাসির সঙ্গে কি একটা ইসারা করলো। যাকে করলো সে আর কালবিলম্ব করলো না, চলে গেল তৎক্ষণাৎ।

অনঙ্গমোহন বললেন,—বলছিলাম কি, তুমি যেন জয়েন্ ক'রো না। ডোণ্ট্ পারটেক্! যেও না যেন ঐ বাঈজীর জলসায়।

—আপনি বেঁচে থাকতে আমি বাঈনাচ দেখতে যাবো? আপনি কি তাই মনে করেন আমাকে?

মনিমোহন কেমন যেন উগ্র মেজাজের সুরে কথা বললে। তাকিয়ে রইলো পিতার চোখে চোখ রেখে। হাতের পেয়ালা মেঝেয় নামিয়ে রাখতে যাবে এমন সময়ে মিহি কণ্ঠে বললেন অনঙ্গমোহন,—নেভার, নেভার, তোমাকে আমি তেমন মনে করি না বলেই বলছি। কৈ, বাড়ীর অন্য কাকেও ডেকে আমি বলতে গেছি!

—ভেবেচিন্তে কথা বলবেন আপনি।

রুক্ষস্বরে বললে মনিমোহন। রেকাবী থেকে তুলে নিলে কি একটি সন্দেশ। দোকানের তৈরী, নরম পাকের। কামড়ে কামড়ে আর খায় না এ সাইজের সন্দেশ, তাই একগালে পুরে ফেললো সন্দেশটা। যদি বা আরও একটি থাকতো রেকাবীতে। একটি মাত্র, তারই নাকি দাম চার আনা।

—ভুল হয়েছে আমার। আকাশে মেঘ দেখলেই যে ভয় পাই! আই বেগ্ ইওর পার্ডন্।

কেমন যেন অনুশোচনার সঙ্গে বললেন অনঙ্গমোহন। আরাম-কেদারায় এলিয়ে দিলেন দেহ। দু'চার সেকেণ্ড নীরব থেকে বললেন,—লেট্ ইট্ গো। যেতে দাও। এখন যেজন্যে গিয়েছিলে তার কি রেজ্যাল্ট্ তাই বল। কি ফলাফল!

পেয়ালায় শেষ চুমুক দেয় মনিমোহন।

আকণ্ঠ চা পান করে। যতটুকু অবশিষ্ট ছিল খেয়ে নেয় এক চুমুকে। পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললে,—জিতেছি আজ। জামার পকেটে টাকা আছে, উঠে দিচ্ছি আপনাকে।

খুশীর উচ্ছ্বাসে হেসে ফেললেন অনঙ্গমোহন। শিশুসুলভ হাসি।

হাসতে হাসতেই বললেন,—কনগ্র্যাচুলেসন! কনগ্র্যাচুলেসন! তুমি দেখছি একটা পাক্কা খেলোয়াড় হয়ে উঠলে। কি খেললে আজ?

—তাস। বললে মনিমোহন। বললে,—চীনেপাড়ায় গিছলাম আজ। ফিয়ার্স লেনে। লালবাজারের কাছাকাছি।

হাসি থেমে গেছে, মুখের হাস্যরেখা তবু মিলোয় না। হাসি-হাসি মুখে অনঙ্গমোহন বললেন,—ক' রাউণ্ড্ খেললে?

—তেরো রাউণ্ড। ঠিক মনে নেই! এক আধ রাউণ্ড কম বেশীও হতে পারে।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো মনিমোহন। দেওয়ালের ঝোলানো আনলায় টাঙানো জামার পকেট থেকে বের করলো লম্বা লেফাফা একটি। ভাঁজ করা খাম।

অনঙ্গমোহনের বুকের ভেতরে কে বুঝি হাতুড়ী পিটছে।

কি অদম্য উৎসাহ, কি ব্যাকুল ব্যগ্রতা! আনন্দের আতিশয্যে হয়তো বা প্যাল্পিটেশন্ হচ্ছে। ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন আর কি অনঙ্গমোহন! খামটি তাঁর হাতে পড়তেই তিনি বললে,—কত টাকা নিয়ে গিয়েছিলে, আছেই বা কত?

খেঁকিয়ে উঠলো মনিমোহন। বিরক্তির সঙ্গে বললে,—মনে নেই আপনার? দিয়েছিলেন মাত্তর কুড়িটি টাকা, দু'খানা দশ টাকার নোট।

আর খামের মধ্যে আছে পুরো আশী টাকা, আটখানা দশ টাকার নোট। খুলে দেখুন না কেন!

—ছাট্‌স রাইট্। বললেন অনঙ্গমোহন।

মনিমোহনের আর এক দণ্ড সেখানে দাঁড়াতে মন চায় না। দেওয়ালের আনলা থেকে টাঙিয়ে রাখা জামাটি পেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চায়ের পর আর যাই হোক, একটি সিগারেট না ধরালে কখনও ভাল লাগে? সিগারেট খাওয়ার টাইম এখন মনিমোহনের—জন্মদাতা হ'লে কি হবে অনঙ্গমোহনও তা জানতেন। এখন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আর টিকি দেখতে পাওয়া যাবে না ছেলের। একটা কাঁচি সিগারেট যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে।

আবার কতক্ষণ পরে সাক্ষাৎ মিলবে, তাই অনঙ্গমোহন ডাকলেন,—মনিমোহন, যেও না, শুনে যাও। কথা আছে।

ফিরে এলো মনিমোহন।

বললে.—কি বলছিলেন?

—তুমি যে টাকা চেয়েছিলে। বলেছিলে, দর্জ্জির দোকানে তোমার তৈরী জামা না কি পড়ে আছে, টাকার জন্যে আনতে পারছো না! কত টাকা?

অনঙ্গমোহন খামের মুখে আঙ্গুল চালাতে চালাতে কথা বলেন। কাজ মিটিয়ে নিতে চান তিনি। ফেলে রাখতে চান না ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়।

—সাড়ে আট টাকা। চারটে সাদা টুইল সার্টের মেকিং চার্জ্জ। বললে মনিমোহন। বিরস কণ্ঠে।

—এই নাও। হ্যাভ্ ইট্ উইত্ ইউ।

কথা বলতে বলতে একখানি দশ টাকার নোট তুলে ধরলেন

অনঙ্গমোহন। বললেন,—বাকী আর ফেরৎ দিতে হবে না। রেখে দিও তোমার কাছে। তোমার কখন কি দারকারে লাগে।

দশটাকার নোটখানি নিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মনিমোহন। একটি বাক্য ব্যয় করলো না।

হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছেন অনঙ্গমোহন। এতই আনন্দ। কত কত দিন যে মন খুলে হাসেননি তার ঠিক আছে! জুয়া বা ঘোড়দৌড়ে দশ বিশ ত্রিশ টাকা পাওয়াটা এমন কিছু কল্পনার অতীত নয়, বরং হামেসাই মেলে। পঞ্চাশোর্দ্ধেও ওঠে কখনও কখনও। এমন কি শতাধিকও কতদিন মিলেছে। তবু আজকের টাকা হস্তগত হ'তে মন মেজাজ অন্য রকম হয়ে যায়; ঠিক মন্ত্রবলে কে যেন বদ্‌লে দেয় অনঙ্গমোহনকে। উৎফুল্ল হয়ে তিনি ডাকলেন,—শ্যাম!

অনেক দূরে ছিল শ্যামাপদ।

অন্দরের এক সিঁড়ির মুখে ছিল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল ফিসফিসিয়ে। মনিবের ডাক তার কানে পৌঁছেছিল এত দূর থেকেও।

অনঙ্গমোহন পুনরায় ডাকলেন,—শ্যামা! শ্যামাপদ!

ঘরের অনেক দূরে ছিল শ্যামাপদ।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল কার সঙ্গে। ফিস ফিস কথা। রাধারাণীর সঙ্গে কথা বলছিল। মনিমোহন কলকাতা থেকে ফিরেছে, সেই সংবাদ দিতে আসছিল রাধারাণী। শ্যামাপদর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে আর আসতে দেয়নি রাধাকে। বলেছিল,—দাদাবাবু, যখন ঘরে এসে গেছে তখন আর যেতে হবে না কষ্ট ক'রে।

রাধারাণী বলেছিল,—মনিকাকা ঘরে গেছে রাঙাদাদুর?

—হ্যাঁ। তোমাকে আর যেতে হবে না। কথা বলতে বলতে

খানিক থেমেছিল শ্যামাপদ। ইদিক সিদিক চোখ ফিরিয়ে বলেছিল,—একটি বর না হ'লে যেন রাধাদিদিকে আর মানাচ্ছে না।

অন্ধকারে কারও মুখ কেউ দেখতে পায় না।

তা না হ'লে শ্যামাপদ দেখতো যে, রাধার মুখে বুঝি শ্রাবণের কালো মেঘ নেমেছে। অপরিসীম লজ্জায় সে নতমুখী হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ক'রে বলে,—মেয়েদের কার না আর সাধ যায়, বিয়ে হোক্, শ্বশুরবাড়ীর ঘর সংসার করুক!

—তা তো বটেই। তা তো বটেই। বলেছিল শ্যামাপদ।

রাধারাণী ক্ষুন্নকণ্ঠে .বলেছিল,—বিয়ে হওয়া না হওয়ায় আমার কি কোন হাত আছে? দাদারা অত টাকা খরচা করবেই বা কোথা থেকে, ছেলের পক্ষ যদি এখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চায়? তাও শুধু টাকা নয়, পঞ্চাশ ভরি সোনা চাই, খাট-বিছানা আলমারী চাই, বরের ঘড়ি আঙটি, বোতাম চাই।

মনিবের কাতর ডাক শুনে শ্যামাপদ বললে,—বুড়ো ডাকছে রাধাদিদি। বরপক্ষের যে এত বেশী দাবী তাতো জানতুম না।

অন্ধকারে দু'জনে দু'দিকে মিলিয়ে যায়।

—ডাকছিলেন হুজুর?

ঘরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে শ্যামাপদ। সসঙ্কোচে।

—তুমি ছুটি নাও শ্যামাপদ। জাষ্ট্ টেক লীভ। আমি তোমাকে ছুটি দিচ্ছি।

অত্যন্ত সহজ সুরে কথা বলেন অনঙ্গমোহন। অত্যন্ত ধীরে ধীরে।

—কেন হুজুর একথা বলছেন? অধমের অপরাধ?

শ্যামাপদ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে কথা বলে।

অনঙ্গমোহন সহজ সুরেই বলেন,—ডাকলে যদি সাড়া না পাওয়া যায়, ঘণ্টায় চার বার ক'রে তুমি যদি এখন ডুব মারতে চাও তা হ'লে আমিতো নাচার। তার চেয়ে টেক্ লীভ্ এণ্ড্ গো হোম। আমি অন্য লোক দেখি।

হতাশ-চোখে চেয়ে থাকে শ্যামাপদ। কথাগুলি শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনিবের চোখে চোখ রাখতে পারে না, ঘরের মেঝেয় চোখের দৃষ্টি নামায়। সলজ্জায়!

—কথা কইলে না যে?

যাকে তিরস্কার করছেন তার নীরবতা অসহ্য মনে হওয়ায় অনঙ্গমোহন পুনরায় কথা বললেন।—কথা কইলে না যে?

মেঝের থেকে চোখ তোলে না শ্যামাপদ। আনত দৃষ্টিতেই কথা বললে,—এই শেষ বয়েসে কোথায় আর যাবো, কে কাজ দেবে?

—হ্যাট্ আই নো নট্। তা আমি জানি না। বললেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—ইম্পার্টিনেণ্ট, ফুল! তোমাকে ডাকতে ডাকতে আমার গলার শির বোধ হয় ছিঁড়ে গেল! তোমাকে ডাকাডাকি করতে দেখছি একটা লোক পুষতে হবে!

শ্যামাপদ আমতা অমতা করে। বলে,—কোন' কাজ-কম্ম ছিল না এখন। দাদাবাবুকে চা জল খাবার দিয়ে ঐ দালানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আর আপনিও ডেকেছেন। আপনি আর দাদাবাবু হয়তো কোন' প্রাইভেট কথা কচ্ছিলেন তাই আমিও আর—

—ঢের হয়েছে! আর সাফাই গেও না, থাক। বললেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—আমি এক কাপ চা খেতে চাই। পাওয়া যাবে?

মনিবের কথার মোড় ঘুরেছে, মনে মনে উল্লসিত হয় শ্যামাপদ।

বলে,—এখুনি দিচ্ছি হুজুর। তখন তো কিছু মুখে তোলেননি। দু'খানা টোষ্ট ?

না, আর কিছু নয়। শুধু এক পেয়ালা চা।

কথার মাঝেই কথা বললেন অনঙ্গমোহন! কথার শেষে আরাম-কেদারায় দেহ এলালেন। হাতের মুঠোয় ধ'রে আছেন জুয়া খেলায় জিৎ হওয়ার টাকা-ভর্ত্তি খাম। একান্ত পিতৃভক্তের মত যে-টাকা খানিক আগে মনিমোহন হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

টাকা হাত পেতেই নিয়েছিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন বার বার খোঁচা লেগেছিল। অপমানের খোঁচা। অনঙ্গমোহনকে শেষে কিনা ছেলের কাছে হাত পাত্‌তে হয়! কি লজ্জার কথা! যদিও তাঁর এমন দুরবস্থা কোন দিন আসেনি ইতিপূর্ব্বে। জমিদারীর আয় বর্ত্তমানে সিকির সিকি হয়ে গেছে। নাম মাত্র আয়। নামেই মাত্র জমিদারী। তাতেই এখন এই ভিক্ষা চাওয়ার অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। তার ওপর দুরবস্থা অনঙ্গমোহনের ছিল না।

মনিমোহন ছেলেটার সব ভাল, শুধু যা ঐ গোঁয়ারগোবিন্দর মত কথায় কথায় মাথা গরম করে বসে থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যখন মারমুখো হয়ে ওঠে তখন যেন ভয় করে। হবে নাই বা কেন! জুয়ার আড্ডার ক্ষণিকের বন্ধুদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে, মনিমোহন এমন কিছু নির্লিপ্ত সাধু-সন্ন্যাসী নয়। জুয়া যারা খেলতে যায় তাদের কি মূর্ত্তি! তাদের মুখে কি অভদ্র ভাষা! কি অনন্যসাধারণ তাদের ভাবভঙ্গী আর আদব-কায়দা। যেন কোন্ এক অদ্ভূৎ জগতের মানুষ।

কালে-ভদ্রে হ'লে না হয় কথা ছিল, দিনের পর দিন যদি যেতে হয় সেই আড্ডায়, কে আর ভাল থাকতে পারে! মনিমোহন কি মানুষ ছাড়া আর কিছু ?

অনঙ্গমোহন ছেলের চিন্তায় আকুল হয়ে যান।

কিন্তু তিনি কি করতে পারেন? খেয়ে-প'রে বাঁচতে হ'লে একটা কিছু উপায় অবলম্বন করতেই হয়, সৎ হোক অসৎ হোক যা হয় একটা। অনঙ্গমোহনও তাই পিতা হওয়া সত্বেও নিজেই নিজের ছেলের হাতে টাকা তুলে দেন। রেস্ আর জুয়ার টাকা। তাঁর নিজের সামর্থ্য থাকলে নিজেই যেতেন। নেহাৎ শরীরটা বাধ সাধে, বয়সটাও বাধা দেয়।

চুপচাপ থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠছেন অনঙ্গমোহন। কি এক শব্দ শুনছেন কাণে! কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ করেন। কাণের দোষে কি না কে জানে কাণে যেন চাপা কান্না শুনছেন থেকে থেকে। রাত্রির অন্ধকারে দিগ্বিদিক নীরব এখন। তবুও কি ভুল শুনছেন তিনি।

কল্যাণী বৌ কি এখনও কান্না থামায়নি!

রাসমোহনের স্ত্রী কল্যাণী। এখনও সে কি কাঁদছে! সামান্য একটু আইওডিনও কেউ দিতে পারলো না তার রক্তাক্ত ক্ষতস্থানে?

এলোমেলো, কত কথাই মনে উদয় হয় অনঙ্গমোহনের! যদিও তিনি নিরুপায়। তাঁর কিছু করবার নেই। শরিক হয়ে অন্য শরিকের ঘরোয়া কথায় কথা কইতে যাওয়ার মত মূর্খামি আর কিছু আছে না কি! অন্যের ঘরের কথার মাঝে নাক গলাতে কে যায়, একান্ত মূর্খ ছাড়া?

—হুজুর চা এনেছি।

শ্যামাপদর কথা শুনে চোখ খুললেন অনঙ্গমোহন। এতক্ষণ দু' চক্ষু বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন, শুনছিলেন কেউ কাঁদছে কি না। কল্যাণী বৌমার কাতর কান্নার আওয়াজটুকু এখনও যেন কানে ভাসছে তাঁর। হঠাৎ কথা বললেন তিনি,—মনিমোহনের আর দোষটা কি বল'?

—কেন হুজুর, দাদাবাবু আবার কি দোষ করলে ?

কথায় ঈষৎ ব্যগ্রতা শ্যামাপদর।

—না তাই বলছিলাম। বললেন অনঙ্গমোহন, চায়ের পেয়ালা বসানো পিরিচ হাতে নিয়ে বললেন,—তাই বলছিলাম যে, আমি যদি তার জন্মদাতা বাপ হয়ে তাকে জুয়া খেলতে পাঠাই, তাতে আর দোষ কি ?

—হুজুর আমি আর কি বলবো ? হুজুর, যা ভাল বোঝেন করেন।

অনঙ্গমোহন কথার কোন জবাব দিলেন না।

নিরুত্তর হয়ে রইলেন। চায়ের গরম পেয়ালার কিনারায় মুখ ঠেকালেন, কিন্তু এক বিন্দুও পান করলেন না। মুখ ঠেকিয়ে থাকলেন কয়েক মূহূর্ত। কি যেন ভাবছেন, একাগ্রচিত্তে। চোখের দৃষ্টি একদিকে নিবিষ্ট।

—হুজুর, আবার যেন জুড়িয়ে ফেলবেন না পেয়ালার চা! গরম-গরম খেয়ে নেন তো ভাল হয়।

—এঁ্যা? হঁ্যা, খাই। ওদিকে অন্দরে কি ব্যাপার শ্যাম? কথার শেষে এক চুমুক চা পান করলেন অনঙ্গমোহন।

রহস্য মাখানো হাসি হাসলো শ্যামাপদ। শব্দহীন হাসি। বললে,—আর বলবেন না হুজুর। একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। কান পাতা যায় না, চোখে দেখা তো দূরের কথা।

পেয়ালায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট চুমুক দিয়ে অনঙ্গমোহন বললেন,—কেন রে, কি হ'ল আবার ?

ইতি উতি দেখলো শ্যামাপদ। যদি কেউ শুনতে পায়!

বললে,—টাকা তুলতে হচ্ছে যে হুজুর! বাবুরা একটা ফণ্ড্ করেছে। চাঁদা উঠানো হচ্ছে। টাকার যোগাড় করতে হচ্ছে বাবুদের।

—কত টাকার দরকার হ'ল যে টাকার জন্যে বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল ? কি রাজস্য়য় যজ্ঞটা হচ্ছে শুনি ?

কথা শেষ ক'রে আবার মুখে পেয়ালা তুললেন অনঙ্গমোহন।

শ্যামাপদর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় মুহূর্ত্তমধ্যে। বলে,—খরচা নেই হুজুর, বলেন কি ?

—কেন ? কত আর খরচা ? বাঈনাচে আর কত খরচা লাগে ?

—শুধু বাঈনাচ কি হুজুর, আরও কত কি ! ক' ডজন মদের বোতল যে এয়েছে খোঁজ নেন না একটিবার। শত খানেক বোতল জলসোডা। টিন টিন দামী সিগারেট আর চুরুটের বাক্স। ওদিকে ভিয়েনে মাংস, চিংড়ীর কাটলেট, লুচি তোয়ের হচ্ছে বেলা একটা থেকে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে গেল শ্যামাপদ।

—ও গড্ ! তাই না কি ?

শুধোলেন অনঙ্গমোহন।

—শুধু তাই হুজুর ? বাঈজের পায়ে কি আর দু' চারখানা গয়নাগাঁটি পড়বে না ভেবেছেন ?

মৃদু হাসি হেসে বললে শ্যামাপদ।

অনঙ্গমোহনও সহাস্যে বললেন,—না, আমি কিছুই ভাবিনি। গয়নাগাঁটিও পড়বে তুমি বলতে চাও ?

—পড়বে বৈকি, পড়বে না আবার ! টাকা পড়বে, গিনি-মোহর পড়বে, তারপর গয়না পড়তে থাকবে।

শ্যামাপদর কথায় অস্বাভাবিক নিশ্চয়তা। সে যেন ভবিষ্যদ্রষ্টা, যা বলে তাই হয়, এমনই তার কথার সুর।

—গয়না ! বল' কি শ্যাম ?

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বলেন অনঙ্গমোহন।

—হ্যাঁ, হুজুর হ্যাঁ। বললে শ্যামাপদ,—তখন কি আর জ্ঞান থাকবে

বাবুদের কারও! ঐ রকম চড়া চড়া বিলীতি মদ পেটে পড়লে কি জ্ঞান থাকে কখনও কারও?

—তা বটে। দ্যাট্‌স্ রাইট্‌। ইউ আর এ্যাবসোলিউটলি রাইট্‌। ঠিক কথাই তো, বিলীতি মদ কি যা তা চীজ?

সবিস্ময়ে কথা বলেন অনঙ্গমোহন!

কথা মেনে নিয়েছেন মনিব। তবুও কথায় আরও জোর দিয়ে শ্যামাপদ সদম্ভে বললে,—আমি হুজুর বাজে কথা বলি না। আপনি দেখে নেবেন, কথা আমার ফলে কি না ফলে!

অনঙ্গমোহনের দৃষ্টিতে বিস্ময়। তিনি বললেন,—এমন এ্যামিউজমেণ্টের দরকারটা কি? ঘরের মেয়ে-বৌয়ের গায়ের গয়না খুলে বাঈনাচ দেখতে হবে?

শ্যামাপদ বললে,—হাতে কি আর কারও কিছু আছে বাবুদের? কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। হাতে পয়সা নেই, উনুনে আগুন পড়ে না, পরণের কাপড় জোটে না, তবুও বাবুদের সখ বলিহারী!

কিন্তু আজ?

আজ বাবুদের বাড়ীতে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইয়ের বেদনাপূর্ণ দৃশ্য আর দেখতে হবে না। আজ সকলেই এক। কলহ আর দ্বন্দ্ব, মামলা আর মকদ্দমার তিক্ত অভিজ্ঞতা কি বেমালুম ভুলে গেলেন মুখোপাধ্যায় বংশ? যতই হোক সকলের শরীরে একই রক্তপ্রবাহ। এক মহীরুহের সহস্রশাখা। পরস্পর মুখ দেখাদেখি নেই, বাক্যালাপ দূরের কথা। স্রেফ্‌ নর্তকীর পায়ের না-শোনা ঘুঙুরের ঝমাঝম শব্দ আর না-দেখা নর্তকীকে হাতের নাগালে ও চোখের সমুখে দেখতে পাওয়ার লোভে বাবুরা আজ রাতারাতি অজাতশত্রুর রূপ ধারণ করেছেন। ফাণ্ড্‌ তৈরী হয়েছে

একটা মোটা রকমের, যেখান থেকেই হোক, যে যেমন পারছেন দিয়েছেন! চাঁদার ফাণ্ড, বাবুদের একেক জনের সাধ্যে যা যতটুকু কুলিয়েছে, দিয়েছেন। কেউ কেউ এখনও টাকার জোগাড় করতে পারেননি শত চেষ্টাতেও। তাঁরা টাকার বদলে কথা দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শুধু ডাক পড়লো না অনঙ্গমোহনের।

কেউ ডাকলো না তাঁকে। হয়তো কারও সাহসে কুলায়নি। বংশের মধ্যে বয়স ও সম্মানে জ্যেষ্ঠতম অনঙ্গমোহন, কে ডাকবেন তাঁকে! আমোদ-আহ্লাদে বয়স ব'লে একটা কথা আছে, যেটিকে অমান্য করা যায় না কোন মতেই। স্ফূর্ত্তির আড্ডায় সমবয়েসীদের সম্মিলনই বাঞ্ছনীয়, বাবুরাও তারই পক্ষপাতী।

—শ্যামাপদ!

বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকতে থাকতে হঠাৎ কথা বললেন অনঙ্গমোহন। কোন্ এক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন যেন এতক্ষণ। বললেন,—বাড়ীতে তা হ'লে আজ কুরুক্ষেত্র, কি বল শ্যামাপদ?

—তা আর নয় হুজুর! এখন ভালয় ভালয় রাতটা কাটলে বাঁচি! এবাড়ীর বাবুরা একেকটি অমানুষ! শ্যামাপদ এই কথাগুলি স্বগত করলো। সভয়ে দেখলো একবার মনিবের মুখপানে, যদি তাঁর কোন ভাবপরিবর্ত্তন হয়।

কিন্তু অনঙ্গমোহন যেন পাষাণ! ডেস্‌পারেট! সক্-প্রুভ্‌ড্‌!

তাঁর মুখভঙ্গীতে পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্নই ফোটে না। আরাম কেদারার হাতে হাত বুলাতে থাকেন। স্থিরদৃষ্টিতে বসে থাকেন, পুরানো রোগীর মত।

শ্যামাপদ বললে,—হুজুর, জনা চারেক হালুইকর বামুন এসেছে কলকাতা

থেকে। চপ্ কাটলেট ফ্রাই আর পটলের দোরমা তৈরী হচ্ছে বাবুদের জন্যে। চিংড়ী মাছের পোলাও তৈরী হচ্ছে। আদার চাটনী, রাধাবল্লভী, কত কি তৈরী হচ্ছে!

—অনুমানে তা আমি বুঝেছি। বাতাসে গন্ধ পেয়েছি মশলা পেঁয়াজের। কলকাতার হালুইকর তাও গন্ধ পেয়ে বুঝেছি।

ঠিক যন্ত্রের মতই কথাগুলি বলে গেলেন অনঙ্গমোহন। একান্ত নির্ব্বিকারের মত।

শ্যামাপদ ঘরের ঘড়ির দিকে তাকালো। কিসের যেন সময় উৎরে যাচ্ছে, এমনই ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে বললে,—রেডিওটা খুলে দিই হুজুর।

অনঙ্গমোহনও ঘড়ি দেখলেন। বললেন,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বাঙলা নিউজের টাইম হয়ে এসেছে তো। দাও, দাও চালিয়ে দাও রেডিওটা।

ঘরে আছে একটি অল ওয়েভ সেট।

এইচ এম ভির তৈরী, দামী মডেল। অনঙ্গমোহন নিজে বাঙালী, কোথায় কলকাতা বেতার কেন্দ্র শুনবেন, তা নয়। দিল্লী থেকে যখন বাঙলায় সংবাদ বলে শুধু ততক্ষণই বেতার-ভারতের সঙ্গে অনঙ্গমোহনের সম্পর্ক। অন্যান্য সময় যখন ইচ্ছা হয় তখন ধরেন যত ফরেন ষ্টেশন,—বি. বি. সি, প্যারী, স্পেন, বার্লিন কিম্বা টোকিও।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন দিকে দিকে নিঃঝুমতা, তখন দূরদূরান্তরের ভেসে-আসা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শোনা যায় অতি স্পষ্ট। অনঙ্গমোহন হয়তো তাদের ভাষা বোঝেন না, কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনা কার না ভাল লাগে! সুরের পূজারী অনঙ্গমোহন, মধ্যরাতে গৃহে পরিপূর্ণ শান্তি যখন বিরাজ করে তখন তিনি শোনেন যত বিদেশী সিম্ফনি, অর্কেষ্ট্রা। স্প্যানিশ সারিনেড্।

নতুন দিল্লী থেকে বাঙলা সংবাদ পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে এই মাত্র।

এখন আর কোন কথা নয়, কাজও নয়, এখন শুধু নীরবে ব'সে থাকা। অনন্যসাধারণ মনোযোগের সঙ্গে চুপচাপ শুনবেন এখন অনঙ্গমোহন। সরকারী টুঁটি-বাঁধা যতেক টাটকা খবর শুনবেন হিল্লী দিল্লী আর লাহোরের। কোরিয়া আর ইন্দোচীনের। দেশ আর বিদেশের।

রেডিওতে বাঙলা খবর বলছে।

তবুও আজ অনঙ্গমোহন ইশারায় ডাকলেন শ্যামাপদকে। ডাকলেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একেবারে কাছাকাছি আসতে চুপিচুপি বললেন,—একটা জরুরী কথা বলি।

আরও কাছে এগিয়ে আসতে হয় শ্যামাপদকে।

অনঙ্গমোহন ফিস ফিস করলেন,—বাড়ীতে আজ এমন একটা ফেষ্টিভ্যাল, শুনলাম, তুমিই তো বললে ভাল-মন্দ কত কি রান্না হচ্ছে, পারো যদি দেখো, আমার জন্যে খানকয়েক চপ কাটলেট যদি জোগাড় করতে পারো।

এক নিশ্বাসে কথা কটি বলে গেলেন।

কথা বলার সময় এখন নয়। তবুও হয়তো হাওয়ায় ভেসে আসা মশলা আর পেঁয়াজের উগ্র গন্ধের লোভে লোভে দৈনন্দিন নিয়ম ভঙ্গ করলেন। দিল্লীর খবর শুনতে শুনতে কথা বললেন।

শ্যামাপদ শুধু বললে,—হুজুরের যেমন হুকুম হবে। হুজুরকে কেউ দিক আর না দিক, আমি হালুইকরদের দু'চার আনার পান খাইয়ে হুজুরের জন্যে চপ, কাটলেট, ফেরাই ঠি—ক জোগাড় করে আনবো। কথা বলতে বলতে এক মুহূর্ত্ত থামলো শ্যামাপদ। বললে,—দেখলেম হারাণ হালুইকর এয়েছে।

—তাই নাকি? হারাণ হালুইকর? অনেকদিন হারাণের রান্না খাইনি।

—হ্যাঁ হুজুর। কথার মাঝে আবার একবার থামলো শ্যামাপদ। কিসের এক সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে ফেললে,—তা হুজুর, হালুইকরদের যদি পান খাওয়াতে হয় দু'চার আনা পয়সা চাই যে।

—তা বটে। তবে দাও আমার মানি ব্যাগটা দাও।

অনঙ্গমোহন মনে মনে বিরক্ত হলেও অনন্যোপায় হয়ে বললেন।

টেবিলে ছিল কুমীরের চামড়ার একটি পকেট ব্যাগ। শ্যামাপদর হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিলেন চক্ষের নিমেষে। ব্যাগের মুখ খু'লে দেখে দেখে একটি সিকি বের করে দিলেন। চার আনা পয়সা খরচ করলে যদি দু'পাঁচখানা চপ, কাটলেট, ফ্রাই খেতে পাওয়া যায়!

হাতের সিকি আলোয় ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নিজের এক কাণে গু'রে ফেললো শ্যামাপদ। বললে,—দেখি গিয়ে কতদূর কি হ'ল, কে কে এলো!

অনঙ্গমোহন শুনলেন কি শুনলেন না।

নতুন দিল্লী থেকে বাঙলায় খবর বলছে এখন। অন্য দিন এতক্ষণ কোনদিকে দিকপাত থাকতো না তাঁর। অন্যের কথায় কর্ণপাতও করতেন না, নিজেও কথা বলতেন না। কিন্তু হারাণ হালুইকরের হাতের রান্নার মশলার গন্ধ নাকে পেয়েছেন আজ। অনেক দিনের লোভাতুর ক্ষুধা উগ্র হয়ে উঠেছে যেন।

এমন একদিন ছিল, যখন মাছ-মাংস ছাড়া অন্য কিছু মুখে দিতেন না অনঙ্গমোহন। বনের পাখী নিরামিষ খায়, সভ্য মানুষ কেন খাবে! দু'বেলায় দু'দুটো গোটা মুরগী ছিল তখন বরাদ্দ। কথায় কথায় চপ, কাটলেট, ডেভিল আর ফ্রাই প্রত্যহ প্রাতরাশের টেবিলে এক জোড়া কোয়ার্টার বয়েল্ড্ ছোট ডিম। লজ্ আর পার্টিতে হ্যাম্, বেকন, অক্স্-টাঙ্।

আর আজ ?

অন্ধকার ভেদ করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছিল শ্যামাপদ।

দিন নেই, রাত্রি নেই, বৃদ্ধ মনিবের কাছে থেকে থেকে মন যেন তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। মনিবের ঐ চার দেওয়ালের ঘর ছাড়া তুনিয়ায় আরও কত কি আছে, তাদের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছে শ্যামাপদর যোগাযোগ। মাথার 'পরে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ আছে, তাও যেন তার চোখে পড়ে না। দাসত্বের খাতায় নাম লিখিয়েছে বটে বহুযুগ আগে, সেজন্য কি সুখ দুঃখ হাসি কান্না ব্যথা বেদনার অনুভূতিও লুপ্ত হয়ে যাবে। শ্যামাপদ দ্রুত পা চালায় অন্ধকার দালানে।

অন্দর যেন আজ নীরব হয়ে আছে। সাড়া শব্দ নেই বললেই হয়। মানুষের বসতি আছে কি না চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ঘরে ঘরে আলো জলছে। ঘরের দরজা জানলায় আলোর চতুষ্কোণ আভাষ।

দালান ধ'রে দ্রুত যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো শ্যামাপদ। কি যেন চোখে পড়েছে তার! কোন্ অদেখার দেখা পেয়েছে! দালানের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে চুরিয়ে চুরিয়ে দেখতে থাকে চোরা-দৃষ্টিতে।

অদূরে, একটি ঘরের জানলা ভেদ ক'রেছে সেই প্রখর দৃষ্টি।

মোহময় চোখে চেয়ে আছে শ্যামাপদ। বিমুগ্ধদৃষ্টিতে। অদূরে, একটি ঘরের জানালার মধ্যে দেখা যায় এক নারীমূর্ত্তি। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ড্রেসিং আলমারীর আয়নার সমুখে। শুভ্র দুই বাহু তুলে চুল বাঁধছে। যদিও আঁটসাঁট ব্রেসারীর প্রাচীর, তবুও অসাবধানেই হয়তো স্খলিত হয়ে পড়েছে বক্ষবাস।

কেউ যদি দেখতে পায়! যদি কারও চোখ পড়ে।

সেই ভয় ও লজ্জায় আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না শ্যামাপদ। অন্ধকারে

এগিয়ে চললো একান্ত অনিচ্ছায়। রাঙাবাবুর বৌ, রাঙা বৌদিদি, তাঁর নিজের ঘরে কেশ পরিচর্চ্চায় রত হয়েছেন সন্ধ্যা উৎরোলে।

দরজায় যদি পর্দ্দা না থাকে, দরজা যদি থাকে উন্মুক্ত, তা হ'লে শ্যামাপদর মত দেশছাড়া গ্রাম্য ও অজ্ঞজন কি করতে পারে!

আর অন্দরে নয়। এক মুহূর্ত্তও নয়।

মুক্ত প্রান্তরের মুক্ত বায়ু চাই। বেশীক্ষণ অন্দরে থাকলে শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়। দ্রুত পা চালিয়েছে শ্যামাপদ। মনিবের দেওয়া রূপোর সিকিটা একবার পরশে দেখে নেয়, আছে না নেই। চলাফেরায় প'ড়ে যেতেও পারে। কানে হাত দেয় শ্যামাপদ।

সারেঙ্গীর শব্দ ভেসে আসছে কি?

সদরের কাছাকাছি পৌঁছাতেই শোনা যায় তারের ঝঙ্কার। সদর আজ গম গম করছে। আলো আর উল্লাসের প্রাচুর্য্যে যেন ঝলমল করছে সদরের হল্‌গুলো। দরজা জানলায় লাল ভেলভেটের পর্দ্দা ঝুলছে।

সদরে শুধু বাবুরা নয়। আরও কত কে এসেছে তার ঠিক নেই। বাবুদের একেকজনের আলাপী যত ইয়ার বন্ধু। হয়তো প্রতিবেশী, তবুও যাদের সঙ্গে বাবুদের হলায় গলায় ভাব তারা এসে জমায়েৎ হয়েছে। তাদের সঙ্গে এসেছে, সেতার, তানপুরা, তবলা আর আড়-বাঁশী, মৃদঙ্গ।

সদরের বাতাসে গোলাপ জলের গন্ধ।

বাবুদের চাকরের হাতে রূপোর গোলাপপাশ। সমাগত অতিথিবৃন্দের মাথায় গোলাপজলের ছিটে পড়ছে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন সদ্য খোলা হয়েছে, তারই মিষ্ট গন্ধের আমেজ। বেলফুলের মালা এসেছে হয়তো। গোড়ের মালা ঝুলছে সদরের হলের দেওয়ালের তৈলচিত্রে।

সব মিলিয়ে মিশিয়ে অপূর্ব্ব এক সুগন্ধের হাওয়া বইছে সদরে। তবুও

এখনও হুইস্কির বোতল বাকী আছে। হোয়াইট লেবেল, রেড লেবেল, ভ্যাট ৬৯, ফরাসী কুঁইযার বোতল।

দূব থেকে চোখ বড় করে দেখলে শ্যামাপদ। ইদিক সিদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। বাড়ীর বাবুদের আজ যেন অন্য মূর্ত্তি। শ্যামাপদ দূরে থেকে ভয়ে ভয়ে দেখে। বাবুদের চোখে চোখ পড়লে আর রক্ষা নেই। তৎক্ষণাৎ ডাক পড়বে। ফরমাস শুনতে হবে। আর সেই সঙ্গে কারণে অকারণে খেতে হবে গালাগাল।

বাবুদের যেন আজ অন্য মূর্ত্তি।

ফরাসডাঙ্গা আর শান্তিপুরী কোচানো ধুতি, আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবী, আর কালো বর্ণিশের চটিজুতো পরেছেন বাবুরা। কারও মুখে হাসির রেখা, কেউ বা অতীব গম্ভীর হয়ে আছেন। দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন, তাই এখনও কারও কারও ঘুম ঘুম চোখ। কারও মুখে একমুখ পান, কেউ সিগারেট খেয়ে চলেছেন। কেউ টিপের পর টিপ নস্যি নিচ্ছেন।

নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। বাবুদের ভয়ে।

ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি তাঁর চোখে। যুক্তকর। মুখে কথা নেই বললেই হয়। যখন তখন দেখছেন দেওয়ালের ঘড়ি। কলকাতা থেকে ট্রেণ আর ষ্টেশন থেকে মোটর এখনও পর্যন্ত পৌঁছয় না। বাইজীদেরও এখনও কোন হদিস্ নেই। কৃষ্ণচন্দ্রের বরাতে আজ যে কি আছে, কেউ বলতে পারে না।

সদর সিঁড়ির তলার ঘরে তামাকের যত কিছু ব্যবস্থা।

বাবুদের চোখ ফাঁকিয়ে নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র তামাকের আড্ডায় এসেছেন। একটি জলন্ত হুঁকো তুলে নিয়ে হরদম টানতে থাকেন আর ধোঁয়া ছাড়েন।

বাবুদের স্ফূর্তির চোটে কৃষ্ণচন্দ্র ধীরেসুস্থে এক কলকে তামাক খাওয়ার ফুরসুৎ পান না।

—নায়েবমশাই।

সিঁড়ির তলার ঘরে শ্যামাপদও ঢুকলো। বললে,—নায়েবমশাই, আজকের ব্যাপারখানা কি বলুন তো?

হুঁকোয় টান দিতে থাকেন কৃষ্ণচন্দ্র।

আজ সারাদিনে এক কলকে তামাক খাওয়ার পর্য্যন্ত অবসর মেলেনি। বাবুদের হুকুমের পর হুকুমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন। মুখখানা বিরক্ত হয়ে আছে। একেই শূলের বেদনায় অস্থিসার আকৃতি কৃষ্ণচন্দ্রের। কর্ম্মব্যস্ততায় ভাল ক'রে খেতে পাননি আজ। নামেমাত্র দু'মুঠো ভাত নাকেমুখে কোন রকমে গুঁজে উঠে পড়েছেন। হুঁকোয় পর পর অনেকগুলো টান দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নায়েব বললেন, :—ব্যাপার আর কি! ব্যাপার যা তাতো চোখেই দেখবে। নাচ গান বাজনা হবে, মাইফেলী হবে, আড্ডা-তামাসা হবে, আরও কত কি হবে কে জানে!

কথার শেষে মুখে আবার হুঁকো ঠেকালেন! সিঁড়ির তলার ঘরে হুঁকোয় তামাক খাওয়ার ঘন ঘন শব্দ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র উবু হয়ে বসে তামাক টেনে যান।

শ্যামাপদ বললে,—বাবুদের সখ বলিহারী যাই! উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, র‍্যাশনের টাকা জোটে না, পরনের কাপড় নেই, তবুও এ কি বেলেল্লাপনারে বাবা। যেটা রয় বসে, সেইটেই কর না, বাড়াবাড়ি করা কেন?

হুঁকোয় আবার অনেকগুলো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কৃষ্ণচন্দ্র কথা বলেন,—জমিদারী গেছে, জমিদারী গেছে তো কি হয়েছে? অনাচার না করলে বাবুদের পয়সা আজ খায় কে?

ঠিক কথা। বললে শ্যামাপদ।—হক কথা বলেছেন নায়েবমশাই।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন,—তাও নিজেরা আনন্দ কর, ফূর্ত্তি কর, যা খুশী তাই কর, এত পয়সা খরচা করে বাঈজী আনতে যাওয়া কেন! শ'য়ে শ'য়ে ইয়ার-বন্ধুদের জড় করারই বা কি দরকার?

শ্যামাপদ অপেক্ষায় ছিল, নায়েব কখন হুঁকো ছাড়েন। শ্যামাপদ নতকণ্ঠে বললে,—আমাদের ছোট মুখে বড় কথা না বলাই ভাল। বাবুদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা! বাঈনাচের জন্যে কে আর কবে ভিয়েন বসায় তাই বলেন?

নায়েব বললেন,—তাই না তাই। পাকা পোনা, ভেটকী আর চিংড়ী মাছই এসেছে সবসমেত শওয়া দু'মণ! মাংসের কিমা বিশ সের। এক মণ ময়দা ভাজা হবে?

শ্যামাপদ বললে,—তা হ'লে তো দেখছি এলাহী ব্যাপার!

তা আর নয়! বললেন কৃষ্ণচন্দ্র,—বিলেতী মদই এসেছে শ' পাঁচেক টাকার। দু'শো সোডার বোতল। বরফ দশ টাকার। থ্রি ক্যাশেলস সিগারেটের টিন দু'ডজন!

—জলের মত টাকাগুলো খরচা হবে তো আজ, ইদিকে লোকজনাকে মাইনে দেওয়ার নাম নেই।

শ্যামাপদ কথা বলে আক্ষেপের সুরে। হতাশ হাসির সঙ্গে!

—সে কথা আর ব'ল না। নাও, হুঁকোটা ধর; ঐ শোন, কে আবার আমাকে ডাকে!

কথা বলতে বলতে ও হুঁকোটি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সিঁড়ি তলার ঘর থেকে।

শ্যামাপদ শুধু বললে,—বোধ হচ্ছে বড়বাবুই ডাকছেন।

—হ্যাঁ বড়বাবুই ডাকছেন বটে।

সিঁড়ি তলার ঘর থেকে বেরিয়ে নায়েব চলে গেলেন।

শ্যামাপদ স্বগত করলে,—যাও এখন, গাল খাও গে যাও! হুঁকো টানা বেরিয়ে যাবে।

কথার শেষে নিজেও হুঁকোয় টান দিতে থাকে। যেন কত কত যুগ তামাকের স্বাদ পায়নি সে। পয়সায় ছ'টা বিড়ি খাওয়ারও হিম্মৎ নেই যার, সেই শ্যামাপদ যদি পায় অম্বুরী তামাকের সাজা কলকে!

কি কলরোল সদরে। কান পাতা দায়।

সকলেই কথা বলছেন, ডাকাডাকি করছেন, তাই কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ কণ্ঠও শোনা যায় না। চেঁচামেচিতে চাপা প'ড়ে যায় কে কাকে ডাকছে, কে কি বলছে।

যতই হৈ হৈ আর হল্লা চলুক, সদরের বাতাসে আজ অপূর্ব্ব এক মিষ্ট সুগন্ধ। গোলাপজল, বেলফুল আর মূল্যবান সিগারেটের একতায় বাতাস বুঝি ভারী হয়ে আছে। তানপুরার নাকে-কান্না শুরু হয়েছে। তবলার আওয়াজ ঠিক হচ্ছে রূপোর হাতুড়ীর ঘায়ে।

ষ্টেশন থেকে গাড়ী পৌঁছানোর অপেক্ষা শুধু। দুজন বাঈজী আসছে।

নূরজাহান বাঈ আর মতিয়া বিবি। তাদের সঙ্গে আসবে ভেড়ুয়া। সারেঙ্গী বাজাবে। প্যালা কুড়োবে। বাঈদের পায়ের ঘুঙুর বেঁধে দেবে। বুকের কাঁচুলী এঁটে দেবে।

এখনও আসর জমেনি। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছেন বাবুরা। নাচঘরে জমায়েৎ না হ'য়ে যে যার সাঙ্গোপাঙ্গসহ একেক ঘরে একেক দল আড্ডা জমিয়েছেন।

বড়বাবুর কণ্ঠস্বর। সদর কাঁপিয়ে ডাক ছেড়েছেন। ডাকছেন নায়েবকে?

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরাত্মা কাঁপতে থাকে ভয় আর আশঙ্কায়। কাঁপতে কাঁপতে হাজির হয় নায়েব। চন্দ্রমোহন সক্রোধে বললেন,—কোথায় ছিলে হে তুমি ? কোথায় ডুব মেরেছিলে ?

আমতা আমতা করে কৃষ্ণচন্দ্র। মুখে তার কোন কথা জোগায় না। হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বলে,—এই তো হুজুর, এখানেই আমি আছি। কোথাও তো যাইনি হুজুর।

বড়বাবুর মুখ-চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে যায়। মুখ বিকৃত করেন তিনি। বলেন,—ষ্টুপিড্, ফুল, ননসেন্স্, মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাওনি ! এত ডাকাডাকি করছি, তাও তোমার সাড়া নেই ?

কৃষ্ণচন্দ্র জড়িতকণ্ঠে কথা বলে। বলে,—সাড়া আমি দিয়েছি হুজুর আপনার কানে পৌছায়নি।

বড়বাবু ধমকে উঠলেন ! সরবে বললেন,—ফের মিথ্যে ব'লছো গর্দ্দভ ? সাড়া দিলে শুনতে পাবো না আমি ? তা হ'লে বলতে চাও, আমার কানের দোষ হয়েছে ?

কৃষ্ণচন্দ্র হাতে হাত কচলায় আর বলে,—সে কথা আমি বলতে চাইনি হুজুর। লোকজনের কথাবার্ত্তায় হয়তো আপনি শুনতে পাননি ; সাড়া ঠিকই দিয়েছি হুজুর !

বড়বাবু বললেন,—চোপ রও ব্লাডি ব্যাষ্টার্ড, মুখের ওপর কথা কও না !

নিজের সম্পর্কে উচ্চারিত বিশেষণ ক'টি কানের ভেতর দিয়া মরমে গিযে হানা দেয় কৃষ্ণচন্দ্রের ! এত লোকের সমক্ষে অপমানের লজ্জায় মরমে ম'রে যায় যেন ! নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ ! চোখ দুটি শুধু ছলছলিয়ে ওঠে ! ওষ্ঠ কম্পমান হয়।

প্রথম রাত্রির পাৎলা অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না বড়বাবুর। সমস্বরেই তিনি বললেন,—বৃষের কাঠের মত শুধু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকলে চলবে না। সেজন্যে তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়নি। ষ্টেশন থেকে এখনও কেন গাড়ী আসছে না, আগে খোঁজ করাও।

কৃষ্ণচন্দ্র বললে,—যথাজ্ঞা হুজুর!

কথার শেষে সে স্থান ত্যাগ করলো ধীরে ধীরে। আহত সৈনিকের মত চললো ভগ্ন পদক্ষেপে। লোকজনের সমক্ষে অপমানিত হওয়ায় ভাবলো, সকালে ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছিল!

বড়বাবুর নাম চন্দ্রমোহন। যেমন গম্ভীর তেমনি রাশভারী!

চন্দ্রের স্নিগ্ধতা নেই। যেন সূর্য্যের মত সদা-উত্তপ্ত। নিখিরকান্তি আকৃতি, তবুও মনের কোথাও কোমলতা নেই বললেই হয়। তাঁর ক্রুদ্ধ মনের মূর্ত প্রকাশ যেন তাঁর গোঁফে। সেই গোঁফের এক প্রান্ত পাকাতে পাকাতে নাচঘরে প্রবেশ করিলেন তিনি।

সমবয়সের আত্মীয় ও বন্ধুজন তাঁকে দেখে সহাস্যে অভিবাদন জানায়। বড়বাবু চন্দ্রমোহনও স্মিতহাসি হাসলেন। কে বলবে এই মুহূর্তে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠেছিলেন। দেখলে যেন বিশ্বাসই হয় না!

—কৈ হে চাঁদমোহন, তোমার নাচোয়ালী কৈ?

বড়বাবুর বন্ধুদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলে কৌতূহলী কণ্ঠে। একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করলে কথার শেষে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—আরে অধৈর্য্য হও কেন! এইতো সবে কলির সন্ধ্যে! ইষ্টিশনে গাড়ী গেছে এতক্ষণে পৌছে যাওয়ার কথা! তাইতো নায়েবটাকে বকাবকি করছিলুম!

—থাক্ আর বকাবকি ক'রে কাজ নেই। তুমি এখন আসর জ'াকিয়ে ব'স দেখি। বড়্‌বাবুর বন্ধুদের কে একজন কথা বললেন।

চন্দ্রমোহন বললেন,—আমি বসে পড়লে চলবে না ভাই! বাঈজী দুটো না আসা পর্য্যন্ত যেন স্থির হ'তে পারছি না কিছুতেই।

—নাও, ততক্ষণ একটা সিগারেট খাও।

বন্ধুদের একজন চন্দ্রমোহনের সমুখে সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধ'রলো।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলালেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—কাঁচি সিগারেট তো চলে না ভাই আমার! আমার ব্র্যাণ্ড্ হচ্ছে থ্রি ক্যাশেলস্। অন্য কিছু খেলেই কাশ্‌তে শুরু করবো এখনই!

—তা থ্রি ক্যাশেলস্‌ই হোক একটা!

ফরাস থেকে রূপোর সিগারেট-কেশ তুলে ধরলো কে যেন।

চন্দ্রমোহন তুললেন একটি। বন্ধুদের একজন দেশলাই জ্বাললো তাঁর মুখের কাছে। সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন,—আমাদের এষ্টেটের নায়েবটি একটি আস্ত গাধা! এতকাল ধরে কাজ করছে, তবুও এতটুকু বুদ্ধি গজালো না? শালার ঘরের শালা শুধু কাজ ভণ্ডুল করতে আছে।

—এমন লোককে মাইনে দিয়ে পোষা কেন?

বন্ধুদের কে একজন এই প্রশ্নটি করলে।

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চন্দ্রমোহন বললেন,—আমার একার এষ্টেট হ'লে গাধাটাকে কবে দূর ক'রে দিতুম।

—এখনকার কর্ত্তাদের মধ্যে তুমিই তো বড় হে চাঁদমোহন। তুমি তো ইচ্ছে করলে কত কি করতে পারো।

বন্ধু-মহল থেকে কথা উঠলো।

চন্দ্রমোহন বললেন,—তা তো পারি। আমি যে মান্যে গন্যে বড়, সেকথাও ঠিক। তবে, তবে কি না এখনও অনঙ্গকাকা জীবিত আছেন। তাঁর অবিশ্যি রিটায়ার্ড লাইফ, নিজের ঘরেই থাকেন। শরীরও তেমন সুবিধের নয়, গেলেই হয় আর কি?

—আহা, ভারী মিঠে বাজাচ্ছেতো!

কথায় কথায় বললে কে যেন বন্ধুমহল থেকে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—হ্যাঁ অপূর্ব্ব বাজাচ্ছে।

পাশের হলে কে বুঝি সেতারে সুর ধ'রেছে। বিলম্বিত লয়ে শুধু আলাপ করছে ধীরে ধীরে। সঙ্গে তানপুরার ধ্বনি।

কি করবে কি! নর্ত্তকী এখনও নাই-বা পৌছালো, তাই বলে হাঁ করে সকলকে বসে থাকতে হবে, সে কেমন কথা! তাই কোন কোন দল তাস পিটতে বসেছে। কেউ যন্ত্রে সুর তুলছে। কেউ দাবায় বসেছে। আবার অনেকে সত্যি সত্যি হাঁ করেই বসে আছে লোলুপ-দৃষ্টিতে। বাবুদের দৌলতে নাচ দেখা যাবে, বাবুদের পয়সায় ভুরিভোজন হবে। পান, সিগারেট আর হুইস্কি হবে।

এখনও কিছুই হয়নি, তবুও যেন চোখে চোখে নেশার ঘোর নেমেছে। গোলাপজল, বেলফুল আর থ্রি ক্যাশেলসের একীগন্ধে হয়তো নেশা লেগে গেছে। চোখে চোখে নেশা না নিদ্রার ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি!

চন্দ্রমোহন সিগারেটের ছাই ফেললেন এক বন্ধুর প্রায় গায়েই। বললেন,—তোমরা মনের আনন্দে গল্প-গুজব কর, আমি একবার দেখে আসি ভিয়েনে কত দূর কি হ'ল।

কথার শেষে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভিয়েনে তখন ছ' ছ'টা চুল্লী গনগন করে জ্বলছে।

কোনটায় কড়া আর কোনটায় হাঁড়ি চড়েছে। হারাণ হালুইকরের দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। পেঁয়াজ আর মশলার উগ্র গন্ধ ছড়িয়েছে চতুর্দ্দিকে। ভিয়েনের এক দিকে ময়দা পেশা হচ্ছে। নেচি কাটা হচ্ছে ময়দার। গণ্ডায় গণ্ডায় ভাগ করা হচ্ছে বারকোশে। কাটলেটের চিংড়ী থোড়া হচ্ছে। চুল্লীতে চপের কিমা আর মাংস রান্না হচ্ছে। পটল আর বেগুন ভাজা হচ্ছে রাশি রাশি।

—কি হে হারাণ, তোমার কতদূর ?

ভিয়েনে পা দেওয়ার মাত্র প্রশ্ন করলেন চন্দ্রমোহন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন।

হারাণ হালুইকর তখন মাংসে জল ঢালছে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ঃ কে ডাকলো না ডাকলো, সেদিকে তার কান নেই।

চন্দ্রমোহন দেখলেন, কি একটি গুরুতর কাজে ব্যস্ত রয়েছে হারাণ। মুখ-চোখ কুঁচকে জলের পরিমাণ মাপছে আর ঢালছে ধীরে ধীরে। চুল্লীর আগুনের আঁচে অসাধারণ ঘেমে উঠেছে হারাণের শরীর! মাথার তৈলাক্ত বাবরি চুল ঘেঁটে গেছে কাজের ঝঞ্চাটে। এত ব্যস্ততা, কাজে এত একাগ্রতা, তবুও গালের পান চিবানো স্থগিত নেই। হারাণের মুখে একমুঠো পান আছে হয়তো।

হারাণ বললে,—বড়বাবু, আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না। আমরা ঠিক আছি। সময়ে সব ঠিক তৈরী থাকবে দেখবেন।

চন্দ্রমোহন আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন,—শ' দেড়েক লোক খাবে বৈ তো নয়! তুমিতো হারাণ এবাড়ীতে হাজার হাজার লোক খাইয়ে গেছো বছরে বছরে।

—সে কথা আর বলবেন না বড়বাবু। বললে হারাণ। বললে,—কি দিনই সব গেছে! পূজোপার্ব্বন, বিয়ে-পৈতে কিছুতেই বাদ যায়নি। তখন লুচি আর ভাতের পাহাড় তৈরী হ'তো, আমাদের। একসঙ্গে হাজার হাজার লোক! মাটি খুঁড়ে চুল্লী বানাতে হ'ত। কুলিয়ে উঠতো না গড়া চুল্লীতে!

ভিয়েনে হাওয়া নেই, শুধুই উত্তাপ। আগুনের হল্‌কা।

তবুও হাওয়ায় যেন মাঝে মাঝে একেক মশলার সুগন্ধ ভাসছে। পেঁয়াজ আর হাসের ডিমের গন্ধ, মাংস আর ভিনিগারের গন্ধ। ফোড়ন আর মশলার।

—আমাকে আর আসতে হবে না তো হারাণ?

প্রশ্ন করলেন চন্দ্রমোহন। কোঁচানো ধুতির প্রান্ত পেছনে ধ'রে ইদিক সেদিক দেখতে বললেন।

হারাণ বললে,—না বড়বাবু। আপনি আর কষ্ট করবেন না।

হালুইকরের মৌখিক সম্মতি পেয়ে কালো বার্ণিশ চটি জুতোর শব্দ তুলতে তুলতে চলে যাচ্ছিলেন চন্দ্রমোহন। হারাণ ডাকলে,—বড়বাবু, একটা কথা বলছিলাম।

থামলেন চন্দ্রমোহন। রাইট্ এবাউট্ টার্ণ হ'লেন।

হারাণ মিনতিসহকারে বললে, - এক কেটলী চায়ের যদি হুকুম দেন বড়বাবু।

—সে কি কথা? বললেন বড়বাবু।—তোমাদের চা দেয়নি না কি?

হারাণ বললে,—হ্যাঁ হুজুর দিয়েছে। আর এক কেটলি যদি দেন। বড্ড গরম হুজুর।

—সে কি কথা!

বললেন, আর ফিরলেন চন্দ্রমোহন! ব্যস্ত হয়ে জোর কদমে চললেন সদরের পথে। বার্নিশ চটির শব্দ মিলিয়ে গেল কোথায়।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে কখন। ভিয়েনে গোটা ছয়েক পঁচিশ পাওয়ারের বল জ্বলছে। তাই আলো হয়েছে টিম টিমে। দেখা যায় কি না যায়। চুল্লীগুলোয় কতকাল আঁচ পড়েনি কে জানে, ক্যাঁকড়া বিছে বেরিয়েছে আগুন ধরাতেই।

—হারাণ, কিমায় কিসমিস দিয়েছ?

কে একজন বসেছিলেন ভিয়েনে। বাবুদের কে একজন। নাম বিরাজমোহন। এ বাড়ীতে তিনি নাকি রান্না-বান্নায় পাকাপোক্ত। বিরাজমোহনের চোখে মোটা কাচের চশমা, পুরু লেন্স্। যে কোন

কাজকর্ম্মে ভিয়েনে বিরাজমোহন না থাকলে যজ্ঞিই উঠবে না। শুধু রান্নায় হাত থাকলে চলে না, চোখ রাখতে হয় হালুইকরের কাজে। কাজ করছে না ফাঁকি দিচ্ছে! রান্নার উপকরণের সৎ ব্যবহার করছে না, অপচয় করছে অযথা? বিরাজমোহনের চোখে জোরালো চশমা, নজর এড়াতে পারে না কেউ।

—একেবারে ভুলে মেরেছি। বললে হারাণ। হাসতে হাসতে বললে। বললে,—ওঃফ্, বিরাজবাবুর চোখ আছে বটে!

বিরাজমোহন কোন কথা বললেন না। হাতের হাতঘড়ির প্রতি একবার চোখ ফেরালেন। মুখে তাঁর গর্ব্বের মৃদুহাসি ফুটলো।

কিসমিসের ঠোঙ্গাটা কে যেন ছুঁড়ে দেয় হারাণের পায়ের কাছে। মুঠো মুঠো কিসমিস ছড়িয়ে দেয় হারাণ কিমার কড়ায়। অনুশোচনার সুরে কথা বলে,—কলকাতার হোটেলে কিসমিস দেওয়ার রেওয়াজই নেই।

বিরাজমোহন সহাস্যে বললেন,—কলকাতার হোটেলে কুকুর বেড়ালের মাংস,—কে আর কিসমিস দিচ্ছে!

—তা যা বলেছেন বিরাজবাবু।

বাবরি চুল ঝুলিয়ে হারাণ ঝুঁকে পড়লো কড়ায়। ঝাঁজরি দিয়ে ঘাঁটতে লাগলো গরম কিমার স্তূপ। কিসমিস মেশাতে থাকলো। বললো,—কলকাতার হোটেলের কথা আর বলবেন না। বিরাজবাবু! সেখানে কি হয় না তাই বলুন।

—যা বলেছো! বললেন বিরাজমোহন।—তোমাদের বড়বাবু খবরদারি করে গেলেন হারাণ, হাত চালিয়ে নাও তোমরা। কিমাটা এখনও হয়ে উঠলো না, চিংড়ী মাছও থোড়া হ'ল না। চপ কাটলেট করবে কখন?

হারাণ বললে,—কিছু ভাববেন না আপনি। আচ্ছা বিরাজবাবু, বড়বাবুর সঙ্গে বুঝি আপনার কথা নেই?

—তুমি কোথা থেকে জানলে হারান, আগে তাই শুনি।

ফিরতি প্রশ্ন করলেন বিরাজমোহন। চাপা হাসি লুকোলেন। চোখের চশমা খুলে কোঁচার খুঁটে কাচ মুছতে থাকলেন।

কিমার কড়ায় ঝাঁজরি চালিয়ে কিসমিস মেশাচ্ছিল হারাণ। নিজের দলের একজনের উদ্দেশে বললে সজোরে,—বলরামদা, হাত চালাও।

বলরাম কাটলেটের চিংড়ী থুড়ছিল।

একটা কাঠের পিঁড়িতে সারি সারি দোফালা চিংড়ী। লেজসমেত। বলরাম বললে,—আর দু'কুড়ি বাকী আছে। তুমি বিস্কুট লাগনের জোগাড় দেখ না।

ভিয়েনের এক পাশে হামানদিস্তায় বিস্কুট পেশা চলেছে। পেশা হচ্ছে আর ঢেলে রাখছে খবরের কাগজের বুকে।

—আচ্ছা বিরাজবাবু, আমরা গরীব-গরবা হ'তে পারি, তা বলে কি গরীবের চোখ নেই বলতে চান আপনি? আমরা কি কিছু দেখতে পাই না? চোখে দেখলুম যে বড়বাবু এতক্ষণ ছিলেন, তবুও আপনি একটিও কথা কইলেন না।

এতক্ষণে কথার জবাব পেলেন বিরাজমোহন, হারাণের মুখ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনলেন। হারাণ কথাগুলো বললে চাপা গলায়। ইদিক-সিদিক দেখে তবে সে এতগুলি কথা বলেছে।

বিরাজমোহন মৃদুহাসির সঙ্গে বললেন,—তোমাদের বড়বাবু চন্দ্রমোহনের সঙ্গে যে আমরা ক'ভায়ে কেস লড়ছি। খুব জোর মামলা চলেছে যে।

এলোমেলো বাবরি চুলের আড়ালে হারাণের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বিস্ময় আর কৌতূহলের সঙ্গে বললে,—তাই না কি বিরাজবাবু? তা তো জানতুম না।

বিরাজমোহন মৃদু হেসে বললেন,—হ্যাঁ মামলা খুব জোর চলছে। এই বাড়ী নিয়েই মামলা।

কথা শুনে হারাণের হাতের ঝাঁজরি থেমে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সে। কিছুক্ষণ অতীত হওয়ার পর বললে,—এই বাড়ী নিয়ে মামলা কেন বিরাজবাবু? বাস্তু নিয়ে মামলা-মকদ্দমা!

বিরাজমোহন সহাস্যে বললেন,—আর দু'দিন বাদে বাড়ীটি যে ধ্বসে পড়ে যাবে! কত বচ্ছর মিস্ত্রীর হাত পড়েনি তার ঠিক আছে? আজ সাপ বেরুচ্ছে, কাল বিছে বেরুচ্ছে, এই তো অবস্থা। সিঁড়িগুলো যেন বাসুকীর ফণা, ওঠানামায় নড়বড় করে। ভয় হয় এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে গেল। তাই আমরা চাইছি এ বাড়ী বিক্রী করতে। বড়বাবুর আপত্তি হচ্ছে।

হারাণ কিমার কড়া থেকে মাংসের চুল্লীতে যায়। বলে,—তা হ'লেও বাস্তুবাড়ী, বিক্রী করবেন কি বিরাজবাবু?

—তা নয়তো কি? বললেন বিরাজমোহন। মুখে মৃদু হাসি মাখিয়ে বললেন,—এ বাড়ী রেখে লাভ কি? যে যার ভাগের টাকা নাও বাড়ীটাও বিক্রী হয়ে যাক্।

—কি যে বলেন আপনি? বললে হারাণ। বললে—এ বাড়ী বিক্রী করতে যাবেন কোন দুঃখে?

বিরাজমোহন বললে,—দুঃখুটা তুমি যদি বুঝতে হারাণ, তা হলে আর কোন কথা ছিল না। গরীব হঠাৎ বড়লোক হ'লে খুবই সুখের কথা, কিন্তু হারাণ, বড়লোক যদি একদিন গরীব হয়ে যায় তখন তার অবস্থাটা কি হয় ভাবতে পারো?

কথা শুনে কেমন যেন নির্ব্বাক মেরে যায় হারাণ। চুপ মেরে যায়। তার মুখে কোন কথা জোগায় না। নিজের কাজে মন দেয় সে।

কিন্তু কথা না বললেও হারাণের মনটা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্য রকম হয়ে গেছে। চন্দনপুরের মধ্যে এই চন্দনধামে হারাণ যে কতবার আসা-যাওয়া করেছে! পূজো-পার্ব্বণ, বিয়ে, মুখে-ভাতের কত উৎসবে হারাণের দল এসেছে। এসে যজ্ঞি মিটিয়ে, ভিয়েন তুলে দিয়ে গেছে। এ বাড়ীর অন্দরে পর্য্যন্ত হারাণের অবাধ গতি। কে না চেনে তাকে মেয়ে-মহলেও!

এখন যারা পূর্ণযৌবনা ষোড়শী কুমারীর দল হয়ে উঠেছে, তাদেরই একদিন হারান দেখেছে পরণে ফ্রক ঘাগরা। মণিমালা, রাধাদিদি, শ্যামলী, কেকা, মঞ্জুদিদি, কমলা, ধীরা, বীরা, ইরা, চম্পাবতী—এদের শৈশবে দেখেছে হারাণ। এখন দেখছে বর্ষার ভরা নদীর মতই রঙীন ব্লাউস ঘাগরার বদলে ভরাযৌবনা যেন ওরা। ফ্রকের বদলে হাতে ছোপানো শাড়ী।

নেহাৎ বিরাজবাবু ঠায় ভিয়েনে বসে আছেন একটা কাঠের চেয়ারে, নয়তো ঐ মণিমালাদের দলকে দল এসে হাজির হ'ত কখন। হারাণকে তাদের হাতে হাতে লুকিয়ে দিতে হ'ত পুর কিংবা লুচি, বা রাধাবল্লভী। কমপক্ষে বেগুনভাজা।

কত কতবার অন্দরের দরজা-জানলার ফাঁক থেকে মণিমালা আর রাধাদিদিদের দল চোরা দৃষ্টিতে দেখে গেছে। একটিবার যদি ভিয়েনে যাওয়া যায়! রান্নার ভেসে-আসা গন্ধের আমেজে যেন জল ঝরে জিভ থেকে। কিন্তু বিরাজমোহন একনাগাড়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন। উঠবার নামটি নেই।

হারাণও যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সহাস দৃষ্টিতে দেখছিল, অন্দরের জানলা দরজা, পুরু কাচের চশমা থেকেও তা দেখতে পান না বিরাজমোহন।

অন্দরের জানালার ওপারে কারা কারা যেন দেখা দিচ্ছে থেকে থেকে। পায়ের আঙুলে দেহের ভর রেখে উঁচু হয়ে দেখছে মণিমালা আর রাধা দিদিদের মধ্যে কে কে! হারাণ বাবরি চুলের আড়াল থেকে দেখে আর মাংসের চুল্লীতে কাঁচা কাঠ ঠেলতে থাকে। এ গালের পান ও গালে টেনে হারাণ বললে,—বিরাজবাবু, আপনি বাঈ নাচের আসরে যাবেন না?

মুখে একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি বিরাজমোহনের।

কতদিন ক্ষুর পড়েনি কে বলবে! মাথার এলোমেলো চুলে কতকাল যেন চিরুণী পড়েনি। বৈশাখের অত্যধিক গরমেই হয়তো থেকে থেকে আঙুল চালিয়ে চলেছেন খোঁচা দাড়িতে। মৃদু হেসে তিনি বললেন,—আমি দেখতে যাবো বাঈনাচ? রক্ষে আছে তা হ'লে? বৌ ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে না?

হারাণ সহাস্যে বললে,—বৌদি তো তা হ'লে দেখছি খুবই কড়া মানুষ।

বিরাজমোহন বললেন,—একেবারে তোমার যাকে বলে ভীষণ কড়া। নড়তে চড়তে উঠতে বসতে জবাবদিহি করতে হয়। বুঝে নাও হারাণ, তার ওপর বৌ যদি হয় অপ্সরী সুন্দরী! কথা না শুনে আমার রেহাই নেই। সেই যে বিছানা নেবে, কার সাধ্য যে বিছানা থেকে ওঠায়!

পান-লাল দাঁত বের করে হেসে ফেললো হারাণ। বললে, সত্যিই, আমাদের অপর্ণাবৌদিদির রূপের তুলনা হয় না। বিরাজবাবু, আপনার বিয়ে আমার স্পষ্ট মনে আছে। বৌদি এসেছিলেন যেন লক্ষ্মী প্রতিমা।

—ঠিক তেমনই আছে এখনও। আমি শুধু বুড়িয়ে গেছি। বোকার মত হাসতে হাসতে বললেন বিরাজমোহন,—কে বলবে যে দুটো ছেলে মেয়ের মা।

কথা শুনে হাসবে না, তাই ভাবছিল হারাণ। বিরাজবাবু যেন এক ধরণের মানুষ। কোথায় কি বলতে হয়, কাকে কি বলতে হয়, কিছুই জানেন না যেন। স্ত্রীর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে কেউ কখনও? ঘরের স্ত্রী যতই অপ্সরী কিন্নরী হোক, চালাক কোন লোক তাই নিয়ে বড়াই করে না।

হারাণ হাসি চেপে বললে,—সত্যিই অপর্ণাবৌদির মত রূপ আমি দু'টো দেখিনি আজ অবধি। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা।

বিরাজমোহন কোন কথা বলেন না। থেকে থেকে খোঁচা দাড়িতে আঙুল চালাতে থাকেন। মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার ছায়া নামে হঠাৎ। কি যেন মনে পড়ে গেছে, তাই চিন্তাকুল মুখভঙ্গী। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন বিরাজমোহন। বললেন,—আমি আসছি অন্দর থেকে। তোমরা হাত চালিয়ে নাও হারাণ। বেশী দেরী হয়ে গেলে এত আয়োজনের সব পণ্ড হয়ে যাবে।

হারাণ আলগোছে একটি পান মুখে পুরলো। বললে,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন বিরাজবাবু। সময়ে সব প্রস্তুত হয়ে যাবে, দেখবেন।

কথায় কান দেওয়ার অবকাশ নেই আর বিরাজমোহনের। কথার শেষেই তিনি অন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। নড়তে চড়তে উঠতে বসতে জবাবদিহি করতে হয় ঘরের স্ত্রীর কাছে। বিরাজমোহন চললেন ত্রস্তপদক্ষেপে। হালুইকরের দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তৃপ্তির শ্বাস ফেললো।

হারাণ বললে,—ওঃফ্ একটা বিঁড়ি খাওয়ার ফুরসৎ পাইনি ক' ঘণ্টা ধ'রে। বলরামদা, একটা লালসুতো দাও দেখি, খাই।

বৈশাখের রাত্রি। অন্দরে বাতাস নেই বললেও হয়।

বিজলী পাখার হাওয়া বইছে ঘরে, ফুল স্পীডে। তবুও অপর্ণাবৌদি গরমে যেন আইঢাই করছেন। নিজের ঘরের খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। বুক, পিঠ, গলা ঘেমে উঠছে বড় বেশী। মাইসোর স্যাণ্ডেল সাবান মেখে গা ধুয়ে এসেছেন একটু আগে, তবুও ঘামছেন। ঘাড়ে পিঠে বুকে আর গলার খোঁজে ট্যালকম পাউডার দিয়েছেন, তবুও ঘামছেন। ভেতরের আঁট জামাটা ভিজে গেছে ঘামে।

কত গয়না অপর্ণাবৌদির গায়ে। সোনার গয়না।

গোছা গোছা মিছরীদানা চুড়ী, ঢাকাই কাজের কঙ্কন, মটরমালা, কানে ঝুমকো, মুক্তোর নাকচাবি। খোঁপায় সোনার ফুল। ঘনকালো পাড়ে আকাশী রঙের চেক শাড়ী অপর্ণাবৌদির দেহে, একটি আঁট-জামা— ধোপধুরস্থ পোষাক। শাড়ীর আঁচলে চাবির চেন-রিং রূপোর। সিঁদুর টিপ পয়সা-প্রমাণ, পায়ে রাঙা আলতা।

অসহ্য গরমে এপাশ ওপাশ করছিলেন অপর্ণাবৌদি।

রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছিলেন। ৩৭০˙৪ মিটারের ঘরে রেডিওর কাঁটা। কে এক ওস্তাদ দরবারী কানাড়া ধরেছে রেডিওতে। বড় দরদ দিয়ে গাইছে যেন। তেমনি তবলা চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

গলার মটরমালা দাঁতে কামড়ে অপর্ণাবৌদি। কড়িকাঠে চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন। আকাশ পাতাল কি যেন ভাবছেন। কখনও স্থর্ম্মা টানা চোখ বন্ধ করছেন, কখনও খুলছেন।

কাকে যেন ডাকতে পাঠিয়েছেন। তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

বিরাজমোহন ঘরে যেতেই অপর্ণা উঠে বসলেন। বুকের বসন ঠিক করতে করতে বললেন,—কখন ডাকতে পাঠিয়েছি, এতক্ষণে সময় হয়েছে তো? আচ্ছা বিবেচনা বটে!

কথা শুনে হাসবে না, তাই ভাবছিল হারাণ। বিরাজবাবু যেন এক ধরণের মানুষ। কোথায় কি বলতে হয়, কাকে কি বলতে হয়, কিছুই জানেন না যেন। স্ত্রীর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে কেউ কখনও? ঘরের স্ত্রী যতই অপ্সরী কিন্নরী হোক, চালাক কোন লোক তাই নিয়ে বড়াই করে না।

হারাণ হাসি চেপে বললে,—সত্যিই অপর্ণাবৌদির মত রূপ আমি দু'টো দেখিনি আজ অবধি। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা।

বিরাজমোহন কোন কথা বলেন না। থেকে থেকে খোঁচা দাড়িতে আঙুল চালাতে থাকেন। মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার ছায়া নামে হঠাৎ। কি যেন মনে পড়ে গেছে, তাই চিন্তাকুল মুখভঙ্গী। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন বিরাজমোহন। বললেন,—আমি আসছি অন্দর থেকে। তোমরা হাত চালিয়ে নাও হারাণ। বেশী দেরী হয়ে গেলে এত আয়োজনের সব পণ্ড হয়ে যাবে।

হারাণ আলগোছে একটি পান মুখে পুরলো। বললে,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন বিরাজবাবু। সময়ে সব প্রস্তুত হয়ে যাবে, দেখবেন।

কথায় কান দেওয়ার অবকাশ নেই আর বিরাজমোহনের। কথার শেষেই তিনি অন্দরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। নড়তে চড়তে উঠতে বসতে জবাবদিহি করতে হয় ঘরের স্ত্রীর কাছে। বিরাজমোহন চললেন ত্রস্তপদক্ষেপে। হালুইকরের দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। তৃপ্তির শ্বাস ফেললো।

হারাণ বললে,—ওঃফ্ একটা বিঁড়ি খাওয়ার ফুরসৎ পাইনি ক' ঘণ্টা ধ'রে। বলরামদা, একটা লালসুতো দাও দেখি, খাই।

বৈশাখের রাত্রি। অন্দরে বাতাস নেই বললেও হয়।

বিজলী পাখার হাওয়া বইছে ঘরে, ফুল স্পীডে। তবুও অপর্ণাবৌদি গরমে যেন আইঢাই করছেন। নিজের ঘরের খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। বুক, পিঠ, গলা ঘেমে উঠছে বড় বেশী। মাইসোর স্যাণ্ডেল সাবান মেখে গা ধুয়ে এসেছেন একটু আগে, তবুও ঘামছেন। ঘাড়ে পিঠে বুকে আর গলার খোঁজে ট্যালকম পাউডার দিয়েছেন, তবুও ঘামছেন। ভেতরের আঁট জামাটা ভিজে গেছে ঘামে।

কত গয়না অপর্ণাবৌদির গায়ে। সোনার গয়না।

গোছা গোছা মিছরীদানা চুড়ী, ঢাকাই কাজের কঙ্কন, মটরমালা, কানে ঝুমকো, মুক্তোর নাকচাবি। খোঁপায় সোনার ফুল। ঘনকালো পাড়ে আকাশী রঙের চেক শাড়ী অপর্ণাবৌদির দেহে, একটি আঁট-জামা—ধোপধুরস্থ পোষাক। শাড়ীর আঁচলে চাবির চেন-রিং রূপোর। সিঁদুর টিপ পয়সা-প্রমাণ, পায়ে রাঙা আলতা।

অসহ্য গরমে এপাশ ওপাশ করছিলেন অপর্ণাবৌদি।

রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছিলেন। ৩৭০'৪ মিটারের ঘরে রেডিওর কাঁটা। কে এক ওস্তাদ দরবারী কানাড়া ধরেছে রেডিওতে। বড় দরদ দিয়ে গাইছে যেন। তেমনি তবলা চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

গলার মটরমালা দাঁতে কামড়ে অপর্ণাবৌদি। কড়িকাঠে চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন। আকাশ পাতাল কি যেন ভাবছেন। কখনও স্বর্ম্মা টানা চোখ বন্ধ করছেন, কখনও খুলছেন।

কাকে যেন ডাকতে পাঠিয়েছেন। তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

বিরাজমোহন ঘরে যেতেই অপর্ণা উঠে বসলেন। বুকের বসন ঠিক করতে করতে বললেন,—কখন ডাকতে পাঠিয়েছি, এতক্ষণে সময় হয়েছে তো? আচ্ছা বিবেচনা বটে!

বিরাজমোহন কাঁচা পাকা দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলেন,—ভিয়েনে ছিলুম, তাই দেরী হয়েছে। কি বলছো কি তাই বল।

ক্ষীণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপর্ণা বললেন,—ভিয়েনে ছিলে, তা হ'লে তো আমার বাপচোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে! বলি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না? ছেলেটার পেটে আজ আর ওষুধ পড়বে না তো?

মুখখানি বিকৃত করলেন বিরাজমোহন। বললেন,—এখন যেতে হবে ডাক্তারের কাছে?

—তা হলে আমিই যাই।

ক্রোধ-গম্ভীর মুখে কথা বললেন অপর্ণা। খাট থেকে নেমে ঘরের মেঝেয় দাঁড়ালেন। বললেন,—সময় হবে না, বাঈনাচ দেখতে যাওয়া হবে বুঝি?

—তা বাড়ীতে যখন ইচ্ছে বাঈনাচ, তখন না দেখে আর উপায় কি? ঘরের দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে বসে থাকবো না কি?

বিরাজমোহন সহজ সুরে কথা বলেন। বেপরোয়ার মত।

খাটের এক পাশে অপর্ণার অসুস্থ ছেলে। কথা কাটাকাটি হওয়ায় তার তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়। চোখ মেলে তাকায় দুর্ব্বল দৃষ্টিতে।

অপর্ণা বললেন,—রোগা ছেলেটা তাই বলে ওষুধ পাবে না? কি মুশকিলে পড়লুম আমি! কাকে তবে পাঠাবো ডাক্তারের ডিস্‌পেন-সারিতে, সেটা শুনি?

বিরাজমোহন বললেন,—কেন তোমার ভক্ত, তোমার সমঝদার, তোমার পরম বন্ধু অলককে পাঠাও।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থাকেন অপর্ণা। রাগে বুঝি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। বলেন,—তার পড়াশোনা আছে, সে যেতে পারবে না।

—তবে আমি নিরুপায়। দু'মাইল রাস্তা পেরিয়ে ডাক্তারের ডিসপেন-

সারীতে যেতে পারবো না আমি এই রাত্তিরে। কাল সকালে এনে দেবো।

বিরাজমোহনের কথায় উত্তাপ নেই। স্পষ্ট কথা বললেন তিনি।

অপর্ণা বললেন,—তা হ'লে ছেলেটা ওষুধ না পেয়ে মরুক।

বিরাজমোহন বললেন,—পালাজ্বরে কেউ এক রাত্তিরের মধ্যে কখনও মরে না। তারপর ওষুধ আনতে গেলেই ফেলতে হবে আড়াইটি টাকা। ওষুধ কিনে কিনেই আমি ফতুর হয়ে গেলুম এ যাত্রায়।

– ওষুধের টাকা আমি দিচ্ছি। বললেন অপর্ণা। ঘরের আলমারীর চাবি খুলতে উদ্যত হলেন। পিঠের আঁচল টানলেন। আঁচলে রূপোর চেন-রিং।

বিরাজমোহন খেঁকিয়ে উঠলেন,—বড্ড যে টাকা হয়েছে দেখছি! টাকার গরম থাকে না মানুষের। তাও যদি বাপের দেওয়া মাসোহারার টাকা না হ'ত বুঝতাম! কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে বললেন,— মাসে মাসে ভারীতো ত্রিশটি টাকা পাও, তার জন্যেই এত গরম?

—ভুল বলছো তুমি! বললেন অপর্ণা,—মিথ্যে কথা বলছো! গরম আমি কাকেও দেখাইনি। টাকার অভাবে তাই বলে ছেলেটা ওষুধ পাবে না! মা হয়ে আমি তা চোখে দেখতে পারবো না।

পালাজ্বরের রোগী জ্বরের প্রকোপে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যেন।

খাটের এক পাশে নেতিয়ে পড়ে আছে। ঘরে কথা কাটাকাটির শব্দ হওয়ায় থেকে থেকে দুর্ব্বল দৃষ্টিতে দেখছে। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলছে অধিক জ্বরের ঘোরে। শীত শীত করছে, তাই গায়ে চাদর ঢেকেছে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন বিরাজমোহন।

কৌতূহলী চোখে অপর্ণার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখেন। মুখে

তাঁর মৃদু হাসির ক্ষীণতম রেখা ফুটে ওঠে। দেখতে দেখতে দেখতে সহাস্যে হঠাৎ বললেন,— মাইরী, তুমি গয়না পরেছো বটে! যে ক'খানা আছে তার সবগুলোই গায়ে চাপিয়েছো বুঝি ?

অপর্ণা দীপ্তকণ্ঠে বললেন,—না আরও আছে। গয়না আছে তাই পরেছি। তোমাদের বাড়ীর বৌ হয়ে বছরান্তে একখানা গয়নাও তো পাইনা!

মুখখানি বিবর্ণ হয়ে যায় বিরাজমোহনের। কাঁচা-পাকা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বলেন,—এত চট করে চটে যাও কেন বলতে পারো ?

—চটিয়ে দিলে কে আর চটে না তাই বল। বললেন অপর্ণা ম্লানগম্ভীর কণ্ঠে। বললেন,—আমিও তো মানুষ, কাঁহাতক আর কথা সহ্য করি অকারণে!

বিরাজমোহন বললেন,—আমি যে এত কথা বললুম, সেতো তোমাকে চটাবার জন্যেই। তুমিও তাই মেজাজ গরম করবে ? যা মুখে আসবে তাই বলবে ?

—আগে আমি বলিনি। মাসে মাসে ত্রিশ টাকার বেশী বাবা দিতে পারেন না। তাই নিয়ে আঁকাবাঁকা কথা শুনতে আমি মোটেই রাজী নই। বাবা আমাকে যা দিচ্ছেন তাইই যথেষ্ট। এই বা দেয় কে শুনি ?

বিরাজমোহন বললেন,—তোমার বাবার তুলনা আছে ? তোমার বাবা হ'লেন সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁর মত লোক হয় না। তিনি নররূপী স্বয়ং ভগবান, হয়েছে তো ?

—ঢের হয়েছে থাক। আর নকল সোয়াগ কাড়াতে হবে না! এখন ওষুধটা এনে দাও দেখি।

অপর্ণা অতক্ষণে সহজ হ'লেন। স্বভাবসুলভ মিষ্টি গলায় কথা বললেন।

ঘরের বেতার-যন্ত্রে দরবারী কানাড়া ধ'রেছিল কোন্ এক বিখ্যাত গাইয়ে। তবুও চাবি ঘুরিয়ে যন্ত্রের আওয়াজ কমিয়ে দিলেন। বড্ড বেশী জোরে রেডিওটা বেজে চলেছিল যেন। নিমেষের মধ্যে, কার যেন শাসানির ধমক শুনে শব্দ হ্রাস করলে রেডিও।

—দাও তবে টাকা দাও। বললেন বিরাজমোহন।—সাইকেলে যাই ওষুধটা এনে দিই।

অপর্ণা পিটের আঁচল টেনে চাবি ধরলেন।

আয়নাদেওয়া দেরাজের পাল্লা খুললেন। বললেন,—কত দেবো তাই বল? আলমারী খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। ছেলেটার জন্যে এখন বার্লি তৈরী করতে যেতে হবে।

—কাঁচা-পাকা দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে আর কি যেন ভাবতে ভাবতে বিরাজমোহন,—ওষুধের জন্যে দাও টাকা তিনেক।

—টাকা তিনেক কেন? এই মাত্তর যে বললে আড়াই টাকা?

বিরাজমোহন ভ্রু কুঁচকে বলেন, বেশী করে বললাম,—যদি দু'চারআনা বেশী চায়?

—অ।

—আর আমাকে দু'চার টাকা দেবে না? বাড়ীতে আজ বাঈনাচ হচ্ছে, আর আমি কিনা নাচের আসরে না গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমি তো আর চাঁদা দিইনি যে নাচ দেখতে পাবো। কেমন যেন হতাশ সুরে কথা বললেন বিরাজমোহন। যেন দুঃখের আভাষ কণ্ঠস্বরে।

অপর্ণা বললেন,—নাই বা গেলে নাচ দেখতে।

—বাড়ীর সকলে, বড় ছোট সকলেই তো আছে। আমিই শুধু—

দু'এক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখে চোখ রেখে তাকিয়ে

থাকলেন অপর্ণাবৌদি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি মনে হয় কে জানে বললেন,—কত টাকার চাঁদা? কে কত টাকা দিয়েছে তাই শুনি?

বিরাজমোহন বুঝলেন যে মাটি ভিজেছে। বললেন,—যার যেমন সামর্থ্য। কম বেশী আছে। সকলে তো আর সমান অঙ্ক দেয়নি।

—তুমি কত টাকা দিতে চাও? তোমাকে কত টাকা দিতে হবে?

বিরাজমোহন বললেন বিনম্র স্বরে,—ভেবেছিলুম তো, অন্য অন্য শরিকরা যা দিয়েছে তাই দেবো। তবে, তুমি যা দেবে তাইই দেবো।

—কি হবে টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে?

কথা বলতে বলতে হাতবাক্স খুললেন অপর্ণা। বললেন,—এই নাও, ওষুধের জন্যে তিন টাকা আর তোমার চাঁদা পাঁচ টাকা।

নোট আর রেজগীতে মিলিয়ে মোট আটটি টাকা বিরাজমোহনের হাতে দিলেন। ক্যাশবাক্স বন্ধ করলেন। আয়না-দেওয়া দেরাজে চাবি দিয়ে পিঠে আছড়ালেন চাবির গোছা সমেত আঁচল। সজোরে।

বিরাজমোহনের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক মারলো। ঘরের এক হুকে ঝোলানো আধ-ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবীটি পেড়ে কাঁধে ফেলে বললেন, —তবে আমি যাই, ওষুধটা চট করে এনে দিই, আর গঙ্গের সেলুন থেকে দাড়িটা কামিয়ে আসি।

—যাবে আর আসবে। দেরী করবে না মোটে। ছেলেটার ওষুধ খাওয়ার সময় উৎরে গেছে বোধ হয়। দাড়ীটাও কামিয়ে এসো বাপু, কি বিশ্রীই না হয়ে আছে মুখটা!

কথার শেষে খাটের এক কিনারায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন অপর্ণা বৌদি। দেহ হেলিয়ে আছেন, তাই পরণের শাড়ীখানি কেমন যেন এঁটে লেপটে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর দেহরেখা। বয়স কবে পেরিয়ে এসেছেন,

তবুও অপর্ণা বৌদির এখনও আছে অটুট যৌবন। খাটের কিনারায় দেহ হেলিয়ে দেরাজের আয়নায় নিজেকে দেখতে থাকেন তিনি।

আর বিরাজমোহন কাঁধে জামা চাপিয়ে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘরের বাইরে বেরিয়ে একবার যেন হাসেন তিনি। বেশ জোর কয়েকটা মিথ্যে কথা বলেছেন অপর্ণাকে। চোখে তাঁর ধূলো দিয়েছেন।

ওষুধের দাম তিন কেন আড়াই টাকাও নয়।

পালাজ্বরের এক শিশি মিক্সচারের দাম পুরা দেড় টাকাও নয়। বাকী টাকাটি আত্মসাতের আনন্দে ঘর থেকে বেরিয়ে মনের সুখে একবার হেসেছিলেন বিরাজমোহন। তারপর জোরে পা চালিয়েছিলেন। সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে। তারপর ফিরে এসে যোগ দিতে হবে নাচঘরের সারারাত্রিব্যাপী আনন্দ-উৎসবে।

বিরাজমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সোজা দাঁড়ালেন অপর্ণা বৌদি। দেরাজের আয়নার সমুখে গিয়ে মাথার খোঁপা চাপড়াতে লাগলেন। দেখলেন নিজের মুখ, ঠিক আছে, না নেই। পাউডার উবে গেছে কি! চোখের সুর্মা কি মুছে গেছে! কপালের পয়সা-প্রমাণ গুঁড়ো-সিঁদুরের টিপ।

—অপর্ণা বৌদি?

—কে?

—আমি?

আয়না থেকে মুখ ঘোরালেন অপর্ণা। দেখলেন যে ডাকছে তাকে। বললেন,—কে, অলক ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ আমি।

—তোমার জন্যে বাগান থেকে যুঁই ফুল এনেছি।

কথা বলতে বলতে এক রাশ যুঁই হাতে ঘরে ঢুকলো অলক। তাজা, টাটকা ফুল। সদ্য ফোটা। ফুল আর কচি কচি ঘন সবুজ পাতা।

তৃপ্তি না আনন্দের উৎসাহে একগাল হাসি হাসলেন অপর্ণা বৌদি। মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখা গেল। দু'হাত পাতলেন। ঝির ঝির করে পড়লো শুভ্রপুষ্পিকার রাশি, অপর্ণার ফর্সা হাতে। সদ্য ফোটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভাসলো ঘরে। টাটকা যুঁইয়ের সুগন্ধ। হাতের 'পরে ফুলের রাশি দেখে পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে অপর্ণা বললেন,—কোথা থেকে আনলে? কোথায় পেলে এত ফুল?

অলকমোহন কপালের ঘাম মুছতে থাকে নীল-সার্টের আস্তিনে। বললে,—অনেক কষ্টে অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে বৌদি। সেই ঘোষপাড়া থেকে।

ঘরের এক কোণে ছিল একটি বেতের গোলাকার টেবিল। সেখানে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবি। নিকেলের ফ্রেমে। সেই ছবির সমুখে কাচের একটি রেকাবী। অপর্ণা অতি সন্তর্পণে ফুলের রাশি ঐ রেকাবীতে উজাড় করে দিলেন। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ছিটিয়ে নিলেন ফুলে। বললেন,—তুমি এই ফুল আনতে গিয়েছিলে ঘোষপাড়ায়? সে যে অনেক দূর!

অলকমোহন লজ্জা পায় এ কথায়। সলজ্জায় বলে,—তুমি যে বৌদি যুঁইফুল ভালবাসো। কথা বলতে বলতে থামলো এক মুহূর্ত। আবার বললে,—আর কি ফুল ভালবাসো বৌদি?

কুঁজো থেকে জল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়েছিল বুকের আঁচল-খানি। চাবির গোছা ঝনঝনিয়েছিল। ঘরের মেঝেয় লুটানো আঁচল যথাস্থানে টানলেন অপর্ণা। বললেন,—সব প্রথম ভালবাসি যুঁইফুল। কনকচাঁপা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, ক্রিসিন্থিমাম।

—কেয়া ফুল ভাল লাগে না তোমার ?

—কেয়া ফুল ?

—হাঁ।

খু—উ—ব ভাল লাগে। বললেন অপর্ণা, পরিতৃপ্ত কণ্ঠে। বললেন, —তবে চট করে দেখা যায় না কেয়াফুল।

—কে বললে তোমাকে ?

অপর্ণা ভ্রু কুঁচকে বললেন,—কোথায় দেখা যায় ? তুমি কোথায় দেখলে ঠাকুরপো ?

অলকমোহন বললে,—গঞ্জের ফুলের বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। শোনা যায় ঘরে রাখলে না কি সাপ আসে।

সহসা জিব কাটলেন অপর্ণা। বললেন,—ঠাকুরপো, তুমি রাত্তিরে এই নাম মুখে আনলে ?

অলকমোহন হাসলো। শব্দহীন হাসি। সে যেন জানতো অপর্ণা এই কথাটি বলবেন। হাসতে হাসতে বললে অলক,—কেন বৌদি, রাত্তিরে সাপের নাম করতে নেই কেন ?

আবার জিব কাটলেন অপর্ণা। আবার যে সাপের নাম করেছে অলক।

মা মনসাকে মনে মনে প্রণাম কর ঠাকুরপো। রাত্তিরে ও-নাম মুখে আনতে নেই। মা মনসা রুষ্ট হন।

অলকমোহন হাসিমুখে বললে,—রুষ্ট হয়ে কি করেন বৌদি ?

অপর্ণা খাটের কিনারায় বসলেন পা মুড়ে। মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে বললেন,—রাত্তিরে ও-নাম করলে মা মনসার বাহন নাকি দংশায়।

অলকমোহন মজা পায় যেন কথা শুনে। বলে,—দেখি আজ রাত্তিরের মধ্যে আমাকে দংশায় কি না। চন্দনদীঘির ধারে গিয়ে বসে থাকবো।

ভয়ে যেন সিঁটিয়ে উঠলেন অপর্ণা।

ভয়ার্ত্ত মুখভঙ্গী করলেন। দুই কাঁধ কাঁপিয়ে শিউরে শিউরে উঠলেন। বললেন,—খুব হয়েছে। আর বেশী বাহাদুরীতে কাজ নেই। মাথার অমন চুলগুলোকে কি ক'রে রাখা হয়েছে তাই শুনি?

অলকমোহনের মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল।

টাকার মত চাকা চাকা চুল রাশি রাশি। অযত্ন আর অবহেলায় এলোমেলো হয়ে আছে।

কথা বলতে বলতে খাট থেকে নেমে পড়লেন অপর্ণা বৌদি।

চুল-বাঁধার আড্ডা থেকে চিরুণীটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন অলকমোহনের কাছাকাছি। বললেন,—এসো আঁচড়ে দিই আমি।

সম্মতি বা প্রতিবাদ, কোন কিছুরই ধার ধারলেন না। কথা বলতে বলতে অলকের চিবুক ধ'রে তার মুখ তুললেন। ডান হাতের চিরুণী চলতে শুরু করলো!

একান্ত নিরুপায়ের মত তাকিয়ে থাকতে হয় অলকমোহনকে। পলকহীন চোখে অলক তাকিয়ে থাকে, অপর্ণা বৌদির মুখে চোখ রেখে। কি অপূর্ব্ব মুখশ্রী? সুর্ম্মা দেওয়া চোখে কি গভীর দৃষ্টি! কত বেশী লাল ঐ পাতলা অধর! সালঙ্কারা অপর্ণা বৌদির কি অপরূপ রূপমাধুরী।

—কালকে কলেজ নেই তোমার?

শুধোলেন অপর্ণা। অলকের চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন।

—হ্যাঁ আছে। কাল শ' এগারোটায় ফর্ষ্ট ক্লাশ। ন'টা পঁয়ত্রিশের ট্রেন ধরতে হবে। ন'টার মধ্যে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে।

একসঙ্গে অনেকগুলি কথাই বলে যায় অলকমোহন।

অপর্ণা বৌদি বললেন,—এখনও পড়তে ব'স নি? কলেজের পড়া করবে না?

হাসলো অলকমোহন। সরল হাসি। বললে,—কলেজের পড়াতো সেই পরীক্ষার আগে।

—তার আগে বুঝি পড়তে নেই? না কলেজের মেয়ে দেখে দেখেই সময় কেটে যাবে?

শেষের কথাটি বলতে বলতে হাসলেন বৌদি।

—ধ্যেৎ! কি যে বল' তুমি।

বললো অলকমোহন। সলাজ হাসি হাসলো।

—আমরা কি আর কিছু বুঝি না? বললেন অপর্ণা। সহাস্যে বললেন খু—উ—ব বুঝি। দেখে দেখে তাই বুঝি স্কটিশ্ চার্জ কলেজে ভর্তি হওয়া হয়েছে!

অসম্ভব লজ্জা পায় অলকমোহন।

মাথা নত করতে চায়। কিন্তু তার চিবুক অপর্ণার হাতে। সলজ্জায় বললে,—অন্য কোন কলেজে যে সীট্ পাওয়া গেল না। সেণ্ট্ জেভিয়ারে সীট্ পেলাম না যে।

—চেষ্টা করলে কি আর মিলতো না?

—সত্যি বলছি, সেণ্ট্ জেভিয়ার্সে সীট্ পাইনি।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

—অপর্ণা স্মিতহাসি হাসলেন। ইদিক সিদিক তাকিয়ে বললেন নতকণ্ঠে,—এই নীল পপলিনের সার্টটায় তোমাকে খু—উ—ব ভাল দেখায়।

এখন অপর্ণাবৌদি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। বললেন,—আয়নায় মুখটা দেখো তো। ভদ্র হয়ে গেছো ক—ত।

কোন কথা বলে না অলকমোহন। চুপচাপ থাকে। অপর্ণাবৌদি

চুল-বাঁধার আড্ডায় চিরুনী রেখে দিয়ে রেড়িওটা বন্ধ ক'রে দিলেন। দরবারী কানাড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক মন্ত্রী না উপমন্ত্রী লেকচার দিতে ব'সেছেন। কাঁচা গদ্যে কথা বলছেন। কাগজ পড়ছেন। 'কেন ঘুষ দেবেন না' বিষয়টি দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, "যারা ঘুষ নেয় আর যারা ঘুষ দেয় তারা উভয়েই সমান পাপী।"

গান নয়, বাজনা নয়, বাঙলায় লেকচার শুনবে কে এখন! অপর্ণা রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে খাটের কিনারায় দেহ এলিয়ে দিলেন আবার। অকারণ অবসন্নতার ভাব ফুটলো দেহভঙ্গিমায়। স্পষ্টতর হয়ে উঠলো দেহের রেখাগুলি। বললেন,—আজতো বারবাড়ীতে সারারাত নাচগান হচ্ছে।

—তাইতো দেখছি। লোকজনের বেশ ভীড় হয়েছে দেখলাম। যেন অপ্রস্তুত হয়ে কথা বলছে অলকমোহন। বংশের কুকীর্ত্তির লজ্জায় হয়তো। নয়তো বাঈজীর নাচের প্রসঙ্গই হয়তো লজ্জাকর।

অপর্ণা বললেন,—এখন যাও পড়তে যাও, কেমন?

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো অলকমোহন। ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এমন সময় অপর্ণা আবার কথা বললেন। বললেন,—ঠাকুরপো, রাত্তিরে আজ গল্প করা যাবে। আসবে তুমি? তোমার দাদাতো থাকছে নাচের আসরে।

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো অলকমোহন। তারপর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। আবার ডাকলেন অপর্ণা।

—ঠাকুরপো, শুনে যাও।

—কি?

ফিরে এলো অলকমোহন। দরজার মুখে।

—একটু দাঁড়াবে ভাই? আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

—কোথায় যাবে?

যাবো রান্নাবাড়ীতে। খোকার বার্লি তৈরী করতে যাবো। রান্নাবাড়ীতে দালানটায় যা অন্ধকার! বড্ড ভয় করে ভাই। আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি পড়তে যাও, কেমন?

বৌদির ভীতিকাতরতায় হাসলো অলকমোহন। বললে,—খোকার জ্বর কমেনি?

অপর্ণা বললেন,—জ্বর কমবে? এইতো সবে এসেছে! পালাজ্বরের নিয়মই এই। প্রথম চোটে খু—উ—ব জ্বর ওঠে। একেবারে একশো তিন ডিগ্রী। থার্মোমিটার আগে আগে দিতুম, এখন আর জ্বর দেখি না।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন অপর্ণা।

ঘরের বাইরের দালানে কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন,—সুপর্ণা, তুমি চোখ রেখো, ঘরে যেন কেউ না ঢোকে। আমি খোকার বার্লি নিয়ে এখুনি আসছি।

অপর্ণার একমাত্র কন্যা সুপর্ণা। কুমারী কিশোরী।

দালানের আলোয় বালব্ নেই, কে খুলে নিয়েছে। সুপর্ণা তাই একটি হ্যারিকেনের সমুখে ব'সে স্কুলের লেখাপড়া করছে। মাদুর বিছিয়ে নিয়েছে একটা। তাতেই লেখা করছিল এক মনে সুপর্ণা। মায়ের কথায় চোখ তুললো খাতা থেকে। কলম থামালো। বললে,—আচ্ছা। শীঘ্রি শীঘ্রি এসো কিন্তু। দেরী ক'র না যেন। একা একা আমার যে ভয় করবে!

—ভয় করবে কেন? আমি যাবো আর আসবো।

কথার শেষে দালানের এক দরজা অতিক্রম ক'রে অন্য এক দালানে পা দিলেন। সেখানেও দারুণ অন্ধকার। নেহাৎ অভ্যাস আছে তাই রক্ষা।

আগে আগে চলেছিল অলকমোহন।

অভ্যাসের গুণে চলেছিল হনহনিয়ে। পেছন থেকে এগিয়ে তার একটি হাত ধরলেন অপর্ণাবৌদি। ভয় পাওয়ার ভঙ্গীতে নিজের এক বাহু মধ্যে ধ'রে রাখলেন তার হাতখানি। তারপর চললেন ভীত ও ত্রস্ত পদক্ষেপে। চুপি চুপি কথা বললেন,—সারেঙ্গীর ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছো তো ঠাকুরপো ?

—হ্যাঁ।

নীরবতা আর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের গহ্বরে যেন দু'জনে হারিয়ে গেল।

শুধু সারেঙ্গীর সুরেল আওয়াজ আজকের বৈশাখী বাতাসে।

চন্দ্রমোহনের উৎসাহে আজ নাচ, গান, আর বাজানার রকমবেরকমের ডিমনষ্ট্রেশন হবে কত রাত্রি পর্য্যন্ত তা কেউ বলতে পা'রে না। চন্দ্রমোহন নিজে যে শুধু সঙ্গীতরসিক তাই নয়, তিনি স্বয়ং একজন বীণকার। বীণা আর সুরশৃঙ্গরে দস্তুরমত দখল আছে তাঁর। সুরের পূজারী তিনি। গানের সমঝদার।

সুরের পূজারী যে, তাঁর কেন এমন একচোখা দৃষ্টি !

চন্দ্রমোহন তারের যন্ত্র ধরেন কিন্তু মন থেকে অপছন্দ করেন পিয়ানো, অর্গান, হারমনিয়ম, গীটার। খাস বাঙলার জমিদার বাড়ীর বংশধর গান বলতে জানেন ধ্রুপদ আর ধামার। বাজনা বলতে বোঝেন মৃদঙ্গ, তানপুরা, বীণা, সুরশৃঙ্গার ব্যস।

বাঈজী দু'জন আসুক চাই নাই আসুক আজকের রাত্রি বৃথা চলে যাবে ! সদরের বড় হলঘরেই আসর হয়েছে। বড়বাবু চন্দ্রমোহন হলে পৌছেই বললেন ঃ—আর ওয়েট্ করা চলে না। ফর্ নাথিং সময় নষ্ট হচ্ছে। ততক্ষণ গান বাজনা চলুক না কেন !

অনেকেই একসঙ্গে তারস্বরে বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুক, তাই চলুক।

আকাশ কালো, রাতের অন্ধকারে। কত প্রত্যাশার এই রাত্রি! কত প্রতীক্ষার! সেই রাত্রিটুকু যদি বৃথাই অতিবাহিত হয়ে যায়? মিশ্ কালো আঁধার ফুরিয়ে আকাশ যদি হঠাৎ ফর্সা হয়ে যায়!

ঢালোয়া ফরাস বিছানো ঘরে যেন লোক আর ধরে না।

বাবুরা শুধু নেই, আছেন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব। বাবুদের যত সব এক গেলাশের ইয়ার। মোসায়েব। ফরাসের এক পাশে ততক্ষণে তানপুরায় সুর বাঁধাবাঁধি চলতে থাকে। যন্ত্রের কানে পাক দেওয়া হয়। তবলার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

—বাঈজী যদি না আসে, আমার চাঁদার টাকা ফেরৎ দিতে হবে!

অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে কে একজন বললেন। বাবুদের মধ্যে থেকে। কথা বলতে বলতে হাসলেন। নকল হাসি।

কথা কি আর শোনা যায়। কারও! কেই বা শোনে! ঘরে যেন, খণ্ডযুদ্ধ চলেছে হাসি তামাসা মস্করার। কত—কত দিন পরে একত্রে মিলেছেন চন্দনধামের বাবুরা! আজ রাত্রির মত সকলেই এক এক অজাতশত্রু হয়ে পড়েছেন। বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে গেলেন পরস্পরে। মুখ দেখাদেখি ছিল না যাঁদের মধ্যে, জলসার যাদুমায়ায় আর মদিরাসুধায় তাঁরা আজ আত্ম-পর মানবেন না।

—আমার একটা এ্যাপীল ছিল তোমাদের কাছে!

বড়বাবু চন্দ্রমোহন কথা বলছেন। গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁর। সকলের মুখের কথা থেমে যায়। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। তিনি বললেন,—এটা নাচগানের জলসা, সকলকে মনে রাখতে হবে। গল্পগুজবের আড্ডা নয় এটা। কথা বলতে হয় এঘরের বাইরে গিয়ে কথা বল'।

চন্দ্রমোহন কথা বলছেন। প্রায় সকলেই নীরব হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে। যে যার দোষ বুঝে যেন নিশ্চুপ হয়। তানপুরা আর তবলার প্রস্তুতি-ধ্বনি স্পষ্টতর হয়।

সদরের দোতলার নাচঘর, চতুষ্কোণ নয়, অষ্টভুজাকৃতি। প্রায় গোলাকার বললেই হয়। নাচঘরের কোলে কোলে দালান আর টুকরো টুকরো ঘর। কোন ঘরে ছিল বাবুর্চিখানা। কোনটি ড্রেসিংরুম বা সাজঘর, কোনটি গোসল খানা। আবার কোনটির নাম বুঝি বা ওয়াইন-চেম্বার, —যেখানে থাকতো শুধু হরেকরকমের বোতল আর বোতল। আবলুশ কাঠের বিলেতী ক্যাবিনেট পরিপূর্ণ থাকতো। বোতল বোতল হুইস্কি, জিন, শেরী, স্যাম্পেন, কুঁইয়া আর রম্, বীয়র, ব্র্যাণ্ডি। বিলেতী জাতের ক্যাবিনেট কত কালের তা কেউ জানে না। বিলেতী, তাই তার ফাট ধরেনি কোথাও, চিড়ও খায়নি। শুধু ঘুণ ধরেছে। আয়নার কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে। ক্যাবিনেটে এখনও আছে সারি সারি বোতল। তবে শূন্য এই যা দুঃখ।

ঘরে ঘরে এখন আরশুলা চামচিকার বসতি। নাচঘরে রাত্রে চলে ছুঁচোর কীর্ত্তন!

রাত্রি ঘন হ'তে থাকে ক্রমেই, অথচ কলকাতার বাঈজীর সাক্ষাৎ নেই এখনও। কেমন যেন মনমরা হয়ে যায় কেউ কেউ। গুম মেরে যায়। চন্দ্রমোহন বললেন,—কলকাতার বাঈজী যদি না আসে, চন্দন-পুরের গঞ্জ থেকে বাঈজী আনবো আমি। তারজন্যে তোমরা কেউ ভেবো না।

—চন্দনপুরের গঞ্জে বাঈজী নেই, আছে খেমটাউলী।

বাবুদের ভেতর থেকে কে যেন বলেন দাঁতে দাঁত চেপে। নতকণ্ঠে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—কুছ পরোটা নেই, খেমটাই সই। যস্মিন্ দেশে—

— নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভাল।

আবার কার সহাস মন্তব্য। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে কে যেন বললেন। চন্দ্রমোহন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বল্লেন,—ডিসকারেজড্ হও কেন সব? ট্রেনের টাইম এখনও উৎরোয়নি। লাষ্ট ট্রেনই আছে রাত দশটা ক' মিনিটে।

—আগে গান হবে না বাজনা হবে?

কে যেন ভয়ে ভয়ে শুধোয়। ত্রস্ত কণ্ঠে।

কাঠ-বিড়ালীর লেজের মত চন্দ্রমোহনের দুই ভ্রূ বাঁকা হয়। ক্ষণেক চিন্তিত হন যেন। সিগারেটে টান দিতে দিতে ইদিক সিদিক দেখেন। কাকে যেন খুঁজতে থাকেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। আশপাশে চোখ ফিরিয়ে বললেন,—সতু কোথায় গেল? সে যা বলবে তাই হবে। হি ইজ্ অথরিটি ইন্ দিস্ লইন।

সতু ওরফে সত্যেন্দ্রমোহন। এ গৃহের এক বংশধর। চন্দ্রমোহনের প্রায় সমবয়স্ক একজন। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁর নাকি অসম দক্ষতা। রাগ রাগিনীর জ্ঞান অসীম। সত্যেন্দ্রমোহন নিজেই ধ্রুপদ ধামার গাইতেন এক কালে। বহু ওস্তাদের পায়ে বহু টাকা ঢেলেছেন। বাঁকুড়া আর বিষ্ণুপুরের গাইয়েরা পর্য্যন্ত তাঁকে সম্মান করেন এখনও।

নাচঘরেই আছেন তিনি। সুর বাঁধার দলে ভিড়ে সুর বাঁধার কাজে মেতে আছেন। সত্যেন্দ্রমোহন বললেন,—বাজনার পালা আগে চুকে যাক্। তারপর গান হবে। আগে অর্কেষ্ট্রা হোক্ না।

— দ্যাটস্ রাইট্।

সোল্লাসে বললেন চন্দ্রমোহন!

চন্দনপুরের অর্কেষ্ট্রা ক্লাবের নাম এ তল্লাটে কে আর না জানে? ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন অর্কেষ্ট্রা ক্লাবের নাম? চন্দ্রপুরের চতুঃসীমার মধ্যে সৌখীনদের নাটক-অভিনয়ে এই ক্লাবই মুখরক্ষা করে। চন্দনপুরের যে কোন মেয়ের বিয়ের আসরে বরপক্ষদের খুশী রাখে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। একদিন এই ক্লাবের সভ্যদের সকলেই ছিল ফ্রেণ্ডস্, সভ্যদের মধ্যে দস্তুরমত ইউনিয়ন ছিল। ক্লাবের সেক্রেটারীর পদ নিয়ে ভোটা-ভুটিই যত নষ্টের মূল। আজ তাই অর্কেষ্ট্রার ঐকতানে তান আছে, ঐক্য বুঝি নেই।

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে খুশীর জোয়ার বইতে থাকে। সর্ব্বাগ্রে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম চান্স্ দেওয়া হয়েছে। বাজিয়েরা মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে ন'ড়ে চ'ড়ে বসে। যে যার যন্ত্রে হাত দেয়।

সত্যেন্দ্রমোহন বললেন,—তোমাদের বিলীতি গৎ ফৎ চলবে না এখানে। স্রেফ দিশী সুর বাজাতে পারোতো দেখো।

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব এখনও কোন কিছুতে পেছপাও নয়। দলের প্রত্যেকের মুখে মৃদু-মৃদু হাসি ফুটলো। দৃষ্টি বিনিময় করলো পরস্পরে। বেহালায় ছড়ি পড়লো। ক্লারিওনেট মুখে উঠলো। টেবিল হারমনিয়মে পা পড়লো। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুর ধরা হয়। এক চেনা চেনা সুর। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর। অতিথি এসেছে দ্বারে...ছিল সে নদীর পারে.... চেনা চেনা যেন মুখটি তার—

চন্দনপুরের বাতাসেও যেন আজ নেশার আমেজ।

গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার ক্ষেপা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। প্রথম রাত্রির আঁধারে যেন নেশার কাজল। অন্যান্য রাতে এতক্ষণ শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়; মধ্যে মধ্যে শিয়ালের কোরাস। আজকে যেন অর্কেষ্ট্রার

মিষ্টি সুরের বহুদূরবিস্তৃত তরঙ্গে চন্দনপুর মুখর হয়ে উঠেছে। চন্দনধামের বাবুদের দোতলার নাচঘরে উজ্জ্বল আলো—ডায়নামোর বিজলী।

চন্দনধামের ফটকের সমুখে মানুষের ভীড় জমেছে।

বাবুদের দোতলার নাচঘরে গান বাজনা চলবে, বাঈনাচ হবে। যারা অনাহুত তারাই দাঁড়িয়ে গেছে ফটকের বাইরে। যদি ঐ নাচঘরের উন্মুক্ত জানলা ভেদ ক'রে দেখা যায় বাঈজীর দেহলাবণ্য! প্রবেশের অনুমতি নেই। ফটকের পাহারাদার দিলবাহাদুর আজ যেন বড় বেশী কড়া হয়ে উঠেছে। তার মিলিটারী মন আজ যেন এতকাল পরে জেগে উঠেছে। কোন রকম বেয়াদপি বা বেনিয়ম সে আজ আর বরদাস্ত করবে না। ফটকেই আছে দিলবাহাদুর। সামরিক কায়দায় বন্দুকধারী দিলবাহাদুর পাষাণ মূর্ত্তির মত অবিচল দাঁড়িয়ে আছে। অনাগত রাত্রির প্রতীক্ষায় সারাটি দুপুর ধ'রে ঘষে মেজে সাফ করেছে মরচে-ধরা বন্দুকটাকে। ঐ প্রিয়তম সাথীকে বুকে জড়িয়ে আছে যেন দিলবাহাদুর। পোকায় কাটা মিলীটারী পোষাক উঠেছে অঙ্গে। খাকির জামা আর পায়জামা। বুকের 'পরে ঝুলিয়েছে কয়েকটি মেডেল। সোনা কিংবা রূপার নয়, স্রেফ শিশার মেডেল—শক্তি ও সামর্থ্যের সার্টিফিকেট যেন। এখন রণনিপুনতার পরিচয়। কীটদষ্ট পোষাক আর তালি দেওয়া বুট জুতোয় নেহাৎ বেমানান হয়নি। ভালই দেখায় বুড়ো দিলবাহাদুরকে।

উন্মুক্ত ফটক। বাইরের পথে উৎসুক জনতা। যত সব সঙ্গীতরসপিপাসু।

কিন্তু ফটকে যে দিলবাহাদুর। কেউ যদি পা বাড়িয়েছে তো বন্দুকের গুঁতো খেয়েছে তৎক্ষণাৎ! বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে নির্ব্বাক নিস্পন্দের মত। অর্কেষ্ট্রার সুর ফটক পর্য্যন্ত ভেসে আসে। ভারী মিঠে শোনায় বাতাসে ভাসমান কনসার্টের আওয়াজ।

পথের অদূরে দুটো অগ্নিগোলক। হঠাৎ চোখে পড়লো।

পাশপাশি দুটি ধূমকেতু যেন, ছুটতে ছুটতে আসছে। অন্ধকারের বুক চিরে যেন আসছে। দিলবাহাদুর তার নিস্তেজ চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়। বার্দ্ধক্যের জরায় চোখে আর তেমন দৃষ্টি নেই আগের মত। আকাশের উড়ন্ত পাখী আর অনেক উঁচু গাছের শীর্ষে ঝুলন্ত ফল একটি টোটায় আর দাগতে পারে না দিলবাহাদুর।

বিশ্বাস হয় না নিজের চোখ দুটোকে। পলকহীন ব্যগ্র দৃষ্টিতে দেখে তবু।

বাবুদের গাড়ী আসছে কি? বাবুদের মোটর-গাড়ী! উনিশসো বিশ সালের মডেলের সেই পুরাণো ফোর্ডখানা! কনসার্টের সুরের সঙ্গে মোটরের যান্ত্রিক শব্দের মিলন হয়। বড় বিশ্রী শোনায় যেন!

দিলবাহাদুর পা বদলায়। দাঁড়ায় গোড়ালীতে গোড়ালী ঠুকে।

পথের অদূরে বাবুদের ঝরঝরে ফোর্ডের তীব্র হেডলাইট। যেন এক মত্ত দানবের মত গাড়ীটা ছুটে আসছে সশব্দে।

ষ্টেশন থেকে গাড়ী আসছে। গাড়ীর গর্ভে আছে বাঈজী দু'জন, আরও যেন কে কে আছে।

ফটকের দু'ধারে ছিল মাধবীলতার ঝাড়। বহুদিনের দুটি বুড়ী বৃক্ষলতা। এক দিকের মাধবীর ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র। কিছুক্ষণের মত ফুরসৎ পেয়ে আরামে বিঁড়িতে টান

দিয়ে চলেছিলেন। মোটরের হেডলাইটের আলোকপুচ্ছ নজরে পড়তেই যেন স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি। আধ-খাওয়া বিঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

বিজলী ব্যাটারীর আলো মোটরে।

হেড লাইটের স্বচ্ছ আলোয় চন্দনধামের সমুখের পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্ধকারে। চন্দনধামের আশপাশে আগাছার ঘন জঙ্গল আর দীন-দুঃখীদের মাটির বাসা। মোটরের আলো পড়তেই মাটির ঘরের যত দরিদ্রজন সচকিত হয়ে ওঠে।

ফটকের সামনে গাড়ী দাঁড়াতে সামরিক কায়দায় এগিয়ে যায় দিলবাহাদুর। গাড়ীর পাশে গিয়ে একটি সেলাম ঠোকে। তার পায়ের বুট খটাখট শব্দ তোলে।

নায়েব কৃষ্ণচন্দ্রকে একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও এগোতে হয়।

বাঈজী না বারবনিতা কে জানে! তিনি যেন ঘৃণায় সিঁটিয়ে আছেন আজ। চন্দনধামের সৌখীন বাবুদের হাজারো রকমের সখ আর বদ খেয়াল থাকতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র নেহাৎই নায়েব। সখ বলতে কিছুই তাঁর নেই। এখনও তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাতা লেখার কাজের আগে, এমন কি মুখে জল দেওয়ার আগে, অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বাগ্রে লালকালির কলম ধরেন। বাবুদের কাছারীতে ধূনো আর গঙ্গাজল পড়ে যখন, নায়েবমশাই তখন লাল কালির আখরে লিখতে থাকেন দুর্গানাম। ঠিক পাকা একশো আট নাম লেখেন প্রতিদিন। পরস্ত্রীর মুখ দেখেন না কখনও, পায়ের দিকে চোখ রাখেন।

দালাল, সারেঙ্গী বাজিয়ে আর দুজন ওড়নায় ঢাকা মুখের কারা যেন গাড়ীর গর্ভে! ফটক পেরিয়ে গাড়ী সোজা চললো সদরের মুখে। গর্জ্জন করতে করতে। পুরানো আমলের ফোর্ড। উনিশ শো বিশ শতকের টুরার মডেল—মাটি থেকে অনেক উঁচু, সরু চাকার গাড়ী। শিথিলগ্রন্থি

বুঢ়োর মত নড়বড়ে হয়ে গেছে। সেলফ্ ষ্টার্ট কবে বিগড়ে গেছে। হ্যাণ্ডেল না মারলে চলে না। গাড়ীটির প্রতি বাবুদের কারও যত্ন নেই আর। বারোয়ারী গাড়ী, তাই দৃষ্টি নেই বিশেষ কারও। ধোয়া-মোছা করে না কেউ, কস্মিনকালেও। মার্ডগার্ড ঝাঁজরা হয়ে গেছে, যক্ষারোগীর ফুসফুসের মত। সাইলেন্সার ফেটে গেছে, তাই গাড়ীর এত তর্জ্জন গর্জ্জন। হুডে তালি পড়েছে বেশ কয়েকটি। গাদীর ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। হেডলাইটের কাচ ফেটে গেছে। তুবড়ে গেছে বডির এখান সেখান।

নারীর যদি বয়স বেশী হয়? গাড়ী যদি ঝরঝরে হয়ে যায়?

তাই আর বাবুদের তেমন নজর নেই গাড়ীর প্রতি। দেখেন না কেউ। তবুও শ্রেফ্ ফোর্ড (প্রথম) সাহেবের নির্ভেজাল যন্ত্রপাতির গুণে চিরকালের মত এখনও থেমে যায়নি গাড়ীর ষ্টার্ট! পেট্রোল, মবিল ঢেলে হ্যাণ্ডেল মারলেই গর্জ্জে ওঠে। ব্যাটারীতে ডিসটিল্ড জল ঢালতে হয়।

অর্কেষ্ট্রায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর, চন্দনধামের প্রতি মানুষকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে। ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবের কনসার্ট, কত দূর থেকে শোনা যায়। চন্দনপুরের বাতাসের সঙ্গে পর্য্যন্ত যেন তার মিতালী; বহু দিনের পরিচয়। কনসার্টের কত মধুমিষ্টি সুর শুনে চন্দনপুরের কত কুমারী-মন ক্ষণেকের জন্য অন্যমনা হয়ে গেছে। অর্কেষ্ট্রার সুরে কত আনন্দের বাণী, প্রেমের আবেদন-নিবেদন, কত ব্যথা আর বেদনা যে মিশে থাকে!

নাচঘরে আর প্রবেশ করবেন না, পণ করেছিলেন নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র।

চোখে দেখবেন না বেলেল্লাপনা, কানেও শুনবেন না নাচঘরের হাসি-তামাসা। ও সব চোখে দেখলে আর কানে শুনলে নাকি মনের 'পরে সবিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মন নীচু হয় যায়। মনের বিকার হয়। আত্ম-সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তবে কৃষ্ণচন্দ্রকে যে বেতনভোগী পুরাতন

ভৃত্য বললেও হয়। কর্ত্তব্যের কাছে মনের অধোগতি হওয়ার শঙ্কা বা সঙ্কোচের কোন মূল্যই নেই।

নাচঘরে যেতেই হয়। ভয়ে ভয়ে চোরের মত প্রবেশ করেন নায়েব।

বড়বাবু চন্দ্রমোহন বললেন,—হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট হিয়ার? (এখানে তুমি কি চাও?)

নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে যান আর বলেন,—হুজুর, কলকাতা থেকে তাঁরা এসেছেন। ষ্টেশন থেকে আমাদের গাড়ী ফিরেছে।

দু' এক মুহূর্ত্ত স্থিরচোখে তাকিয়ে থাকেন চন্দ্রমোহন। তারপর বলেন,—গেট্ আউট্ ক'রে দাও! ঠিক জাষ্ট্ এ্যাট্ সিক্স্, ঠিক ছটার মধ্যে শালীদের এখানে পৌছানোর কথা, এখন রাত আটটা বেজেছে!

নাচঘরের দেওয়ালে আদ্যিকালের এক টাইমিং ক্লক।

কনসার্টের সুরে চাপা পড়ে যায় ঘড়ির সশব্দ সঙ্কেতের ঝঙ্কার।

হুজুরের কথা শুনে নায়েব যেন থ মেরে যান। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত চোখে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—হোয়াই ডু ইউ ওয়েট? (আর তোমার অপেক্ষা কেন?)

আমতা আমতা করেন কৃষ্ণচন্দ্র! বলেন,—হুজুর আমি এ সব কথা বলতে পারবো না। আমি ওদের সঙ্গে বাক্যালাপও করি না। আমাকে ক্ষমা করুন।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন চন্দ্রমোহন। সোল্লাসে। হাসতে থাকলেন তো হাসতেই থাকলেন। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়লেন; এলিয়ে পড়লেন একটি ভেলভেটের তাকিয়ায়। নায়েবের কি অস্বাভাবিক বিধবাপনা, সেই কথা ভেবেই অট্টহাস্য শুরু করেন চন্দ্রমোহন। হাসির তোড়ে লজ্জানুভব করেন নায়েব। তাঁর কপাল

ঘামতে থাকে। পাঁজরাসার বক্ষ দুরু দুরু করে। কয়েক মুহূর্ত অধোবদনে দাঁড়িয়ে নাচঘর থেকে বেরিয়ে যান লজ্জায়।

দালাল শিউশরণ কিন্তু কোন কথাতেই কর্ণপাত করে না। কার প্রতি দৃকপাতও করে না। বাবুদের কে কি হুকুম করলো কাণে তোলে না দালাল। কলকাতা থেকে চন্দনপুর ট্রেনের থার্ড ক্লাশে আসতে হয়েছে তাকে। ঢিমেতেতালার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আসতে হয়েছে। কত কষ্ট যে করতে কয়েছে শিউশরনকে! দম বেরিয়ে গেছে যেন। তাও যদি সে একা থাকতো, কোন কথাই ছিল না। সারেঙ্গী বাজিয়ে আর দু'জন ওড়নায় ঢাকা মুখের তন্বী যুবতী সঙ্গে এসেছে। ঘরমুখো যাত্রীদের বৈকালী ট্রেনের ভীষণতম ভীড়ের মধ্যে বাঈজীদের সম্মানরক্ষা করতে হয়েছে তাকে। ওদের শরীরে মাছিটিকে পর্য্যন্ত বসতে দেয়নি শিউশরণ। গায়ে কোন আঁচ লাগতে দেয়নি। হাওড়া ষ্টেশনের জনারণ্যে ওদের নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যেন।

চিৎপুর, ফুলবাগান, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট আর বৌবাজারের পথ ওতপ্রোত ভাবে চেনে শিউশরণ। ঐ সকল অঞ্চলের নাড়ী-নক্ষত্র তার নখদর্পণে। বাঙলা দেশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীকে সে চিনবে কোথা থেকে? জন্তু-জানোয়ার অর্থাৎ ট্রেনের ভেড়া-ছাগলের কামরাও বুঝি এর কাছে স্বর্গতুল্য!

শিউশরণ বাবুদের কারও কথায় কাণ দেয় না।

সঙ্গের সঙ্গীদের নিয়ে সদরের দোতলায় পৌঁছে সাজঘরে ঢোকে। নাচঘরের লাগোয়া সাজঘর। নায়েব তাকে চন্দ্রমোহনের নির্দ্দেশ শুনিয়েছে অক্ষরে অক্ষরে, তবুও শিউশরণ অনড় অটল। নায়েবের মুখে

কথাগুলি শুনে বলেছে,—বড়বাবুকে বলুন যে, যাদের এনেছি তাদের দেখলে আর মুখে কোন বাৎচিৎ থাকবে না!

স্বর্গ থেকে যেন অপ্সরী, কিন্নরীদের হু'টিকে ধ'রে এনেছে শিউশরণ। সমুদ্রের অতলতার ম্যধ থেকে পাকা ডুবুরীর মত এনেছে দু'টি মৎস্য-কন্যা? এমনই গর্ব্বভরা কথার ধরণ শিউশরণের।

নাচঘরের পাশেই সাজঘর। নিজের দলকে ভেতরে পুরে দিয়ে সে হন হন ক'রে চললো নাচঘরের দিকে। চন্দ্রমোহনের সঙ্গে চার চোখ এক হতেই শিউশরণ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে,—হুজুর, হাওড়া ইষ্টিশনতো নয় যেন হরিহরছত্রের মেলা! দু দু'টো টেরেন ফেল্ করেছি! সঙ্গে ছিল দু'দু'টো জোয়ান আওরৎ, বলেন কেন আর! হুজুর, ওদের যদি চেখে দেখেন তো আর হামাদের তাড়িয়ে দিবেন না।

ফরাস থেকে উঠে পড়লেন চন্দ্রমোহন। ধড়মড়িয়ে। দ্বারমুখে এগোলেন।

কনসার্ট চলতেই থাকে। বাবুদের কেউ কেউ খুশী খুশী চোখে দেখলেন শিউশারণকে। দেখলেন, এক নম্বর সুতোর মিলের ধুতি আর চুড়িদার আদ্দির আজানুলম্বা পাঞ্জাবী শিউশরণের পরণে। ফুলেল তেলে ভেজা এলোমেলো চুল মাথায়। কপালের মধ্যিখানে লাল চন্দনের সুবৃহৎ ফোঁটা। তার পানলাল ঠোঁটের আড়াল থেকে একটি সোনার দাঁত উঁকি মারছে।

সাজঘরের দরজা ফাঁক ক'রে চুরিয়ে চুরিয়ে দেখেন চন্দ্রমোহন।

সরাসরি ঘরে ঢুকে দেখতে যেন লজ্জা পান, সদরভর্ত্তি লোকজনের সমুখে।

সাজঘরের অন্দর দেখা যায়। সংস্কারের অভাবে এঘরের বিজলী-লাইন অকেজো হয়ে গেছে, তাই একটা হ্যাজাক জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। যেন দিনের আলো ফুটেছে ঘরে, ডে-লাইটের আলোয়।

চন্দ্রমোহন দেখছেন তো দেখছেনই। চোখ আর ফেরে না যেন।

রাশ আলগা দৃষ্টি। চন্দ্রমোহন দেখলেন, সত্যিই অপ্সরী-কিন্নরী। যেন রম্ভা আর মেনকা। যেন অবিরাম নাচানাচির পর ক্লান্তা,—অবসন্ন দেহে ব'সে পড়েছে। সাজঘরের ইঁদুরে-কাটা, তুলো বেরিয়ে-পড়া কৌচে এলিয়ে পড়েছে। ওদের একজন হাতপাখার হাওয়া খাচ্ছে। হ্যাজাকের আলোয় ওদের আসল না নকল হীরার অলঙ্কার ঝলমল করছে। নাকের নোজ-পিন আর কাঁচুলী-উঁচু বুকের ব্রোচ চিক চিক করছে। বদ্ধঘর, তাই লাজলজ্জার বালাই নেই। ওড়না নেই মাথায়, নেই বুকের বসন।

ওদের কাজল-কালো চোখ দেখে বুঝি আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন চন্দ্রমোহন। দরজার ফাঁক থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন,—শিউশরণ, তোমরা যখন এসেছো তখন আর ফিরে যেতে হবে না। অনেকটা পথ এসেছো, বিশ্রাম কর কিছুক্ষণ।

শিউশরণ একমুখ হাসলো। হাসতে হাসতে বললে,—হুজুর, হামাদের চা আর জল-খাবারের কথা বলিয়ে দিন। হুকুম করে দেন একবার।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বললেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—চা জল খাবার দেবে বৈকি তোমাদের!

পানলাল দাঁত দেখিয়ে নীরব হাসি হাসলো শিউশরণ। বার্ণিশ চটির চটাপট শব্দ তুলে চলে গেলেন চন্দ্রমোহন।

বাঈজীদের জন্য সাজঘরে বন্দোবস্ত হয়েছে। পৌঁছেইতো আর আসরে নামতে পারে না। জিরেন চাই খানিক্ষণ।

শিউশরণ জানতো সেই ঘর, বেশ ভালভাবেই জানতো। অনেক দিন ধ'রেই তার জানপছন এই ঘরের সঙ্গে। এই সাজঘরে কত কত বাঈজী-নর্ত্তকীকে বসিয়েছে শিউশরণ! তদারকী করেছে তাদের।

সাজঘরে আজ আলো পড়েছে! হ্যাজাক জ্বলেছে। ডে-লাইটের মত দিনের আলো।

ঘরের বিজলী-লাইন শর্ট হয়ে গেছে। লাইন বদল করা হয়নি এখনও। অনেক, অনেকদিন পরে ঘরের ঝাপসা আয়না ক'টায় মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। বেলজিয়ান কাচের লুকিং গ্লাস, অব্যবহারে মলিন হ য় গেছে।

সাজঘরের ছোবড়া-বেরিয়ে-পড়া একটি লম্বা কৌচে বসেছিল দুই তন্বী—যাদের তনুর তনিমা দেখে চন্দ্রমোহনের চোখ কপালে উঠে গেছে। পথের ক্লান্তিতে ওদের দেহ বুঝি অবসন্ন, তাই বসতে বসতে কখন যে এলিয়ে পড়েছে, তা যেন নিজেরাই জানে না। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, মুখে মালিন্য, গাম্ভীর্য্য।

সারেঙ্গী বাজিয়েদের একজন একপাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখার হাওয়া খেলায়। বাঈ দু'জন গরমে যেন হাঁসফাঁস করছে। বদ্ধঘরের গুমোট গরমে ঘামছে। কাঁচুলী ভিজে গেছে। হাওড়া ষ্টেশনের জনারণ্য থেকে তিন দাঁড়ির কামরার ঠেসাঠেসি—সেখান থেকে আবার এই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন সাজঘরে!

শিউশরণ ঘরে গিয়েই বললে,—তোদের চা জলখাবার আনতে অর্ডার করেছি। ভাবিস না নূরজাহান বাই আউর মতিয়াবিবি!

ওরা নিমীলিত আঁখি মেলে। যেন ঘুমিয়েছিল, কথা শুনে চোখ চাইলো। আড়-নয়নে দেখলো শিউশরণকে। শুনলো, সে কি বলছে।

নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, ধূলিমলিন সাজঘরে উগ্র সুগন্ধের ঢেউ। খস

আতরের গন্ধ বইছে। নূরজাহান বাই আর মতিয়াবিবি হয়তো এক আধ ছিটে বক্ষবাসে ঘষেছে। কী অসহ্য গরম সাজঘরে। মর্ত্যস্বর্গের অপ্সরী দু'জন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ওদের চিবুকে ঘর্ম্মরেখা ফোটে।

বাবুদের কেউ কেউ ঘরের সমুখ দিয়ে অকারণ ঘোরাফেরা শুরু করেন।

— তোমার চা-ও চাই না, খাবারও চাইনা শিউশরণ, শুধু একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াও আমাদের। কথা বললে মতিয়াবিবি। আড়নয়নে চেয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে কথা বললে। বললে,—তেষ্টায় বুকের ছাতি যে ফেটে যাচ্ছ!

—সব আসবে বিবিজান, সব আসবে। তোমার চা আসবে, জল আসবে, খাবারও আসবে। খোদ কর্ত্তাকে অর্ডার করেছি হামি।

কথা বলতে বলতে সাজঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মেঝেয় উবু হয়ে ব'সে পড়লো শিউশরণ। আজানুলম্বিত চুড়িদার পাঞ্জাবীর সুগভীর পকেটে হাত চালিয়ে বের করলো কি যেন একটা। বললে—শালার নেশার টাইম পাশ করে গেছে বহুৎক্ষণ, খেয়ালই নেই হামার!

দুই নারীর ওষ্ঠাগ্রে হাসি ফুটলো। ঈষৎ কৌতুকমিশ্রিত, তবুও নির্লিপ্ত হাসি। মৃদু হেসে নূরজাহান বাঈ বললে,—এ কোথায় বন-বাদাড়ে ধ'রে আনলে শিউশরণ? এমন জানলে আমি—

— বন-বাদাড় কোথায় দেখলে নূরজাহান বাঈ? কথার মাঝপথে কথা ধরলো শিউশরণ। বললে,—চন্দনপুর বহুৎ আচ্ছা জায়গা আছে, কিছু বেশী ম্যালোয়ারী আছে, নয়তো জায়গা বহুৎ ভাল।

খিল খিল শব্দে হাসলো ওরা দু'জন। একজঙ্গে হেসে উঠলো।

একজন অন্যজনের সঙ্গে ঢ'লে পড়লো হাসতে হাসতে। মিশি-মাখানো কালো দাঁতের সারি দেখা যায় দু'জনের। হ্যাজাকের তীব্র আলোয় ওদের বেশভূষা চাকচিক্য ছড়ায়।

—তাই এত মশা, নয় শিউশরণ ?

খিল খিল হাসি থামিয়ে মতিবিবি প্রশ্ন করে।

সত্যিই, মশার কি দৌরাত্ম্য !

স্থির হয়ে থাকলেই ভোঁ ভোঁ করে কাণের কাছে।

আবার মশার ডানা ওড়ার শব্দ নাকি ঠিক কানের কাছটিতে না পৌছলে কোন আওয়াজই কানে পৌছায় না। তেমনি কি না ব'লে ক'য়ে যখন তখন যেখানে সেখানে দংশন করে! আর সামান্ত ঐ হুলের কি ভীষণ জ্বালা! যেন জ্বলিয়ে দেয়! প্রথমে জ্বলে, তারপর চুলকোয়,তারপর আমবাতের মত ফুলে ফুলে ওঠে, যেখানে হুল ফোটায়।

মশার কি দোষ !

বাঙলার গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার এঁদো পুকুর থাকতে যেতে যাবে মশককুল! গ্রামতো আর বন-বাদাড় নয় সত্যি কথা, তবে কেন এত আগাছার বন—জঙ্গল, গ্রামের যেখানে মানুষের বসতি সেখানে! মিউনিসিপালিটির মহিমায়! মশাকে দুষে কিছু লাভ নেই, কিছু লাভ নেই।

শিউশরণ বললে,—হামাদের বেহারে মতিবিবি মশা দেখা যায় না, শুকনো খটখটে জায়গা আছে বেহারে। তোমাদের হাওড়া আউর হুগলীর মশাতো মশা নয়, যেন একটা একটা মনিয়াপাখী!

আবার হাসলো ওরা। খিল খিল হাসি!

হাসির সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের দেহে হিল্লোল উঠলো। জোছনাভরা আকাশের তলে যেন সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলো।

আসমানী রঙের পাৎলা বেনারসী প'রেছে নূরজাহান বাঈ। ফিকে নীল ওড়না।

মতিবিবি পরেছে ছাই রঙের বেনারসী। ময়ূরকণ্ঠী রঙ ওড়না।

প্রথমার ঘন লাল আর দ্বিতীয়ার বুকে বেগুনী ভেলভেটের কাঁচুলী এঁটেসেঁটে ব'সে গেছে যেন। নকল না আসল কে জানে, কুঁচো হীরের অলঙ্কার দু'জনের সমান সমান। চুড়ি, চিক আর ঝুমকো। বুকে ব্রোচ। হাতের আঙুলে আঙটি। নকল না আসল কে জানে, ওদের অবাধ হাসির হিল্লোলে হীরের ছটা ছড়াতে থাকে ঘরে।

মতিবিবি বললে,—শিউশরণ, এই গুমোট ঘরে তুমি কি গাঁজার ধোঁয়া ছাড়বে নাকি? ম'রে যাবো তা হ'লে দম বন্ধ হয়ে!

কলকেয় আগুন ধরায় শিউশরণ। কথার কোনই জবাব দেয় না। কলকেয় শুধু ফুঁ দিয়ে যায়। নেশার টাইম না কি উৎরে গেছে বহুক্ষণ।

—তোমার চা জল খাবার কখন আসবে শিউশরণ? তেষ্টায় যে ম'লাম আমি!

নূরজাহান বাঈ তৃষ্ণার কাতর সুরে কথা বলে। কৌচে উর্দ্ধাঙ্গ এলিয়ে দেয় কথার শেষে।

জবাব দেবার ফুরসৎ নেই শিউশরণের। কোন দিকে দৃকপাত নেই। দুই মুষ্টির বেষ্টনে আবদ্ধ প্রায় অদৃশ্য কলকেয় টান দিতে থাকে। এমনই ঘন ঘন, যেন কস্মিনকালেও থামবে না সে।

বিশ্রী এক গন্ধ ভেসে ওঠে ঘরে। গাঁজার ধোঁয়া, ভাসতে থাকে ঝাজাকের চতুঃপার্শ্বে। কোন দিকেই দৃকপাত নেই শিউশরণের। দুই চক্ষু সে বুঁজে ফেলেছে, হয়তো নেশার উগ্রতায়। কলকে তৈরী হওয়ার টান দেয় এখন, আসল টান দেবে খানিক পরে। আঁচ ঠিকঠাক ধরলে। তবুও অদ্ভুত এক কটুগন্ধে ঘরের আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে যেন।

খস আর অটো দিলবাহার গায়ে ছিটিয়েছিল ওরা দু'জন। কোথায় মিলিয়ে যায় তাদের ঘুমপাড়ানি, মনমাতানি সুগন্ধ!

—শিউশরণ!

কে যেন ডাক দেয় দরজার বাইরে থেকে। বয়স্ক কণ্ঠ।

সাড়া দেবে কে?

শিউশরণের মুখ এখন বন্ধ! মুষ্টিবদ্ধ কলকে তাঁর মুখে। কলকেয় গমগমে আঁচ।

মতিবিবি বললে,—দেখো না রহমান, বাইরে থেকে কে ডাকে।

সারেঙ্গী বাজিয়ের নাম রহমান। মতিবিবির কথা শুনে তার যেন চটক ভাঙ্গলো। সে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল শিউশরণের নেশা করার ধরণ। হয়তো আশায় আশায় ছিল শিউশরণ যদি কলকেটা একবার এগিয়ে দেয়।

রহমন দ্বার খুলে দেয়। আহ্বানকারী আর কেউ নয়, নায়েব কৃষ্ণচন্দ্র।

নায়েব দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে বললে,—ডাকলে সাড়া দেও না কেন শিউশরণ? তোমাদের জল খাবার আর চা আনা হয়েছে। বেয়ারার হাত থেকে ট্রেখানা নিয়ে নেও।

নিমেষের মধ্যে হাতের কলকেটা মেঝের উপুড় করে দেয় শিউশরণ।

উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। দরজার কাছে এগিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললে, —কে? হামাদের নায়েব মশায়? একশো বছর তোমার পরমায়ু হবে নায়েবমশায়। বাঁচিয়েছো তুমি হামাকে।

—তোমরা সবসমেত ক'জন আছো শিউশরণ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণচন্দ্র। বিকারহীন তাঁর মুখাকৃতি।

শিউশরণ ট্রে ধ'রলো দু'হাতে। বললে,—চারজন আছি।

—তবে ঠিকই আছে।

নায়েব বললেন আর ফিরলেন সঙ্গে সঙ্গে। এখানে আর একটি

মুহূর্ত নয়। তাঁর কাজ মিটে গেছে।. বড়বাবু চারজনেরমতই জল-খাবার দিতে হুকুম করেছেন, তিনি তাইই দিইয়েছেন।

মিষ্টি-নোনতা। বিরাট একটি ষ্টীলের ট্রে। তোয়ালে বিছানো তায়।

চার প্লেট মিষ্টি-নোনতা খাবার, চার পেয়ালা চা, চার ভাঁড় জল, ট্রের 'পরে সারি সারি দাঁড়িয়ে।

যে যার প্লেট টেনে নেয়। কতক্ষণ জল পড়েনি মুখে। যেমন ক্ষুধা তেমনি তৃষ্ণা। সাজঘরে নীরবতা, কেউ আর কথাটি বলে না।

অন্দরে তখন ফিসফাস গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে। এ ঘরে সে ঘরে কথা ছড়িয়েছে যে, সদরের নাচঘরে কলকাতা থেকে দু'জন বাঈজী এসেছে। দু'জন পরমাসুন্দরী মুসলমানী বাঈজী! নাচঘর নাকি লোকে লোকারণ্য, এত লোক জমায়েত হয়েছে সেখানে। চন্দনধামের বাবুরা আছেন, আর আছেন তেনাদের প্রত্যেকের ইয়ার-বন্ধু, পা-চাটা-মোসাহেব। যত গাইয়ে আর বাজিয়েও আছে।

—মাইফেল চলছে নাচঘরে?

বড়বাবু চন্দ্রমোহনের স্ত্রী, চিত্রলেখা খোঁজ নেন একে তাকে ডেকে। সঠিক কেউ কিছুই বলতে পারে না। চিত্রলেখা তাঁর খাসকামরার সামনের দালানে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রায় অন্ধকার দালান, ঘরের আলোয় যতটুকু আলো হয় সেখানে। তাও ঘরে যদি আগের ইলেকট্রিকের আলো থাকতো! এঘরেও লাইন ফিউজড্; লাইন আছে যেমনকার, তারের জোড়া জোড়া লাইন দেওয়াল আর কড়িকাঠের বুকে। কিন্তু অকেজো। বিগড়ে যাওয়া। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে।

মেঘ ডাকলো কি আকাশে!

গুরু গুরু ধ্বনি শুনলেন চিত্রলেখা। অনেক দূরের আকাশ থেকে ভেসে আসা শব্দ। যেন পাহাড় ধ্বসে যাচ্ছে কোথায়।

বিনা মেঘে বজ্রপাত না কি?

চিত্রলেখা দালানের জাফরির ফাঁক থেকে আকাশ দেখলেন। রাত্রির ঘন কালো আকাশে চোখ মেললেন।

মিশ্‌-কালো আকাশ। কিছু দেখা যায় না। একটি তারাও নয়। দালানের জাফরি ছেড়ে ঘরের জানলায় গেলেন চিত্রলেখা। উন্মুক্ত বাতায়নের বাইরে থেকে শন শন বাতাস আসছে। কালবৈশাখীর হাওয়ার মত, হাওয়ায় যেন ঝড়ের ইঙ্গিতে।

চিত্রলেখা ফিরলেন জানালা থেকে। আবার দালানে।

—বড়বৌদি!

—কে?

—আমি রাধা। তুমি কোথায়?

—এই যে আমি।

হ্যারিকেনের আলোয় একজন আরেকজনকে দেখতে পায়। চিত্রলেখা তাড়াতাড়ি রাধার হাতটি নিজের দুই মুঠোয় ধ'রে ফেললেন। বললেন,—রাধাঠাকুরঝি, আমার হাত দুটো কেমন হিম হয়ে গেছে দ্যাখ্।

—হ্যাঁ, তাইতো। ঘোর বিস্ময়ের সুরে চোখ বড় ক'রে বললে রাধা। বললে,—কেন রে বৌদি?

কালি-পড়া হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় ভাল ক'রে দেখলো রাধা। তার বড় বৌদির মুখখানা একবার দেখলো। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত। চিত্রলেখার চাউনিতে ভীতি-বিহ্বলতা। পলক পড়ছে না চোখে।

চিত্রলেখা রাধার চিবুক তুলে ধ'রে বলেন,—হ্যাঁরে কলকাতা থেকে না কী বাঈজী এসেছে?

রাধা ওপরে নীচে মাথা দোলায়। বলে,—হ্যাঁ এসেছে। তুমি কোত্থেকে জানলে ?

চোখ দুটি বন্ধ করেন চিত্রলেখা। আর যেন কিছু শুনতে চান না। যা কিছু জানবার তাঁর জানা হয়ে গেছে। অনুমান সত্যি হয়েছে।

—শুধু বাঈজী ? বোতল বোতল মদ আসেনি !

রাধা বলে ফেললো মুখ ফসকে।

চোখ খুললেন না চিত্রলেখা। তাঁর বিবর্ণ ঠোঁট দুটি যেন শুধু থর থর কাঁপতে থাকলো। অকারণে মাথার গুণ্ঠন টেনে দেন কপাল পর্য্যন্ত। লজ্জা না অপমানে মুখখানি হয়তো দেখাতে চান না !

—আমার বাচ্ছা ক'টা যে কোথায়, জানিস রাধা ?

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন চিত্রলেখা। কেমন যেন অসহায়ের মত। চিত্রলেখা মনে মনে জানেন, তাঁর স্বামীও আছেন সদরের নাচঘরে। বাঈজীর আসরে তিনিই হয়তো আজ প্রধান উদ্যোগী হয়েছেন।

রাধা বললে,—ইতু আর পতু দাসীদের কাছে ব'সে গল্প শুনছে দেখছি। বিমলকে দেখতে পাইনি।

কত যেন চিন্তিত হয়েছিলেন চিত্রলেখা, বাচ্ছাদের না দেখতে পেয়ে। তাদের কথা শুনেও তার মুখাকৃতি বদলায় না। বিবর্ণ ঠোঁটের থর থর কম্পন থামে না। চিত্রলেখা আর এ জগতে নেই এখন। ইষ্টমন্ত্র জপছেন এখন তিনি মনে মনে। ভয় আর বিপদের সময়ে অন্য কোন পথ খুঁজে মেলে না চিত্রলেখার।

—শুধু বাঈজী ? বোতল বোতল মদ আসেনি !

তাও এসেছে না কি ! রাধার সেই কথাগুলি মনে মনে নিজেকে শুধোলেন চিত্রলেখা। রাধার স্পষ্ট কথাগুলি কানে যে বাজে এখনও।

বড় বেসুরো সুরে বাজে যেন। ঘরের মুক্ত জানালার বাইরে চোখ মেলেন চিত্রলেখা। ঝড়ের হাওয়া বইছে বাইরে।

কত কত দিন পরে বলে আজ ওয়াইন চেম্বারের চাবি খোলা হয়েছে!

বারোজনের বারোয়ারী টাকায় আজ কত কাল পরে যে মুখ বদলাবে বাবুদের। দেশী খেয়ে খেয়ে মুখের স্বাদ মরে গিয়েছিল। হুইস্কি, জিন, ভারমুথের সঙ্গে ।

মা কালী মার্কা—তুলনাই হয় না। তাইতো এত উদ্যোগ, এত আয়োজন। কিসে আর কিসে! মা কালী কপালে থাকুন।

নূরজাহান বাঈ আর মতিয়াবিবিকে দেখে চন্দ্রমোহন সোজা নাচঘরে গেলেন না, গেলেন ওয়াইন-চেম্বারে। নাচঘরের কাছেই, নাচঘরের গায়েই।

—একটি বোতলও খোলা হয়নিতো?

ঘরে যাওয়া মাত্র জিজ্ঞেস করলেন চন্দ্রমোহন।

—না আপনি যখন অর্ডার করেননি, তখন খুলবে এমন সাধ্য কার আছে বড়বাবু?

—ছাটস্ রাইট!

চন্দ্রমোহন ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক তুলে বললেন। মুখে প্রসন্নতা ফুটলো। ক্যাবিনেটের ইদিক থেকে সিদিক পর্য্যন্ত বার কয়েক চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

রেড-লেবেল আর হোয়াইট লেবেল। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট। সীগ্রামস্ ভি, ও। বুতস ড্রাই জিন। গ্রেভা স্কচলিকুয়ের। কার্টিস জিন। মার্টিনির ড্রাই ভারমুথ। স্মিরনফ্ ভডকা। ভ্যাট সিক্সটি নাইন। রেমী মার্টিনের কুঁইয়া।

—এক আধ পেগ দিই বড়বাবু?

ঘরের রক্ষাকর্ত্তা সবিনয়ে বললে।

—দেবে? তা দেবেতো দাও! তা কি দেবে বল' দেখি রতনদা? চন্দ্রমোহন একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করে শুধোলেন।

কপাল কুঁচকে ভাবলেন রতনদা! দেখলেন বোতলের সারি। দেখতে দেখতে সহসা বললেন,—হাফ পেগ বুতস ড্রাই জিনে পেগ দেড়েক ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট। দিই একটা তৈরী করে? সামান্য লেমনের সঙ্গে সোডা ওয়াটার?

খুশীর সসি হাসলেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—দাও একটা।

রতনদা বললেন,—ভিৎটা আগে তৈরী হয়ে যাক্ বড়বাবু, তারপর যা খুশী চালিও'খন।

কথা বলতে বলতে বোতলের ছিপি খোলার যন্ত্রটি রতনদার হাতের মুঠোয় সজীব হয়ে উঠলো যেন। একটি নগণ্য যন্ত্র, তার কত ব্যবস্থা! ক্যাপ, কর্ক দুইই খোলা যাবে।

ওয়াইন চেম্বার ক্ষনিকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

কথা নেই কারও মুখে। রতনদা নিঃশব্দে কাজ করেন। কাচের বোতল গেলাশ, তবুও কোন ঠুং ঠাং নেই।

জল চলকানোর শব্দ কানে যেতেই চন্দ্রমোহনের মাতাল-মন আরও যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোতল থেকে গেলাশে জল ঢালার ঢুকু ঢুকু শব্দ।

বাবুদের ওয়াইন-চেম্বার বহুদিন কেউ খুলতো না। ক্যাবিনেটের আয়না ঝাপসা হয়ে গেছে।

দেওয়ালের ছবিগুলি চেনাই যায় না। ইংলণ্ডের হরেক দৃশ্যের রঙ্গীন চিত্র—অফ্‌সেটে ছাপানো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হাতে আঁকা আসল ছবি। বাকিংহাম প্যালেশ, ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবে, হাইড পার্ক, টেমস নদীর সেতুর কীটদষ্ট ছবি—মলিন কাচের আড়ালে লুকিয়ে আছে যেন।

আরও ছবি আছে ঘরে। ইংলণ্ডের গ্রামীণ দৃশ্য—মেষচারণের মাঠ, ফ্লাওয়ার মিল, রাখাল বালকের হাতে তারের বাদ্যযন্ত্র, নদীর তীরে যাত্রীগামী ফেরী বোটের জটলা, উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখীর ঝাঁক, চলন্ত জাহাজের আশপাশে।

—বড়বাবু। গেলাসটা ধ'রে নাও।

ডাক শুনে দেওয়াল-গাত্র থেকে চোখ ফেরালেন চন্দ্রমোহন। যেন এক জগত থেকে অন্য এক জগতে ফিরলেন। বললেন,—রতনদা, তুমিও ভিৎটা তৈরী করে নাও না কেন!

কথার শেষে হাতের পাত্র মুখে তুললেন। তৃপ্তির হাস্যরেখা দেখা দেয় তাঁর ঠোঁটের কোনে!

রতনদা বললেন,—তা তুমি যদি পারমিশন দাও।

দু'চার চুমুক পানীয়, কোথায় যে তলিয়ে যায়! চন্দ্রমোহন বুঝতেই পারেন না। কণ্ঠনালী শুধু জ্বলতে থাকে মৃদুমন্দ। বলেন,—রতনদা, বড় চমৎকার বানিয়েছো ভাই। এ তোমার হাতের গুণে তৈরী হয়েছে।

গর্ব্বের হাসি ফুটলো রতনদার চোখে-মুখে। তিনি তখন আর এক পাত্র তৈরী করছেন। নিজের জন্য।

রতনদা চন্দনধামের সকলেরই রতনদা। এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা ঐ নামেই তাঁকে ডাকে। তিনিও আপত্তি করেন না কোনদিন। চন্দন-ধামের সঙ্গে বহু দূরের আত্মীয়তার সম্পর্ক তাঁর, তবুও তিনি যেন কত নিকটতম হয়ে গেছেন ক্রমে ক্রমে। সকলেরই আপনার হয়ে গেছেন। সুরা দেবীর পরম ভক্ত রতনদা। দিল্‌খোলা মানুষ। সুখে দুঃখে মুখের হাসি মোছেনা। মনে কোন দাগ নেই, তাই সকলেই মনে করেন আপনজন। কেউ তাঁর কাছে পর নয়।

চন্দনপুরেই রতনদার বসবাস। জলকলের ফোরম্যান তিনি। আগুনে-

পোড়া অঙ্গারের মত লাল-কালো দেহের রঙ। বলিষ্ঠ, দীর্ঘ আকৃতি। কালো ফ্রেমের চশমা চোখে। বড় বড় চোখ দু'টি তাঁর দিবারাত্র সদাক্ষণ রক্তবর্ণ হয়ে আছে। মাথায় কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, বিন্যাসের সময়াভাবে।

চন্দনধামে আজ বাঈনাচ আছে শুনে, জলকল থেকে আর বাড়ী ফেরেননি। সোজা চলে এসেচেন। আর এসে পৌছানো মাত্র বড়বাবু চন্দ্রমোহন বেছে বেছে রতনদাকেই আজকের মত ওয়াইন চেম্বারের ইন-চার্জ্জ করে দিয়েছেন। সুরা দেবীর একনিষ্ঠ সেবক রতনদা, একটিবারও আপত্তি জানালেন না। সার্টের দুই হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেছেন।

চন্দ্রমোহন বললেন,—সিগারেটের টিনগুলো কোথায় আছে রতনদা? এ ঘরেই ছিল না? এই ঘরেইতো রাখতে বলেছি আমি। একটা টিন দাওতো।

—ওয়েট্ এ মিনিট্। বললেন রতনদা।

কথা বলতে বলতে হাতের গেলাশ নামিয়ে রাখলেন ক্যাবিনেটের তাকে। খুলে ফেললেন ক্যাবিনেটের একটি ছোট দেরাজের পাল্লা। সারি সারি সিগারেটের টিন সেখানে। প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি, গোল্ড ফ্লেক, ক্রাভেন্ 'এ', সোব্রেইন, থ্রি ক্যাশেল্‌স্ আর কমদামের মধ্যে সীজরস্ অর্থাৎ কাঁচির টিন।

চন্দ্রমোহন দেখে দেখে বললেন,—ক্রাভেন্ 'এ' এক টিন খুলে দাওতো রতনদা। অনেকদিন ও সিগারেট খাইনি।

হাওয়া বন্ধ টিন। এয়ার-টাইট।

হাতের চাপে ঢাকনি ঘোরাতেই ফস্ ক'রে হাওয়া বেরিয়ে যায় টিন থেকে। রতনদা বললেন,—নাও ধর, গেলাশটা আমাকে দাও।

গেলাসের অবশিষ্ট এক চুমুকে শেষ করে মুখ বিকৃত করলেন

চন্দ্রমোহন। সিগারেটের টিনটি হাতে পেয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কনসার্টে কখন সুর বদলানো হয় আবার।

'অতিথি এসেছে দ্বারে' গানটি বাজানো শেষ ক'রে ধরা হয়েছে অন্য একটি গানের সুর।

রবীন্দ্রনাথেরই গান : আমায় সুর শুনায়ে

যে ঘুমও ভাঙাও

সে ঘুম আমার রমণীয়।

জাগরণের সঙ্গিনী সে.

তারে তোমার পরশ দিও। * * *

চন্দনপুরের বাতাসে ভাসতে থাকে এই সুর!

বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান, না কেউ কাঁদছে ইনিয়ে বিনিয়ে! বৈশাখের এলোমেলো হাওয়ায় ঐ সুর যেন দাপাদাপি করে আকাশে আর বাতাসে। কখনও মনে হয় বুঝি চন্দনধামের সংলগ্ন সায়র-দীঘির অপর তীরের ঘন জঙ্গল থেকে যেন সুরের তরঙ্গ উঠছে আকাশে। না কি বাবুদের পরিত্যক্ত কুঞ্জবনে কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে মনের দুঃখে কাঁদছে! ফুল বাগানে আছে করবীর ঝাড়, সেখানে কেউ নেইতো!

চন্দনধামের বাবুদের ত্রিশ বিঘা বাস্তু।

সত্তর বিঘার জমি-জায়গায় ফুলবাগান, কুঞ্জবন, সায়র-দীঘি, ঝিল। এই বিরাট আঙিনার কে কোথায় কি যে করছে চট ক'রে বোঝা যায় না।

ঝিলের ধারে গৃহদেবতার ভগ্নপ্রায় মন্দির।

চন্দনঝিলের তীরে আছেন মুরলীধর। মন্দিরের পুরোহিত চমকে

চমকে ওঠেন, ঝিলের জলে যখন মাছ লাফ খায়। বাবুদের কারও পদশব্দ নয়তো! আবার যদি আসেন কেউ উন্মত্ত অবস্থায়!

সন্ধ্যা সমাগমের সময় পুরোহিত ছিলেন না মন্দিরে।

সেই ফাঁকে কে বা কারা এসে মূর্ত্তির চোখের রত্ন উপরে নিয়ে গেছে। সেই ভয়ে যেন অতিষ্ঠ হায় আছেন পুরোহিত। অমঙ্গলের আশঙ্কায় থেকে থেকে তাঁর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। কখন কি হয় কে বলতে পারে! কার 'পরে যে দেবতার কোপ পড়বে কেউ জানে না।

অন্তঃসারশূন্য চোখ মুরলীধরের। নেত্রগোলকহীন অন্ধের মতই ব্যর্থদৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছেন।

শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি মুরলীধরের বাম পাশে। হয়তো চুরি-ধরা-পড়ার ভয়ে চোরের দল রেহাই দিয়েছে রাধাকে। তাড়াতাড়িতে আর রাধার চোখে হাত পড়েনি। রাধার অঙ্গের অলঙ্কার খুলে নিয়েছে, ক'খানা ছিল। নিরাভরণা এখন তিনি। সজলচোখে কি দেখছেন রাধিকা! প্রদীপের স্বল্প আলোয় তাঁর দুই চোখে কি অশ্রুর চিকণ দেখা যায়!

তবে কি শ্রীরাধাই কেঁদেছেন এমন বিষণ্ণ সুরে!

পুরোহিত-দর্পণের পাতা হাওয়ায় ওড়াওড়ি করে। পুরোহিতের সমুখে প্রদীপ আর পুরোহিত-দর্পণ। পাঠে তিনি কোন মতে মন বসাতে পারেন না। চমকে চমকে ওঠেন। মঙ্গল আর অমঙ্গলের কত কথাই মনে জাগে তাঁর। ক্রোধ আর উত্তেজনায় পুরোহিতের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না হয়তো আর সাড়া দেয় না। তাঁর ব্যথার পূজা সমাপন হয় না।

পুরোহিত-দর্পণ উন্মুক্ত পড়ে আছে। এক অক্ষরও পড়তে পারেন না পুরোহিত। ক্রোধ আর উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠমণি চঞ্চল হয়ে ওঠে কখনও কখনও। তাঁর করোটির মধ্যস্থ মস্তিষ্কে যেন অসহ্য এক জ্বালা ধরেছে। ধমনীঘাত দ্রুত হয়ে উঠেছে। দেহের রক্তসংবহন থেমে গেছে।

বৈশাখী হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লেও শিউরে উঠছেন।

মন্দিরে যুগলমূর্ত্তির দিকে আর তাকাতে পারছেন না মনের দুঃখে। মুরলীধরের চোখের কোটর হাঁ ক'রে আছে। শ্রীরাধার অঙ্গে সেই কোন অলঙ্কার।

—কিং মে অপরাধম্!

মন্দিরের দুয়ারের কাছে পাহারা দিতে ব'সে ভগ্নমনে স্বগত করলেন পুরোহিত। বললেন, দেবভাষায় বললেন,—আমার কি অপরাধ?

কে সাড়া দেবে! কে দেবে উত্তর! মন্দিরের দেব-দেবী যে অপ্রসন্ন হয়েছেন! রাধিকার চোখে যে জলের ধারা নেমেছে! গৃহের বাসিন্দাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় নিজের কপালে করাঘাত করেন পুরোহিত।

করাঘাতের শব্দে চটপট পালিয়ে যায় তক্ষকের দল। মন্দিরের নৈবেদ্য থেকে কদলী লাভের আশায় এসেছিল। নিমিষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

মুরলীধর কি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন! চোখের মণি অপহরণের দুঃখ জানাতে আসছেন কি? প্রকৃত দোষীদের নামগুলি কি শুনাতে আসছেন পুরোহিতের কানে কানে।

না, বোশেখী হাওয়ায় মূর্ত্তি-কণ্ঠের বিশুষ্ক সাদা অপরাজিতার মালা দুলে ওঠে। মূর্ত্তি অচঞ্চল! মানুষের হাতে লাঞ্ছিত ও অবমানিত দেবতা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গেছেন। পরম বিস্ময়ের ঘোরে যেন অভিভূত হয়েছেন।

মাঝে মাঝে অর্কেষ্ট্রার সুরও কাণে যায় পুরোহিতের।

এমন গানের সুর শুনেও বিতৃষ্ণায় বিরক্ত হন। তাঁর কপালের বলিরেখা সুষ্টতর হয়।

—ঠাকুরমশাই!

মন্দিরের বাহির থেকে কার ডাক শুনে আরেকবার চমকে উঠলেন পুরোহিত। বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগলো যেন শরীরের কোথায়। সভয়ে সাড়া দিলেন,—কে ডাকে ?

চন্দনধামের বাবুদের কেউ নয় তো! কিম্বা বাবুদের ছেলেদের কেউ কি!

সকলেই সমান। কেউ কম আর কেউ বেশী নয়। পিতাপুত্র একই রক্তের একই ধারার।

—ঠাকুরমশাই, আমি মেজবাবুর চাকর। আমার নাম নিকুঞ্জ।

—কি বক্তব্য ?

—মেজবাবুর ছেলেটা জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। মন্দির থেকে ফুল আর চরণামৃত আনতে বললেন মেজমা। জ্বর খুব বেশী হয়েছে।

কথাগুলি শুনে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে থাকলেন পুরোহিত। কোন কথাটি বললেন না।

নিকুঞ্জ বললে,—দেরী করবেন না ঠাকুরমশাই। মেজমা বড্ড অস্থির হয়েছেন।

—পাত্র আনয়ন করেছো ? চরণামৃতের পাত্র ?

ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পুরোহিত। কথার শেষে আচমন করতে থাকলেন। এক, দুই, তিনবার আচমন সেরে যুগলমূর্ত্তির পায়ে দুই হাত ছোঁয়ালেন। পাদার্ঘ্য ফুল দেবেন খুঁজে খুঁজে।

—পেতলের এই ঘটিতে দিন ঠাকুরমশাই। পাত্র এনেছি বৈকি।

নিকুঞ্জ কথা বলতে বলতে মন্দিরের দুয়ার-প্রান্তে এগোয়।

হেই হেই করে ওঠেন পুরোহিত। বলেন,—তুমি কি মন্দিরে প্রবেশ করবে নাকি ? পাত্রটি ভূমিতে নামিয়ে রাখো।

—না ঠাকুরমশাই, না। আমরা জাতে নীচু বলে কি জ্ঞানগম্যিও হারিয়েছি? মন্দিরের ভিতরে আমি যাই নাই।

নিকুঞ্জ দুঃখমিশ্রিত সুরে কথা বলে!

পাদার্ঘ্য আর পাদধৌত জল একত্রে ঢেলে দিলেন পুরোহিত। ভূমিতে নামিয়ে-রাখা পিতলের পাত্রে।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় নিকুঞ্জ। সেই পাত্রসমেত যেন হাওয়া হয়ে যায় নিশান্ধকারে।

কনসার্টের সুর আরও যেন স্পষ্ট হয়।

—মেজবাবুর ছেলেটা ভুল বকছে!

নিকুঞ্জর বলে যাওয়া কথাগুলি যেন বারে বারে কানে বাজতে থাকে। কি জানি কেন, বিষাদমাখানো ক্ষীণ হাসি হাসলেন পুরোহিত। হতাশ হাসি। আরেকবার দেখলেন ঐ যুগলমূর্তিকে। যেন চোখে দেখা যায় না।

—মেজবাবু কোথায়? যাঁর সন্তান জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে, কোথায় তিনি এখন? পুরোহিত মনে মনে এই প্রশ্নটি করলেন নিজেকে। কোন সদুত্তর খুঁজে পেলেন না। এত বড় বিশাল গৃহের কে কোথায় কখন কি করছে কে বলতে পারে!

ত্রিশ বিঘার বাস্তু বাবুদের। চন্দনধামের আয়তন, পরিধি।

সাবেককালের একটি রূপ ছিল মূলগৃহের। শাখা উপশাখা হালের বর্ত্তমান জীর্ণ শীর্ণ, প্রায় পড়ো পড়ো। কতদিন যে ভারা বাঁধা হয়নি! চূনকাম হয়নি! খ'সে খ'সে পড়ছে পলেস্তারা। দিনের আলোয় দূর থেকে দেখায় যেন কুষ্ঠরোগের মত। চন্দনধাম যেন এখন ব্যাধিগ্রস্থ। দুরারোগ্য কি এক রোগে যেন ভুগে ভুগে কাহিল, ক্লান্ত।

রোগটাও সামান্য নয়। রাজরোগ। প্রচুর প্রচুর, অর্থের প্রয়োজন

এ মহাব্যাধি সারাতে। তাও এখন ওষুধ ধরবে কি না তার ঠিক নেই। মুমূর্ষু!

পুরোহিত জানেন না, মেজবাবু কোথায়। মেজমাও জানেন না, স্বামী তাঁর কোথায়।

গানের জলসায়? নাচের আসরে? কোন্ জাহান্নমে কে জানে!

তবুও মেজমা নিজের ঘরে অসুস্থ বিকারগ্রস্থ ছেলের শিয়রের কাছে ব'সে ছেলের মাথায় হিমশীতল আইসব্যাগ ধরেছিলেন। কপালে ইউ-ডি-কোলনের জল ছিটিয়ে দিতে দিতে মেজমা অরুণা দেবীও খোঁজ করছিলেন অসহায়ের মত। চাকরকে শুধোলেন,—কোথায় রে তোদের বাবু? দেখলি কোথায়?

চরণামৃতের পাত্র এগিয়ে ধরে নিকুঞ্জ। বলে,—কি জানি মাঠাকরুণ! দেখি নাইতো!

জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে ছেলে। অরুণা দেবী থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছেন। জ্বরটা বড্ড বেশী হয়েছে। চার ডিগ্রীরও ওপরে!

ছেলের মুখে মা চরণামৃত দেন। দিশাহারার মত হয়ে আছেন অরুণা দেবী। কেমন যেন অধিক কথা যেন মুখে আসে না তাঁর। বেশী কথা ব'লে কারও আর খোঁজ নিতে তাঁর মন আর চায়না। যে যেখানে ইচ্ছা থাক্!

তাঁর ছেলে যে এখন ভুল বকছে! হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে ছেলের। পা দু'টো হিম যেন বরফ। মিটারে উঠেছে চার ডিগ্রীরও ওপরে। দেহের উত্তাপ দেখে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন অরুণা।

দু'দিন সামান্য জ্বর হয়েছিল। সামান্য জ্বর ভেবেছিলেন অরুণা। কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকে কেন কে জানে, জ্বর চড় চড় করে হঠাৎ বেড়ে গেছে। মাথায় যেন বজ্রপাত হয়েছে অরুণার।

—ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাতে হবে যে নিকুঞ্জ !

উন্মাদিনীর মত যেন শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বললেন অরুণা। অত্যন্ত ব্যস্তকণ্ঠে। বললেন,—তোমাদের হুজুর কোথায় একবার দেখো নিকুঞ্জ ! আমিতো ছেলেকে ছেড়ে উঠতে পারবো না এখন। ছেলে যে যায় !

নিকুঞ্জ বললে,—মাঠাকরুণ তিনি হয়তো সদরে। ডাকতে গেলে যদি রাগারাগি করেন ?

—বল' যে আমি ডাকছি। ছেলের যে ভীষণ অসুখ ! রাগারাগি করবে কি ?

ধীরকণ্ঠে অরুণা দেবী কথা বলেন আর ছেলের মাথায় ইউ-ডি-কোলনের জল ছিটোতে থাকেন !

—তবে আমি যাই, ডাকতে যাই।

নিকুঞ্জ কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য এগোয়।

অরুণা বললেন,—ঐ দিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাওতো নিকুঞ্জ ! গান-বাজনা ভাল লাগছে না আমার।

যেদিকের জানলার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলেন, সেইদিকেই হয়তো সদর। সেদিকেই হয়তো সদরের নাচ-ঘর—যেখানে এইতো সবে মাত্র জলসা বসলো ! এই কিছুক্ষণ আগে। যেখান থেকে কনসার্টের সকল যন্ত্রের মধ্যে ক্লারিওনেটের কাঁপা কাঁপা করুণ সুর ভেসে আসছে এখানে।

ভেসে আসছে সদাক্ষণ নয়। দিকের হাওয়া যখন এদিকে ভেসে আসছে তখন।

তারওপর দেখেদেখে আজকের রাতটিতে এমন এক এলোমেলো বাতাস বইছে থেকে থেকে।

কাল বৈশাখীর হাওয়ার মত দিকভ্রান্ত হাওয়া। কোন্‌দিক থেকে যে কোন দিকে বইছে ধরা যায় না।

চন্দনধামের শীর্ষে মরচে-ধরা ওয়েদার ককের মাথার তীরটা অন্ধকারের বুক চিরে বন বন শব্দে ঘুরছে। স্থির হয়ে থাকছে না কোন দিকে।

হাওয়ায় যেন ঘূর্ণী। বাতাস যেন কেমন, হঠাৎ এসে জড়িয়ে ধরতে চায় তার সহস্রবাহু মেলে। বৈশাখ-রাত্রের বাতাস, তাই এখনও হয়তো ঈষৎ উষ্ণতা হাওয়ায়।

জানালা বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও কি মনের জ্বালা মিটেছে অরুণা দেবীর? বাঈ নাচ এখনও শুরু হয়নি তবুও যেন তিনি কানে শুনছেন ঘুঙুরের ঝুন ঝুন শব্দ।

বাঈজীরা বাক্যালাপে রত তখন।

—সরাপের ব্যবস্থা নেই শিউশরণ? দু'এক পেয়ালা দেবে না আমাদের? হেসে হেসে বললে মতিবিবি। কথা শুনে গাঁজা-খাওয়া লাল চোখ দুটো কেমন বড় হয়ে যায় শিউশরণের। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে,—না তোমাদের সরাপ খেয়ে কাজ নেই। নেশা হয়ে গেলে কে নাচবে?

মতিবিবি হাসি ধরলো সশব্দে। তার সর্ব্বাঙ্গে যেন হিল্লোল উঠলো হাসির তালে তালে। বললে,—তুমি একটা বেকুব শিউশরণ! তুমি কিছুই জানো না। নেশা এমন চট ক'রে হয় না আমাদের। মতিবিবি জল-খাবার খায় আর কথা বলে।

—জানি আমি সব মতিবিবি। তবুও যারা পয়সা দিয়েছে তাদের কাছে আগে হামাদের ইজ্জৎ রাখতে হবে। পেয়ালাকে আমি বিশ্বাস করি না, পেয়ালা বড় হারামী আছে মতিবিবি!

শিউশরণের কথায় আত্ম-প্রত্যয়ের সেজার সুর। অভিজ্ঞের মত কথা বলে যেন।

দেখে দেখে ঠেকে শিখেছে শিউশরণ। দেখে আর ঠেকে শিখেছে। পেয়ালাকে বিশ্বাস করলে কি হয় তা বেশ ভালই জানে সে।

পেয়ালা মান-মর্য্যাদা নষ্ট করে। পেয়ালা সর্ব্বনাশা। শিউশরণের কাছে পেয়ালার চেয়ে আরও বড় ইজ্জৎ—যা একবার নষ্ট হ'লে খরচা-হয়ে-যাওয়া টাকার মতই আর কখনও উদ্ধার করা যায় না। মদের নেশায় বিভোর হয়ে থাকলে কে নাচবে আসরে! কে গাইবে! আর মজলিসে পাকা সমজদার থাকলে কি বলবে তখন, যখন গান বেসুরো ঠেকবে কাণে! মাতাল কখনও গাইতে পারে, নাচতে পারে!

—তবে দুটো পানই খাওয়াও শিউশরণ। ব'সে ব'সে চিবুই।

চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বললে মতিবিবি। কটাক্ষপাত করলো কথার শেষে! কোমরের ঝুলন্ত রেশমী-রুমাল টেনে নিয়ে ঠোঁটের দুই প্রান্ত মুছলো। খেয়ে দেয়ে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সে।

শিউশরণ বললে,—পান তুমি যত পারো খাও। দুটো কেন দু'শো দিচ্ছি হামি।

সাজঘরের এক কোণে ছিল পাথরের একটি টেবিল। কাঠের পায়া, পাথরের গোলাকার চক্র। ধূলো পড়েছে। কেউ সাফ্ করে না তাই রঙ হারিয়েছে। শ্বেত-প্রস্তরের শুভ্রতা ঘুচে গেছে ধূলির আস্তরণে।

সেই টেবিলের 'পরে কলাপাতা একখানা। রাশি রাশি তবক-দেওয়া সাজা-পানের খিলি পাত্রাভাবে কলার পাতায় দেওয়া হয়েছে।

হাতের মুঠোয় যতগুলি ওঠে, ততগুলি তুললো শিউশরণ। এক মুঠো তুললো আর কি! তার সঙ্গে কাশীর জর্দ্দা আর সুর্ত্তি।

—রাত কত হবে শিউশরণ?

নূরজাহান চোখ মেললে। মুদিতচক্ষু।

শিউশরণের বাঁ হাতের কব্জিতে রিষ্ট-ওয়াচ। শক্ আর ওয়াটার প্রুভ্ ড্ ফেবার লিউবার ক্রোম-প্লেটেড স্যাণ্ডো। বেণ্টেক্সের রূপালী ব্যাণ্ড। ঘড়ি দেখলো শিউশরণ। গাঁজা-খাওয়া ঝাপসা দৃষ্টি তার চোখে। গেঁইয়াদের মত ঘড়িটা চোখের কাছে তুলে ধ'রে দেখলো। বললে,—সাড়ে আটভি হয় নি এখনও!

—বাইরে কি ঝড় বইছে?

নূরজাহান গুছিয়ে বসে। যেন এক ঘুমের পর জেগে উঠেছে। হারিয়ে-যাওয়া শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে শক্ত হয়ে বসে।

শিউশরণ বললে,—হাঁ, বড় জোর হাওয়া চ'লেছে। সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে।

—খানিক বৃষ্টি হয় তবেই যদি ধরণী শীতল হন।

কথাগুলি যেন নিজের মনেই বলে নূরজাহান। গরমে অধীর হয়ে যেন বলে। কি অসহ্য গরম বৈশাখের! ঘামে বোধহয় সিক্ত হয়েছে নূরজাহানের অন্তর্বাস। কাঁচুলী!

মতিবিবি পান চিবোতে চিবোতে বললে,—শিউশরণ, এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে এর আগে তুমি কখনও—

কথা শেষ হয় না মতিবিবির। প্রশ্নের মধ্যপথেই কথা ধরলো শিউশরণ। বললে,—বহুৎ, বহুৎবার মতিবিবি।

কথা বলতে বলতে শিউশরণ মনে মনে যেন নিজেকে কি সব প্রশ্ন করে। ক্ষণেক ভেবে বললে,—তোমাদের আগে আরও বহুৎ বাঈকে এনেছি এই চন্দনধামে! আকতারজানকে এনেছি, হীরাকে এনেছি, পিয়ারী বাঈকে এনেছি, মোটা ডালিমকে এনেছি, সোয়াগীসুন্দরীও এসেছে হামার সঙ্গে। আর আজ তোমাদের এনেছি।

নূরজাহান বললে, মৃদুমন্দ হেসে,—তবে তো শিউশরণ, তুমি এখানকার পুরাণো পাপী!

—তা তুমি বলতে পারো বিবিজান। বললে শিউশরণ। হাসতে গিয়ে হাসি চেপে চেপে বললে,—আজই না হয় এ বাড়ীর দেওয়ালে দেখছি ফাট ধরেছে, নয়তো এমন ছিল নাকি কোনদিন? চন্দনধামের বাবুরা বড় জমিদার ছিল বটে, তবে রাজা-বাদশাদের চেয়ে এদের সখ ছিল বেশী। দিল ছিল দরাজ। আর তেমনি ফূর্ত্তিবাজ ছিল বাবুরা।

ভুল বললে শিউশরণ। বেমালুম ভুল বললে।

চন্দনধামের দেওয়ালে ফাট ধরেছে আজ নয়, বহুদিন আগেই। আগে ভিৎ ট'লেছে, তারপর দেওয়াল ফেটেছে। ভেতরে ভেতরে অনেক আগেই ফাটল ধরেছে কেউ জানেনি, বোঝেনি কেউ। নীচের তলা আগে বিদ্রোহ করেছে, তারপর ভাঙ্গন ধরেছে ওপরতলায়। ভিত্তি না কাঁপলে কখনও চিড় খায় দেওয়ালে, দালানে!

মনে হয় দেওয়াল আর দালানের বুকে কে যেন মানচিত্র এঁকেছে, এত বেশী ফেটেছে! ভুগোলের মানচিত্র। নেহাৎ প্রকৃতি অজ্ঞ, অপটু, শিক্ষাদীক্ষাহীন। তাই প্রকৃতির খেয়ালে অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তি দেখা যায়। কোথাকার কোন দেশের যে মানচিত্র, বুঝবে তেমন সাধ্য কার!

—বাবুদের এই বাড়ীখানা খুব বিরাট, নয় শিউশরণ?

ইতিউতি তাকিয়ে শুধোয় মতিবিবি।

—হাঁ। বললে শিউশরণ। গাঁজায় লাল-হওয়া চোখ দুটিকে বড় করে বললে,—সাত মহলা বাড়ী আছে বাবুদের! আগে যখন আসি, তখন ঘুরে ঘুরে বিলকুল দেখেছি। শেষ আর হয় না যেন!

কোথায় যে শুরু, আর কোথায় যে শেষ!

ত্রিশ বিঘা জমির ওপর চন্দনধাম, যেন একটি ছোটখাটো শহর। আগে ছিল বৈভবে জমকালো। এখন যেন কি এক মহামরীতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। নয়তো যেন এক ভূমিকম্পের জোরালো কাঁপুনিতে নড়বড়ে হয়েছে। কিংবা হয়তো বয়স অধিক হওয়ায় সত্যিকার বার্দ্ধক্যে পৌঁছে গেছে!

মতিবিবি বললে,—এ বাড়ীর অন্দর তুমি দেখেছো শিউশরণ?

—দেখেছি বৈকি। কিছু আর দেখতে হামার বাকী নেই বিবিজান!

শিউশরণ হেসে হেসে কথা বলে। হাসে গর্ব্বের হাসি। নীরব হাসি। বলে,—এ বাড়ীর সদর দেখেছি, অন্দর দেখেছি, ঝিলের ধারের মন্দির দেখেছি, বাগান, পুকুর বিলকুল আমার দেখা আছে।

একটা বাজে কথা বললে শিউশরণ। নিছক বাজে।

চন্দনধামের সদর সে সত্যি সত্যিই দেখেছে। আগেও দেখেছে, এখনও দেখেছে—দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু অন্দরে সে কোনদিন যায়নি, দেখনি অন্দরের অন্তর। হয়তো দূর থেকে দেখেছে, অন্দরের বাইরেটাই দেখেছে। যদিও আগের সেই জম-জমাট অন্দর আর নেই, নেই তার সেই আগের দিনের সজোর স্পন্দন।

শুধু অন্দর নয়, সারা চন্দনধামটাই যেন আজ মুহ্যমান হয়ে আছে। মরণের পথের যাত্রীর মত হৃদয় তার যেন সদাক্ষণ ধুকপুক করেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে যেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে ধ্ব'সে পড়ে যাবে।

গর্ব্ব আর অহঙ্কারের যেন এক মূর্ত্ত প্রতীক, পতনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মিশে যাবে মাটির সঙ্গে! বড় বেশী উঁচুতে মাথা তুলেছিল যে! আর তাই যেন তার পতন হবে এক অশুভ লগ্নে! সে কি আসন্ন, সেই শেষ মুহূর্ত্ত, কে জানে!

যে চন্দনধামের ছাদে উঠলে অন্য কারও ইটের ইমারৎ চোখে পড়ে না

এবং যে জন্য বাবুদের বুক দেমাকে দশ হাত হয়ে উঠতো আজ তার ছাদে ফাট ধরেছে। বর্ষার দিনে ছাদের বুক ভেদ ক'রে বৃষ্টির জল পড়ে ঘরের মধ্যে।

নাচঘর থেকে তানপুরার ঝঙ্কার ভেসে আসে দরজা, জানালার ফাঁক থেকে। কখনও কখনও যেন স্পষ্ট শোনা যায়, কখনও একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায় তারের আওয়াজ। একেক সময়ে সাজঘরে নিরবিছিন্ন স্তব্ধতা প্রকাশ পায়—যখন কেউ কথা বলে না। শিউশরণ গাঁজার নেশায় হাই তোলে, যেন জলহস্তীর মত হাঁ করে। নূরজাহান বাঈ চুপচাপ বসে থাকে তো বসেই থাকে উই-ধরা কড়িকাঠে চোখে তুলে। মতিবিবি নীরবে নিজেকে দেখছে তো দেখছেই। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না, তার চোখের সমুখে বিপরীত দেওয়ালের ময়লা আয়নায় দেখে নিজেকে। দর্পণের প্রতিচ্ছায়া।

ঠোঁট দুটি কি লাল হয়েছে! সুর্মা আছে তো চোখের পাতায়, আঁখির কোণে! মুখখানা কি পথের ক্লান্তিতে ঘামে ভিজে গিয়ে কাহিল দেখায়! পাউডার কি ধুয়ে যায় মুখের! কপালের টিপ!

নেহাৎ ময়লা আয়না, ঘোলাটে আকশের মত, ঝলসে-যাওয়া রুটির মত—নয়তো এত কষ্ট করতে হ'ত না মতিবিবিকে। এত খুঁটিয়ে দেখার কষ্ট থাকতো না।

কত মূল্যের, বেলজিয়ান কাচ আয়নায়। শুধু অব্যবহারে ম্লান হয়ে গেছে। ধূলো প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঝাপসা হয়ে গেছে।

নূরজাহান ভঙ্গ করলো নীরবতা। এ গালের পান ও গালে টেনে বললে,—ক'জন বাবু আছেন শিউশরণ?

—চন্দনধামে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

কপাল কুঁচকে ওঠে শিউশরণের। রেখা দেখা যায় একাধিক। গভীর চিন্তার সরল আর বক্র রেখা। কত যেন ভাবতে হয় শিউশরণকে! ঘন লাল চোখ তার বন্ধ হয়ে যায় হয়তো মনোনিবেশের একাগ্রতায়। চন্দনধামের বাবুদের কুলপঞ্জিকা খুলে বসলো নাকি শিউশরণ, মনে মনে? বাবুদের বংশতালিকা?

একটি মাত্র নাম থেকে কত শত নামান্তর!

বংশের নামগোত্রসহ প্রথম পুরুষ থেকে আরও কত কত পুরুষের জন্মলাভ! একটি মানুষ থেকে আরও কত মানুষের সৃষ্টি হয়েছে—তা কি সত্যি সত্যিই জানে নাকি শিউশরণ?

না-জানার লজ্জায় হেরে যায় না শিউশরণ। বলে,—তা তোমার সব বাবুদের মিলিয়ে জনা পনেরো হবে বৈ কি।

—ক'জন বললে?

মতিবিবির কানে অঙ্কের একটি সংখ্যা পৌঁছেছে। ঠিক যে কোন্ সংখ্যাটি তা যেন বোঝা যায়নি। নিজেকে শুধরে নেয় যেন মতিবিবি, তাই শুধোয়।

—পনেরো জন হবে।

আবার বললে শিউশরণ। নিশ্চয়তার সুরে! কথার শেষে বন্ধ হওয়া চোখ মেললে। লাল চোখ। আগুনের ভাঁটার মত।

কড়িকাঠে চোখ রেখেই কথা বললে নূরজাহান। বললে,—বাবুদের সব বে থা হয়েছে?

একটার পর একটা বড় বেয়াড়া প্রশ্ন করে যায় নূরজাহান। এমন সব কথা জিজ্ঞেস করে যাদের উত্তর দেওয়া যায় না সহজে। নেহাত নিকটতম আত্মজন ছাড়া কে জানবে এত! তাও বাবুদের এখন দুর্দিন

চলেছে। দুঃসময় চলেছে। আগে পালে-পার্ব্বণে, বারো মাসের তেরো পার্ব্বণে ঘন ঘন ডাক পড়তো শিউশরণের। এখন ন'মাসে ছ'মাসেও একবারও ডাকে না চন্দনধাম।

শিউশরণ হেরে যাওয়ার লোক নয়। কখনও নাকি সে হারেনি। একান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে,—হাঁ হাঁ, সাধি সবার হয়েছে। সাধি হবে না কেন?

মতিবিবি আয়নায় চোখ রেখে বললে,—বাবুদের ধারাই আলাদা। বাবুদের কিছু না হোক সাধিটা ঠিক হয়ে যায় কাঁচা বয়েসে!

পাকা অভিজ্ঞের মত কথার সুর যেন মতিবিবির।

কথাগুলি শুনে প্রচুর হাসলো শিউশরণ! হাসলো এক বিশ্রী শব্দের হাসি। কেমন যেন মাতালের হাসির মত। হাসতে হাসতেই বললে,—ঠিক বাৎ বলেছো মতিবিবি, ঠিক বাৎ!

বাবুদের মধ্যে কেউ অবিবাহিত নেই শুনে কি বিষণ্ণ হয়ে যায় নূরজাহান! শিউশরণের এত হাসি সত্ত্বেও সে হাসে না। কড়িকাঠে চোখ তুলে বসে থাকে। পান চিবোয়। দাঁতে সুপুরী ভাঙ্গে।

তানপূরার ঝঙ্কার নয়, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আসে কোথা থেকে। বাইরে ঝড়ের হাওয়া বইছে হয়তো। কাল-বোশেখীর ক্ষেপা হাওয়া দরজা-জানলার ফাঁক-ফোকর থেকে ভেসে আসে সাজঘরে।

শিউশরণের হাসি থামতে চায় না যেন। থেকে থেকে হাসে সে। সেই কর্কশ শব্দের বিশ্রী হাসি।

বাবুদের কিছু না হোক সাধিটা ঠিক হয়ে যায় কাঁচা বয়সে! কথাটি বড় ভাল বলেছে মতিবিবি। কথাটি কাণে বেজেছে শিউশরণের। যেন একটি প্রবাদ শুনিয়েছে মতিবিবি। এক অকাট্য সত্য।

সাত পাকের বেষ্টনে বেঁধেও যে বাবুদের ধরে রাখা যায়নি।

অতুলনীয় রূপের অধিকারিনী হয়েও বধূদের রূপের কোন মূল্য থাকেনি। ফিরেও দেখেননি স্বামীদেবতার দল। ঘরের লক্ষ্মীদের অবহেলায় ফেলে বাবুরা রাত কাটাতেন রূপোপজীবিনীদের ঘরে। আসল ভালবাসা হেলায় তুচ্ছ করে নকল প্রেমের মদিরায় দিশাহারা হয়ে থাকতেন। আজ না হয় বাবুদের পকেটের আর তেমন জোর নেই; জমিদারীর আয়ও নেই বললেই হয়। তাইতো একা একা আনন্দভোগের উপায় না থাকায় যৌথ স্ফূর্ত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। চাঁদা তুলে টাকা জমানো হয়েছে। সেই টাকাতেই আজ রাতটুকুর মত যৎকিঞ্চিৎ আমোদ-প্রমোদ হবে।

নূরজাহান আর মতিবিবি নারী, তবু তারা কি জানে অন্দরের ঘরে ঘরে আজ কি অশান্তির ঝড় বইছে! যদিও বাঈজী দু'জন সম্পূর্ণ নির্দোষ। স্বেচ্ছায় তারা তো চন্দনধামের ছায়া মাড়াতে আসেনি! ডাক পড়েছে, মুজরো নেওয়ার ডাক পড়েছে বাবুদের পক্ষ থেকে। তবেই তারা এসেছে।

সদরের নাচঘর থেকে গান-বাজনার মিঠে সুর বাতাসের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে যেন অন্দরের ঘরে ঘরে উঁকি দিতে চায়। কত মিষ্টি সুরের রাগ রাগিনী, কত সূক্ষ্ম কাজের, কত মোহ আর কত আকর্ষণের—তবুও কি জ্বালা আর হলাহলে পরিপূর্ণ ঐ সুরতরঙ্গ!

চন্দনধামের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে অনেকে আজ কাণে আঙ্গুল দেন। এই রাগ-রাগিনীও বিষ ছড়ায় কারও কারও কাণে, কখনও কখনও।

অন্দর প্রায় অন্ধকার।

একেই ডায়নামোয় আলো, তায় ব্যবহারে কার্পণ্য। নেহাৎ যে-ঘরে

আলো না জ্বালালে চলে না, সেই সব ঘরে টিম টিমে পঁচিশ কিলোওয়াটের আলো জ্বলে। দালান-উঠানে নিরবিচ্ছিন্ন আঁধার—আলোর চিহ্ন নেই। সিঁড়িগুলিও তথৈবচ। একদিন রঙীন বেলোয়ারী কাচের দেওয়াল-গিরি আর লণ্ঠনে রাতের বেলায় আলোয় আলো হয়ে থাকতো চন্দনধামের ঘর-দালান-সিঁড়ি-উঠান। আলোর সে কি অবিমৃষ্য অপব্যবহার! এমন কি দিনমানেও আলো জ্বলতো কোথাও কোথাও—যেখানে দিনের অঢেল সূর্য্যালোকও প্রবেশের পথ খুঁজে পেতো না।

বেলোয়ারী কাচের রঙীন আলো বাতিল হয়ে যায়। নিভে যায় যেন চিরকালের মত। বিজ্ঞান-বিদ্যুতের কাছে যে বিষম পরাজয় হয় তৈলদীপের।

বিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় পৃথিবীর ঘরে ঘরে আজ বিদ্যুতের প্রবাহ বহে যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর আবিষ্কারের মহিমা-কীর্ত্তন করে কত আঁধার ঘরের মানুষ! অন্ধ পৃথিবী বিজলী আলোয় হারানো পথ খুঁজে পায়। দুর্দ্দান্ত গতির বিজ্ঞান-বিজলী আর রাখবে না কোন তামসচিহ্ন! প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য আইন বুঝি রক্ষা হয় না—পৃথিবীর অন্ধকার সলজ্জায় মুখ লুকায় গুহা-গহ্বরে।

বাইরে কত আলো! সদরে নাচঘর আলো ঝলমল।

আকাশের পূর্ণিমার চাঁদকে যেন ধরে এনে ঘরে পুরেছে। সদরের ঘরে ঘরে আজকের রাতটুকুর মত একশো জোরের বল জ্বলছে। আর অন্দর হাঁ হাঁ করছে। যেন দানবী হাঁ করে আছে।

অনঙ্গমোহন ঘর থেকে দালানে বেরিয়েছেন।

ঠায় এক ভাবে কাঁহাতক আর বসে থাকা যায়! একা একা!

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অনুপমার রঙীন আলোকচিত্র। আবক্ষ

ছবি। জলজ্যান্ত যেন! শুধু মুখে কথা নেই, নয়তো যেন জীবন্ত। শূন্য ঘর আরও যেন শূন্য মনে হয়, অনঙ্গমোহন যখন ঐ ছবিখানি দেখেন নিজেকে আরও অনেক বেশী একা মনে হয়। তখন নিজের নিশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দেও কখনও বা চমকে ওঠেন। অনুপমা সতীলক্ষ্মী, তবুও ঘরে ব'সে থাকতে যেন ভয় ভয় করে!

তবে কি অনুপমার হৃদয়ধ্বনি শোনা যায়!

অনুর শ্বাস ফেলার শব্দ! দেওয়ালের ছবিটিকে অনঙ্গমোহন দেখেন যেন এক মুক্ত বাতায়ন, যার অপর পারে ব্যাথায় ব্যাকুল সজলচোখ অনুপমা দাঁড়িয়ে আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে পৌঁছে অন্দরের কোথাও আলোর লেশ দেখতে পেলেন না অনঙ্গমোহন। মুখে তাঁর আসল বর্ম্মা চুরুট। কখনও জ্বলছে, কখন স্তিমিত হয়ে যায়।

ঘোর আঁধারে চুরুটের আলোয় আর কতটুকু দেখা যায়, নিজের হাত দুখানি ছাড়া! জোনাকি কতই বা আলো ছড়ায়!

কোথাও কেউ নেই না কি! এদিক সিদিক চোখ মেললেন অনঙ্গমোহন! যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকই কালোয় কালো। অবিমিশ্র অন্ধকার। বার্দ্ধক্যে পা দিয়েছেন অনঙ্গমোহন, তাঁর দৃষ্টিহীনতা নয়তো? চোখের ভুল নয়?

ভুল দেখেননি তিনি। অন্দরের ঘরে ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে গেছে!

ঘরের বন্দী আলো বাইরে তাই ঠিকরোয় না। ভয়ে আর ত্রাসে যেন ঘরের মধ্যে লুকিয়েছেন যত অন্তঃপুরবাসিনী।

সদরে আজ নাচ গান আর বাজনা চলবে। মাইফেল চলবে। মদের ফোয়ারা খুলে দেওয়া হবে। যে পারবে ডুব দেবে মদের প্রস্রবণে।

যার বয়স বেশী হয় তার প্রতি বুঝি কারও আর চোখ থাকে না। সে এক রকম পরিত্যক্ত। মনে মনে ভাবলেন অনঙ্গমোহন। ভাবতে ভাবতে হাসলেন নিজ মনে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসলেন ব্যর্থ হাসি। একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—নো ওয়ান বদারস্ ফর ওল্ড ম্যান লাইক মী!

বার্দ্ধক্য কি তবে মানুষের অভিশাপ!

যে-বৃদ্ধ তার প্রতি না কি কারও দয়া-মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম আর ভালবাসা থাকে না। বৃদ্ধ কেন বেঁচে থাকবে! বৃদ্ধের মরণই আনন্দের, বেঁচে থাকা দুঃখের। কষ্টকর। নিজের এবং অন্যের পক্ষেও। কত কথা ভাবতে ভাবতে দালান ধ'রে এগোতে থাকেন। নিজের মনে বলেন,—এ্যান্ ওল্ড্ ম্যান ইজ্ এ বেড্ ফুল অব্ বোন্স্!

একটি ইংরাজী প্রবাদ বললেন অনঙ্গমোহন। শুধু মাত্র নিজেকে শোনাতেই যেন বললেন, বহু পুরাণো এই প্রবাদ।

আকাশে কত তারা!

অন্দরের দালানের জাফরি-জানলার কয়েকটি পাল্লা উড়ে গেছে কবেকার এক ঝড়-বাতাসে! ঝাপসা চোখে আকাশ দেখেন অনঙ্গমোহন। কালো আকাশ দেখা যায় না চোখে। শুধু দেখা যায় অজস্র আগুনের ফুলকি। দপ দপ জ্বলছে কত দূরের আকাশে।

সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়া চলেছে। কাল-বৈশাখী শুরু হ'ল নাকি—চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনঙ্গমোহন। আকাশে দৃষ্টি চালিয়ে খুঁজলেন কি যেন! দেখলেন আকাশের কোন' কিনারায় মেঘ জমছে কি না। কিংবা মেঘের শ্লথগতি তরঙ্গ ভেসে আসছে কি, এত যখন হাওয়া চলছে দুর্নিবার!

বৈশাখের এই বৃষ্টিহীন দুর্য্যোগের মত অনঙ্গমোহনের মনেও যেন

তুফান বইছে থেকে থেকে! বর্ষণের বালাই নেই, শুধু বাতাসের দাপাদাপি চলছে। মনের তুফানও থামে না যেন কত রকমের দুশ্চিন্তায়।

বংশের বয়োঃজ্যেষ্ঠ যিনি, তাঁর চোখের সমুখে চলবে এই সারারাত্রি-ব্যাপী বেলেল্লাপনা! কেমন এক অপমানের জ্বালা অনুভব করেন অনঙ্গমোহন। গাত্রদাহ হয় তাঁর। তবুও চোখ দুটি না হয় বন্ধ করে সকল কিছু সহ্য করবেন তিনি, কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র মণিমোহন, কোথায় গেল! সেও কি ভিড়লো নাকি ঐ নাচগানের আখড়ায়! নাচঘরের জলসায়।

বলা কি যায় কিছু! যৌবনের জোয়ারে ভেসে যেতে কতক্ষণ! একেই ছেলে তাঁর বিয়ের স্বাদ পায়নি। নর্ত্তকীর পদঝঙ্কার শুনে আর চোখের ইশারা পেয়ে ছেলে যদি তাঁর সাড়া দিয়ে বসে। তখন?

অনঙ্গমোহন এ যুগের কিছুই জানেন না। কিছুই বোঝেন না!

কোন্ দিকের হাওয়া যে কোন্ দিকে বয় কিছুই টের পান না তিনি! অন্দরের চার দেওয়ালের এক ঘরের মধ্যে ঠিক বন্দীর মত থেকে থেকে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সকল যোগাযোগই ছিন্ন হয়ে গেছে যে! বাস্তব-পরিচয় নেই এ যুগের কোন কিছুর সঙ্গে। খবরের কাগজ আর রেডিও মারফৎ আর কতটুকু জানা যায়! সারা দুনিয়াটাই না কি অসম্ভব বদলে গেছে ইদানীং। যেমনটি ছিল তেমন আর নেই। সেই আদিম দিনের গোলাকার পৃথিবীর অন্যরূপ এখন। মানুষ আর আগের মত নেই; সমাজের নাকি আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে চূড়ান্ত মডার্ণ ইজমের যুগে। সুতরাং মণিমোহনের মনের গতি যদি ভিন্ন

পথ ধরে, কি করতে পারেন অনঙ্গমোহন! কিছুই করতে পারেন না। পিতৃত্বের কঠোর শাসন না মানার অবাধ্যতা না কি পেয়ে বসেছে মানুষকে। আইন আর শৃঙ্খলার কোন মূল্য নেই। কোন আইন নেই।

কোথায় গেল মণিমোহন?

হাতে ক'টা টাকা পেয়েই যে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, অনুমানে কিছুই বুঝতে পারেন না অনঙ্গমোহন। ছেলে যদি তাঁর নাচের জলসায় গিয়ে বসতো দুশ্চিন্তার কারণ আছে বৈকি।

পাল্লাহীন জাফরি-জানলা দালানের। চলতে চলতে সেই জানালার সুমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনঙ্গমোহন। বেশ ভাল লাগে যেন আজকের রাতের এই উড়ো বাতাস। সারা গায়ে যেন পরশ বুলিয়ে যায়। চোখে-মুখে হাওয়া লাগে।

বাইরে এলোমেলো হাওয়া চলেছে।

মরে-যাওয়া পৃথিবী হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো কতদিন পরে। বোশেখ মাসের সূর্য্যতাপে নির্জীব হয়েছিল যেন কতকাল। গাছের পাতাটির পর্য্যন্ত নড়ন ছিল না।

বৃষ্টি কি আসবে!

বাতাসের স্পর্শসুখ অনুভব করতে করতে ভাবছিলেন অনঙ্গমোহন। যদি বৃষ্টি আসে! মুষলধারা চাই না, ঝির ঝির বর্ষণ হ'লেই চলবে। দিগ্‌দিগন্ত ঠাণ্ডা হবে। মানুষ বাঁচবে। এক পশলা বৃষ্টি, খানিকক্ষণের তরে—তাতেই নাকি ভিজে স্যাঁতস্যেতে হয়ে যায় বাঙলার মাটি। তার মাঠ-ঘাট এক হয়ে যায় অতি বর্ষণে। আরও অধিকতায় বন্যা বয়ে যায়।

যেখানেই যাক ছেলে, ভালয় ভালয় এখন ফিরে এলে হয়।

সুস্থ অবস্থায়। তার মানে সদরের নাচঘরে যে শোনা গেল বোতল বোতল হুইস্কি-ওয়াইন্ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অনঙ্গমোহনের বাতাস ভাল-লাগা কোথায় যেন মিলিয়ে যায় ভাবতে ভাবতে। তবুও তিনি জানালা ত্যাগ করেন না। ঘন ঘন টান দিয়ে উড়ন্ত বাতাসে চুরুট-গন্ধ ছড়িয়ে দেন।

মণিমোহন তেমন ছেলে নয় যে নিজের বাসভুমিতে ব'সে ব'সে কোন' রকম অন্যায় করবে। কুকার্য্য করবে। নিন্দা রটবে না? দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়বে না? আর যারা একেবারেই নিজেই, তারা কি সত্যিই চুপ ক'রে থাকবে! যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী রঙিয়ে রঙিয়ে বলবে না তারা!

চরিত্রহীনতার প্রশ্রয় দিতে হ'লে তোমার নিজের পাড়ার বাইরে চলে যাও—যেখানে কেউ দেখবার নেই তোমাকে—সেখানে তুমি শুধু একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ না হ'লেও তোমার সমাজের তুমি সেখানে একেবারেই একা। চেনা-মুখের জানা-মানুষ দেখতেই পাবে না। তুমি যত পার অধর্ম্ম কর, কেউ দেখতে যাবে না।

এটা মণিমোহনের ফিলজফি। জীবন দর্শন। কথাগুলি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

চন্দনপুরের এক আঁধার-পথে মণিমোহন তখন হন হন করে চলেছিল। শুরকীর রাস্তা, কাঁকর ছড়ানো, এবড়ো খেবড়ো, মণিমোহনের পায়ের চামড়ার জুতোর ঘা খেয়ে রাস্তাটি যেন কথা বলতে থাকে। যা তা জুতো নয়, চীনে পাড়ার চামড়ার পাম্পসু। যেমন মজবুত তেমনি টেঁকসই। মণিমোহনের জুতোর আশপাশে তালি পড়েছে, কিন্তু শোল্ আছে একেবারে অটুট, অক্ষয়।

অনেক দূরে দূরে, বাঁক পেরিয়ে, মোড় ঘুরে তারপর যদিও বা

একেকটি একলা-সঙ্গী-আলো, দাঁড়িয়ে আছে একা একা। কেরোসিনের টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছে, কাচের মাথা-মোটা বাক্সের মধ্যিখানে। লণ্ঠনের চিমনী অপরিষ্কার, কালি পড়েছে। হাওয়ার এত বেগ, শিখা কিন্তু নিষ্কম্প।

পথ চলতে চলতে নিজের জুতোর শব্দে নিজেই একেকবার চমকায় মণিমোহন। পথ চেনা, বহুদিনের পরিচয়, তবুও চমকে চমকে ওঠে কাঁচা রাস্তা, দু'পাশে আগাছার জঙ্গল। খেজুর গাছের সারি। মানকচুর বন। পালতে-মাদারের ঝোপ। তেঁতুল আর সজনের খাড়াই।

বনমানুষ আর বাঘ-ভালুকেরে ডরায় না মণিমোহন।

দস্যু-ডকাতকেও নয়। ভয় করে সাপ-খোপকে। সরীসৃপের ভয় শুধু চন্দনপুরে, রাতের অন্ধকারে। সেই শৈশব থেকে কত কত যে দেখেছে মণিমোহন, তার সীমা সংখ্যা নেই। জলে জল-সাপ দেখলে ভয় করে না, সে-সাপের বিষ থাকে না। কিন্তু ডাঙ্গায় যারা তারা যে ভয়াল ভয়ঙ্কর! এই চন্দনপুরে এখনও এমন এমন কেউটে আর গোখরো আছে, যাদের একটিমাত্র দংশনের জ্বালায় ইহলীলা ত্যাগ করতে হয় মানুষকে।

উঁচু গাছের শাখার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে শাখা জড়িয়ে ঘোরাফেরা করে ওরা। এ-গাছ থেকে সে-গাছে চ'লে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়।

উঁচুতে থাকে থাকে তাই দংশায় দেহের অন্য কোথাও নয়, মানুষের কপালে। একটি মাত্র মোক্ষম ছোবলে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নাকি বিষিয়ে যায়—যাতে নাকি আর বাঁচবার উপায় থাকে না। চেতনা হারিয়ে যায় দংশনের সঙ্গে সঙ্গে!

ঐ কেউটে-গোখরোর কেউ কেউ কোন কোন রাতের অন্ধকারে, কি

খেয়ালে গাছের উঁচু শাখা থেকে মাটির বুকে নামতে চায়। গাছের শাখা থেকে নেমে তাও যদিবা স্থির থাকতো! তা নয়, মানুষ-চলা কাঁচা রাস্তাটি পারাপার করে। পথের এক দিকের জঙ্গল ভাল না লাগলে অপর দিকে আছে।

তাই ভয়ে যেন চমকে চমকে ওঠে মণিমোহন। নিজের পদক্ষেপের শব্দেও অসম্ভব চমকায়। মনসার বাহন কি পথ অতিক্রম করছেন! হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিতে ভুলে থাকে কতক্ষণ।

এই বিশ্রী পথটুকু পেরোলেই কুমোরপাড়া!

তারপর আরেকটু নিরালা রাস্তা—সোজা চলে গেছে নাক বরাবর, তারপর পড়বে ক্যাথলিক চার্চ। অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে চন্দনপুরের খ্রীষ্টের উপাসকদের স্বর্গতুল্য ছুঁচালো মিনারের গির্জাটি!

গির্জার সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে দরিদ্র মুসলমানপাড়া। সেখানে পৌঁছে চোখ বন্ধ করে ব'লে দেওয়া যায় কোথায় এলাম। মুসলমানপাড়ার হাওয়ায় নাকি পেঁয়াজ-রসুনের কেমন একটি উগ্র গন্ধ ভাসে সদাক্ষণ। ডিম আর রান্না-মাংসের কেমন যেন আমীরী আমেজ পাওয়া যায়।

মুসলমানপাড়ার শেষাশেষি না যেতে পারলে কিন্তু পথ-চলা থামবে না মণিমোহনের। বৈতরণী না পেরিয়ে যেমন স্বর্গে নাকি যাওয়া যায় না।

ঐতো কুমোরপাড়া! গায়ে-গায়ে জটলা পাকিয়ে কুমোরদের চালাঘরগুলি কোন রকমে যেন সোজা হয়ে আছে। দু' একটি ঘরের আলো দেখা যায় দূর থেকে। মনে যেন বল পায় মণিমোহন। জোরে জোরে পা চালায় সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে।

অলকা না জানি কতক্ষণ ধ'রে প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। দুয়োর খুলে পথের পানে তাকি'য়

চলার গতি যেন উত্তরোত্তর বেড়ে যায় ক্রমেই। হাতের শেষ-খাওয়া সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পথিপার্শ্বে। মানুষের কণ্ঠ শোনা যায় কুমোরপাড়ায় পড়তেই। মানুষের টুকরো টুকরো ছেঁড়া ছেঁড়া কথা শোনা যায়। শিশুর কান্না কানে আসে। হঠাৎ হঠাৎ চোখে প'ড়ে যায় কুমোরদের জ্বলন্ত চুল্লী। ভাতের হাঁড়ি চাপানো। গমগমে আঁচ উনুনে। অন্ধকারে আর কিছু নজরে পড়ে না, শুধু লাল আগুন।

উনুন যেন দানবের মত হাঁ করে আছে। আগুন খাচ্ছে যেন, আর কিছু না পেয়ে। মানুষের বসতি দেখতে পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললো মণিমোহন। সর্পাঘাতের ভয় পদে পদে—সেই জনবিরল বনজঙ্গলময় পথ শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে পর্য্যন্ত চমকে উঠেছে সে। মনে হয়েছে, সাপের ফোঁসফোঁসানি!

আকাশের চাঁদের মত, অলকার ঢলোঢলো মুখখানি, বার বার চোখে ভেসে ওঠে মণিমোহনের। অধীর প্রতীক্ষায় মুখটি ঈষৎ বিষণ্ণ। চোখে ফ্যাল ফ্যাল চাউনি। কাজলপরা টানা টানা চোখ।

ক্যাথালিক চার্চ্চটি যেন একটি ছোটখাটো পর্ব্বত।

বিশাল প্রাঙ্গণের বুক জুড়ে আছে। লোহার বিচিত্র রেলিঙ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে! রেলিঙের ধারে যূঁই আর গন্ধরাজের সারি! সুগন্ধে বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে। হঠাৎ এক ঝলক যূঁইয়ের গন্ধ নাকে আসতেই মণিমোহন জানলো গির্জ্জাবাড়ীর পাশের পথ দিয়ে সে চলেছে। একবার চোখ ফেরায় গির্জ্জার এক খোলা-দরজায়।

কিছু দেখা যায় না স্পষ্ট। শুধু দেখতে পায় কালো পালিশের একটি পিয়ানো। দু'টো কাণ্ডেলব্রা পিয়ানোর ওপরে। দু'পাশে দু'টো বাতি

পুড়ছে দপ দপ। এখনও খোলা আছে দরজা, খানিক বাদেই বন্ধ হয়ে যাবে।

গির্জ্জার চূড়োয় আছে একটি ঘড়ি। রাতের আঁধারে দেখা যায় না। তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ির ঘণ্টা বাজে। সাবধানী নিশানার মত শোনায় যেন। সময়ের তরী বয়ে চলেছে, ঘোষণা করে যেন প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায়! কতদূরে ছড়িয়ে পড়ে সেই ঘণ্টাধ্বনি। সারা চন্দনপুরকে শোনায় যেন;

কে ঐ মানুষটি! অমন টলতে টলতে আসছে!

কেন কি জানি, অন্ধকারে মুখ লুকোয় মণিমোহন। মুসলমানপাড়ার আলোয় কাকে যেন দেখতে পায় দূর থেকে। চেনা-পরিচিত কেউ নয়তো? কোন আত্মজন? কোন প্রতিবেশী? বলা যায় না, কখন কোথায় কার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

মানুষটি পাশ দিয়ে চলে যেতে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখলো মণিমোহন।

নিশ্চিন্তার শ্বাস ফেললো একটি। আপনজন কেউ নয়। থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীর বুড়ো গাড়োয়ান শামসুদ্দীনটা সারা দিনের রোজগারে যত পেয়েছে মদ খেয়ে ফিরছে হয়তো। বাসায় ফিরছে টলটলায়মান অবস্থায়।

দেশী মদের উগ্রতম বিশ্রী গন্ধ যাবে কোথায়! মণিমোহন বোঝে যে গাড়োয়ান শামসুদ্দীন এখন আর গাড়োয়ান নেই, বাদশাহী কেতা তার এখন। চিতানো বুক। সদম্ভ পদক্ষেপ। সমুদ্রের ফেঁপে-ওঠা তরঙ্গের মত যেন টলছে। কথা বলতে গেলে হয়তো এখনই মেরে বসবে।

তবুও শামসুদ্দীনকে দেখে মনে মনে খুশী হয় মণিমোহন।

মদ খাক, সারা দিনের রোজগারের টাকা ওড়াক, তাতে কার কি! কোন আত্মীয়-স্বজন কিংবা হিতাকাঙ্খী প্রতিবেশীতো নয়, তাতেই খুশী হয় মণিমোহন। তাড়াতাড়ি পা চালায় পকেটে হাত চালাতে চালাতে। আবার সিগারেট ধরাবার দরকার হয়। পথ-চলার ক্লান্তি লাগে এতক্ষণে।

মুসলমানপাড়ায় তবু আলো আছে। দীন-দরিদ্র, রোজ আনে রোজ খায়। কতই বা উপার্জ্জন গাড়োয়ান, ডিমওলা, নৌকার মাঝি-মাল্লাদের। তবুও ঘরে ঘরে উজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো। এই রাস্তারই যেখানে পান-বিঁড়ির দোকান, সরাইখানা আর গরুর মাংসের কসাইখানা আছে, সেখানে জ্বলছে একটি ঝুলানো পেট্রোম্যাক্স।

পান-বিঁড়ির দোকানের সামনে মানুষের জটলা।

পথের ধারে চাটাই বিছিয়ে ছক্কা-পাঞ্জা খেলা চলেছে আর কলকাতার চোরা-বাজার থেকে অত্যন্ত সস্তাদরে-কেনা সস্তার ফনোগ্রাফে লক্ষ্ণৌ না লাহোর ঘরাণার কে এক গায়িকার ঠুংরী গান বেজে চলেছে।

অভাব আছে চন্দনপুরের এ তল্লাটের মানুষদের। অনটন আছে।

তবে আনন্দের অভাব নেই মুসলমানপাড়ায়। কলকাতার চোরাবাজার থেকে কেনা ফনোগ্রাফের গানের জলসা, তাসের আড্ডা আর ঠিক সূর্য্যালোকের মত ঐ পেট্রোম্যাক্সের আলোর প্রাত্যহিক বন্দোবস্ত আছে!

আরও আছে। পান-বিড়ির দোকানে রঙীন ছবি। বম্বের চিত্র তারকাদের মুখে চটুল হাসি আর চোখে ইশারাভরা রঙীন ছবি। জরির অলন্‌করণ ঐ মায়াময়ীদের বেশভূষায়। আকর্ষণ করে যেন ঠিক! চোখ না ফেরালেও, জোর ক'রে টেনে নেয় মানুষের দৃষ্টি।

গানের জলসায় লক্ষ্ণৌ না লাহোর ঘরাণার গীতসম্ভার। যতক্ষণ না রাত্রি নিশুতি হয় ততক্ষণ এক নাগাড়ে চলবে ফনোগ্রাফের গান। পান-বিড়ির দোকানও ততক্ষণ হয়তো খোলা থাকবে। সকলের চোখে হয়তো ঘুম নামবে, শুধু ঐ চিত্রতারকাদের চোখের পল্লব পড়বে না। তাদের মুখের সোহাগী হাসি এক মুহূর্ত্তের তরেও মিলাবে না। পেট্রোম্যাক্সটাও ভোঁস ভোঁস শব্দে জ্বলতে থাকবে।

বেশ খানিক দূর থেকে চোরা-চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একবার দেখে নেয় মণিমোহন।

অলকার ঘরেও ম্লান আলো জ্বলেছে! তার ঘরের রাস্তার দিকের জানলাটা খোলা রয়েছে। অলকাও হয়তো প্রতীক্ষায় কাতর হয়ে বসে আছে।

আরও কিছু পথ যেতে না যেতেই তো দেখতে পাওয়া যাবে স্বচক্ষে। সিগারেটে দেশলাইয়ের আগুন ধরিয়ে হারাণো-উত্তম ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালায় মণিমোহন।

দিন-কাল খারাপ। আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়ের চাপে দেশের মানুষ না কি মরমর। ডাইনে আনতে যখন বাঁয়ে কুলোয় না তখন আর সংসার বাড়িয়ে মিথ্যা মিথ্যা কষ্ট পাওয়া। সকল কষ্টের তুলনায় যখন অর্থকষ্ট সবচেয়ে কষ্টকর তখন ভেবেচিন্তে চলতে হয় ইদানীং।

তদুপরি শিশু-সরকার যখন বায়না ধ'রেছে। আকাশের চাঁদ চেয়ে বায়না ধরলে কারও কোন' ক্ষতি ছিল না। জমিদারদের জমিদারী দাবী করেছে। কত সুখের, কত সুবিধার, কত আনন্দ আর কত আরামের জমিদারী কেড়ে নিতে চায় জমিদারদের হাত থেকে। নোটিশ এসেছে। ভারত-আইনের বই থেকে নাকি সূর্য্যাস্ত আইনের পরিচ্ছেদটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে, চিরকালের মত!

তাই অনঙ্গমোহন তাঁর এক মাত্র ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন,—মণিমোহন, একটি কথা তুমি যেন ভুলে যেও না, তোমার বিবাহ আমি কোনদিন দেবো না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়।

প্রসঙ্গটা শুনে মাথা নামিয়েছিল মণিমোহন। হাঁ না কিছুই বলেনি। কিন্তু অনঙ্গমোহন আরও ব'লেছিলেন,—ব্রেড এণ্ড বাটারের সংস্থান থাকবে না? ভাবতে পারো তুমি?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মণিমোহন। মুখে তার কথা জোগায়নি। অনঙ্গমোহন আরও বলেছেন,—মুখে ভাত দিতে পারবে না, পরণের বাস দিতে পারবে না, বছর বছর পশুপক্ষীর মত বাচ্ছার জন্ম দিয়ে যাবে? হরিবল্! টেরিফিক্! প্যাথেটিক্!

বাইরে থেকে দরজার কড়া দু'একবার বাজতে না বাজতেই দরজা খুলে যায় যেন ফুস্‌মন্ত্রে। দুয়োর খুলে দিয়ে এক পাশে, আড়ালে স'রে দাঁড়ায় অলকা। ভয়ে ভয়ে খানিক তাকিয়ে, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে ফিসফিস বললে,—তুমি! আমি ভেবেছি, কে না কে! একা একা থাকতে হয়!

নিজের চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস হয় না অলকার। নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে!

—কেমন আছো? চাপা গলার শুধোয় মণিমোহন।

—তুমি যেমন রেখেছো। ফিসফিস কথা বলে অলকা। ভয় আর উত্তেজনায় হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে।

দরজায় খিল তুলে দিয়েই দুই বলিষ্ঠ হাত মেলে মণিমোহন। প্রথমে দুই মুঠোয় অলকার দুই নরম বাহু চেপে ধরে। যেন শূন্যে তুলে ফেলবে অলকাকে!

—কদিন আসতেই পারিনি অলকা। কলকাতা যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। কথা বলতে বলতে মণিমোহন তার দুই মুঠো আরও শক্ত করে।

কেন কে জানে, সজোর চাপে অলকার যেন দম বন্ধ হ'তে থাকে। যেন তার দেহলতা লুটিয়ে পড়তে চাইছে, চোখের দৃষ্টিতে তার ফুটেছে সমর্পনের ব্যাকুলতা। তবুও সহজ হ'তে চায় অলকা। ফিসফিসিয়ে বলে,—আমি জানি তোমার অনেক অসুবিধে, অনেক বাধা। অনেক

চোখকে ফাঁকি দিয়ে আসতে হয় তোমাকে। তবুও তুমিতো এসেছো! আমাকে ভুলে যাওনি!

দুই মুঠোর চাপে অলকাকে কাছে টানে মণিমোহন। বুকের কাছে টানে, মুখের কাছে।

ছেলে যে কোথায় গেল, তাই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন অনঙ্গমোহন।

আকাশ আরও কালো হয়। আরও একটু ঘন হয় রাত। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট হয়েছে এখন। রাত্রির স্তব্ধতায়। আর যেন ভাল লাগলো না প্রকৃতির রূপ দেখতে। রাতের আকাশ আর বৈশাখের মুক্ত বাতাস, বুঝি ভাল লাগলো না আর। অনঙ্গমোহনের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। রাত্রির তমসা কি ভেঙে খান খান হয়ে যাবে!

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে না সারেঙ্গী কাঁদছে সদরের নাচ-ঘরে!

না কি বাঈজীর পায়ের নূপুরের কিন্‌কিনী শোনা যায়! রাত্রির তমসা যেন চিরে চিরে যায় একটানা শব্দের করাতে। ঝিঁঝিঁর ডাক, সারেঙ্গীর কান্না, না ঘুঙুরের মিহি আওয়াজ, ঠিক ধরা যায় না।

দালান অতিক্রমণ সহসা থেমে যায় অনঙ্গমোহনের।

কারা এত কথা বলে! কোন্ এক বদ্ধদ্বার ভেদ ক'রে কাদের কথা যেন কানে ভেসে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। সোল্লাসে কথা বলাবলি করছে কারা।

চুরিয়ে কারও কথা শুনতে চাওয়া চরম অভদ্রতা! তবুও পা যেন চললো না। অভাবের অশান্তিতে ভদ্রতা-অভদ্রতার জ্ঞান আর থাকে না। সরিকদের চক্রান্ত চলেছে হয়তো। পরস্পরকে ফাঁকি দেওয়ার ষড়যন্ত্র

পাক খাচ্ছে বদ্ধদ্বার ঘরে। কে কাকে পথে বসাতে পারে তারই ফন্দী-ফিকির বের করা হচ্ছে।

অভাবের তাড়নায় স্বভাবটার কোন ঠিকঠাক থাকে না। পা আর চলে না অনঙ্গমোহনের। কান খাড়া ক'রে শোনেন কে কি বলছে। শুনলেন—

—এই ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে ছাড়বো!

—মামলা চালিয়ে যদি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, তবুও।

—ফতুর হই হব', তোদেরও ফতুর করবো!

—হাইকোর্ট দেখাবো!

—কাটগড়ায় দাঁড় করাবো!

—জমিদারী লাটে তুলে দেবো তোদের!

—এ্যাটর্নী বলেছে এই ডিক্রীতেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। বাড়ীর নোটিস আসবে, এক হপ্তার টাইম দেবে। তারপর—

—তারপরই বাড়ী ভেকেণ্ট ক'রে দাও! যে যার পথ দেখো!

কথার শেষে কে যেন অট্টহাসি শুরু করলো। হো হো শব্দে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগদান করলো আরও কয়েকজন। একই রবে। সেই হাসির ঐকতান সারা অন্দরময় যেন ছড়িয়ে পড়লো।

কথাগুলি একে একে কাণে পৌঁছয় আর শিউরে ওঠেন অনঙ্গমোহন। সরিকদের একদল ষড়যন্ত্র চালায়। বুকের প্যালপিটেশন বেড়ে যায়। মাথার মধ্যে যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যায় কথাগুলি শুনতে শুনতে। চক্রান্তের জাল বুনন চলেছে রুদ্ধদ্বারকক্ষে। রাত্রির অন্ধকারে, যখন ষড়যন্ত্রের সঠিক সময়?

বৈশাখী হাওয়া যেন সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দেয়। রাতের কালো আকাশ কোন' জবাব দেয় না। ভগবানের প্রকৃতি না কি সজীব,

কথা বলে না কেন তবে? সমবেদনা আর সহানুভূতি জানায় না কেন?

দালান থেকে হনহনিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন অনঙ্গমোহন। মুখে চুরুটটি ধ'রে রেখে ব'সে পড়লেন ইজি-চেয়ারে। কেমন যেন ভীষণ হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। ছেলেটা আবার এমন সময় কোথায় যে চলে গেল! এমন অসময়ে! নিজেকে যেন অত্যন্ত বেশী একা মনে হয়। দেওয়ালে অনুপমার ছবিটি সহসা চোখে পড়তে আরও যেন একা মনে হয়।

সদরের নাচঘরে আসর জমায়নি তো মণিমোহন? অবিবাহিত বয়স্ক ছেলে সে, হয়তো সংযমকে আর আয়ত্তে রাখতে পারেনি। মদ আর মেয়েমানুষ চোখের সমুখে দেখতে পেয়ে হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। লেজ-কাটা শৃগালদের দলে প'ড়ে হয়তে' মণিমোহনও নিজের লেজ কেটে উড়িয়ে দিয়েছে।

অনঙ্গমোহনের মাথার মধ্যে তুফান বইছে যেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, কেন কি কারণে। ঘর থেকে বেরিয়ে দালান থেকে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ডাকলেন,—শ্যামাপদ! শ্যামা! শ্যামা—আ—আ—আ!

—আজ্ঞে হুজুর!

অনঙ্গমোহনের ঠিক পায়ের পাশটি থেকে হঠাৎ সাড়া দেয় শ্যামাপদ। হঠাৎ ঘুম-ভাঙার অস্পষ্ট স্বরে। হাতে কাজ ছিল না তার, ফুরসৎ পেয়ে দালানেই লটকে পড়েছে। ঘুম মারছে।

আরেকটু হ'লে অনঙ্গমোহন নিজের চমকানিতে ট'লে পড়ে যেতেন; মাড়িয়ে ফেলতেন পোষা চাকরকে! ঘুমন্ত শ্যামাপদকে।

—দাদাবাবু কোথায়?

অনঙ্গমোহন প্রশ্ন করলেন ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে।

—আমিতো জানি না হুজুর।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো শ্যাম। কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে, তাই কথা বললে সামান্য বিরক্তির সঙ্গে।

—সদরের নাচঘরে নেই ?

—দেখি নাই হুজুর।

—দেখে আয় সেখানে আছে না নেই। যাবি আর আসবি। দেরী করিসনে যেন।

চন্দনপুরের যেদিকে গির্জ্জাবাড়ী, যেদিকে মুসলমানপাড়া শেষ হয়েছে, সেদিকের একটি রাস্তার দিকের ঘরের খোলা-জানালা বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঘরের মালিক শ্রীমতী অলকা দেবী নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। জানালা বন্ধ করতে করতে বলেছে,—আমার হাত একেবারে খালি। এমন পয়সা নেই যে তোমাকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দিই! চা চিনি আনাই! দুধ আনাই!

কথায় বিস্ময় ফুটিয়ে মণিমোহন বললে,—সে কি কথা অলকা! সাত দিন আগেও যে তোমাকে একশো টাকা দিয়েছি! তার সব খরচা হয়ে গেল এর মধ্যে ?

অলকা মণিমোহনের কাছটিতে বসে। বলে,—তা হবে না? কি যে বল' তুমি! চার মাসের ঘড়-ভাড়া বাকী পড়েছিল। দিয়ে দিয়েছি চার কুড়িং আশী টাকা। বাকী টাকায় র‍্যাশন আনিয়েছি, ধোপাকে টাকা মিটিয়েছি, বাসন-মাজা-ঝিয়ের মাইনে চুকিয়েছি।

কেমন যেন চিন্তার রেখা ফোটে মণিমোহনের কপালে। খানিক ভেবে ভেবে বললে,—তবে নাও আরও কিছু টাকা। কথায় শেষে

পকেটে হাত পুরলো। বের করলো এক তাড়া নোট। পাঁচ আর দশ টাকার। বল্লে,—ভালই করেছো বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে। এই নাও আরও পঞ্চাশ, রেখে দাও তোমারই কাছে।

—অসুবিধে হবে না তো তোমার? মিহি কণ্ঠে বলে অলকা। বলে,—যদি অসুবিধে হয় থাক। পঞ্চাশ দিতে হবে না, গোটা কুড়িক টাকা দাও আপাতত।

অলকাকে সাপটে টেনে নেয় মণিমোহন। বলে,—আমার টাকাতো তোমার জন্যেই। নাও তুমি, পঞ্চাশ টাকাই নাও। আমার কোন' অসুবিধে হবে না। আমার উপার্জ্জন, সেতো তোমার জন্যে, নয়তো বয়ে গেছে আমার রোজগারের ধান্দায় ঘুরে মরতে!

—তোমাকে কত কষ্ট করতে হয় আমার জন্যে! অলকা কথা বলে সহানুভূতির করুণ সুরে। মুখ উঁচিয়ে।

মণিমোহন বললে,—কিছু নয়, কিছু নয়। তবু যদি তোমাকে হাজার হাজার টাকা দিতে হ'ত! একটা গয়নাও তো দিতে পারি না কালেভদ্রে!

—গয়না আমার চাই না। নিজেকে সোনায় মুড়ে রাখতে আমি চাই না। তুমি আমার হয়ে থাকো, তুমিই আমার অলঙ্কার, তুমিই আমার—

কথা বলতে বলতে নিজেকে কেমন বিকিয়ে দেয় যেন অলকা। তাকে অনেক কাছে টেনে নেয় মণিমোহন। বলে,—তেমন বেশী টাকা উপার্জ্জন করতে পারলে সোনায় তোমাকে মুড়েই রাখতুম! সাধ আমার অনেক, সাধ্যে যে কুলায় না!

মণিমোহনের উপার্জ্জন! যে চাকরী করে না, ব্যবসাও করে না, অথচ টাকা উপার্জ্জন করে কোথা থেকে! জুয়া থেকে? না, তাও নয়। জুয়া মধ্যে মধ্যে খেলে বটে মণিমোহন। কলকাতার চীনা পাড়ায় যে-সব

আণ্ডার-গ্রাউণ্ড জুয়ার আড্ডা আছে, যেখানে মদ আর টাকার কোন মূল্য নেই, যেখানে ছোরা আর ছুরি কথায় কথায় চালাচালি হয়, যেখানে নারী-মাংসের মূল্য অত্যন্ত নগন্য—সেই সব ভয়াল ভয়ঙ্কর গোপন আড্ডায় মাঝে-মিশেলে যায় বৈকি মণিমোহন! খেলে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড। জিতে যায় ভাগ্যে যেদিন থাকে। হারে বেশীর ভাগ দিন। জলের চৌবাচ্চায় সত্যিকার হাঁস সাঁতরে সাঁতরে বেড়ায়। এক নিদ্দিষ্ট জায়গা থেকে রিং বা রবারের চাকতি ছুঁড়তে হয় হাঁসকে লক্ষ্যে রেখে। ভাগ্যে যদি থাকে, ঐ রিং হাঁসের গলায় গ'লে যায়। নয়তো রবারের চাকতি ফসকে গিয়ে পড়ে চৌবাচ্ছার জলে। টেবিল-মানি জলে যায় তখন। জুয়াড়ীদের তাচ্ছিল্যভরা হাসির অট্টরোলে লজ্জা পেতে হয় তখন। টাকা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও নষ্ট হয়।

আর যেদিন জিতে যায়? সেদিন পায় হয়তো পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকা। নিজের উপার্জ্জনের জন্য জুয়া খেলে না মণিমোহন। উদবৃত্ত টাকা হাতে থাকলে সেদিন খেলে জুয়া। অর্থাৎ জুয়া খেলে উপার্জ্জন করে না। জুয়ার টাকা ঘরে তোলা যায় না—এ কথাটি সে বিশ্বাস করে।

মণিমোহনের উপার্জ্জনের পথ অন্য। পালে-পার্ব্বণে কলকাতার ট্রামে-বাসে যেদিন ভিড় হয় অসাধারণ, কলকাতার মানুষ যেদিন নিজেদের হারিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে সেই দিনগুলির সদ্ব্যবহার করে সে। কোন অসাবধান মায়ের বুকের শিশুর কণ্ঠ থেকে সোনার হার কেটে নেয় কি এক যন্ত্রের সাহায্যে! আর পালা-পার্ব্বণ ও উৎসব যেদিন থাকে না সেদিন মণিমোহন পরে পুলিশ অফিসারের খাঁকীর কিংবা সাদা জিনের পোষাক। তারপর কলকাতার শহরতলীর দোকানে দোকানে হানা দেয়। সেদিন তার অন্য আকৃতি, অন্য ভাবভঙ্গী, অন্য ধরণ-করণ। পুলিশ ইউনিফর্মে একেবারে অন্য চেহারা।

পুলিশ অফিসারকে দেখে জালদ্রব্যের ভীরু দোকানদার হয়তো সসম্মানে এগিয়ে আসে করজোড়ে। বলে,—কোন' হুকুম আছে সার?

সপ্রতিভ হাসি হাসে মণিমোহন। বলে,—পুলিশ কখনও হুকুম করতে পারে মশাই? পুলিশ হচ্ছে পাবলিক সার্ভেণ্ট, তাকেই হুকুম করে পাবলিক।

—কি যে বলেন সার! পুলিশই আমাদের ধ্যান জ্ঞান, পুলিশই আমাদের ভগবান, পুলিশ বিভাগ আমাদের কাছে স্বর্গ! পুলিশ যদি না থাকতো—

দোকানদারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কথার সুর পালটে গম্ভীর স্বরে কথা বলে মণিমোহন। বলে,—তা তো হ'ল, কিন্তু আপনার শো-কেশের জবাকুসুম আর বাতগেটের ক্যাষ্টর অয়েলের শিশিগুলো যে মনে হচ্ছে দু'নম্বর মাল! দেখি একবার শো-কেশটা খুলুন। বনস্পতির টিনগুলো দেখে মনে হচ্ছে আসল, কিন্তু ভেতরের বস্তু কি ঠিক আছে?

কাঁপতে থাকে দোকানদার। শীতের দিনের বলির পাঁটার যত কাঁপতে থাকে। মুখ শুকিয়ে যায়। গলা শুকিয়ে যায়। বলে,—শো-কেশ হাতড়ে আর মিথ্যে কেন কষ্ট পাবেন সার? তার চেয়ে আসুন, আমাদের ষ্টক যেখানে থাকে—

দোকানে অনেক খদ্দের। তাদের সামনে রেখে কখনও পুলিশের সঙ্গে কথা হয় না। দোকানের ভেতরে প্রায়-অন্ধকার ঘরে যেতে হয় মণিমোহনকে। সেখানে গিয়ে একটি সিগারেট ধরাতে হয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দোকানদার আসে। কাঁপতে কাঁপতে আসে! বলে,—ষ্টক আর কষ্ট ক'রে কেন দেখবেন? নিন, এগুলো দেখুন।

কথার শেষে হাতের মুঠো খোলে দোকানদার। দেখা যায় এক তাড়া

নোট। পার্চ্চমেণ্ট কাগজের শুভ্রতা উঁকি দেয়। জল-রঙের চিত্র-বিচিত্র উঁকি মারে দেখা যায়। সবুজ আর নীল রঙের আভাষ।

—কেস্‌টা আরও নষ্ট করছেন আপনি!

গম্ভীর স্বরে বলে মণিমোহন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

—আপনি আমার বাপ হুজুর। সবই বোঝেন, সবই জানেন। আমাদের মত দরিদ্র দেশে এক নম্বরের আসল মাল চালাতে গেলে দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিতে হয়, পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হয়। আপনারা সবই জানেন, দু'নম্বর মালের চাহিদাই সর্ব্বত্র। সার, আপনার মূল্যবান টাইম আর মিথ্যে মিথ্যে কেন নষ্ট করেন!

একটি চোখ বন্ধ ক'রে ফিসফিস শব্দে প্রশ্ন করে মণিমোহন। বলে,—হাতে আপনার কত টাকা আছে?

—পুরোপুরি একশো সার।

—ওটাকে পুরোপুরি দেড়শো ক'রে দিন। অনেক টাকা লাভ আপনার, হাওড়ার এ তল্লাটের মধ্যে সবচে বেষ্ট্‌ পজিশনের দোকান আপনার।

দু'একবার মাথা চুলকে অগত্যা দোকানদারকে আবার তহবিল খুলতে হয়। বের করতে হয় গুনে গুনে আরও পঞ্চাশ টাকা। পুলিশ বিদায়-কালে বলে,—আবার আসবো। তবে ভয় নেই আপনার!

মণিমোহনের উপার্জ্জনের পথ যে কত ঘোরালো তা কেউ জানে না। পশ্চিমবাঙলার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টও নয়। চাকরী আর ব্যবসা না করেও বাঙলার মত বিচিত্র দেশে টাকা জোগাড়ের ভাবনা কি! কিছু সাহস আর খানিক বুদ্ধির জোর থাকলে টাকার অভাব হয় কখনও? যে-দেশের হাওয়ায় টাকা উড়ছে সেই টাকার দেশে?

চাকরী ব্যবসা নেই, অথচ উপার্জ্জন আছে প্রচুর। সপ্তপাকে নিজেকে না জড়িয়েও স্ত্রীলাভ—এই সব বেয়াড়া প্রবঞ্চনার আর্ট আয়ত্ত করতে হয়েছে মণিমোহনকে। অনেক কষ্টে। পৃথিবীর চোখে ধূলো দিতে পারে না যে কোন লোক, যখন তখন। মণিমোহনরাই পারে। যাদের জন্য পুলিশ, তারাই পুলিশ সেজে ঘুরে বেড়ায়!

তবুও লোকে জানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে মণিমোহন। যেমন ক'রে হোক, যেখান থেকে হোক—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছে। বুড়ো বাপকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিয়ের বয়স উৎরে গেছে, তবুও বিবাহ করলো না এখনও, এমনই সচ্চরিত্র সে!

অনঙ্গমোহনেরও তাই মণিমোহনের প্রতি অসীম স্নেহ। অভাবের সংসার, ছেলে বিয়ে করলো না, জয় করলো কাম-কামনা।

স্নেহ। কত সময়ে অসময়ে অনঙ্গমোহনের মনে পড়ে যায় নিজের অতীত জীবনের কাহিনী। যৌবনের দিনগুলিতে এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। কোন রকম বাধা নিষেধ ছিল না, ছিল অর্থের স্বচ্ছলতা! আয়ের জন্য ভাবতে হবে না, শুধু ব্যয় করে যাও যেমন মন চায়। নেশা আর নারীর জন্য কি অসামান্য টাকাই না উড়িয়েছিলেন অনঙ্গমোহন! প্রথম শ্রেণীর স্কচ হুইস্কি ছাড়া অন্য কোন কিছু মুখে দিতেন না, পরমাসুন্দরী মার্গারেট ছাড়া অন্য কারও প্রতি ফিরেও তাকাতেন না। তখন নাকি মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা ছিল না, বেনিয়মের বাড়াবাড়িতে আত্মমগ্ন থাকতো স্বেচ্ছাচারের দল। আইনও ছিল না এত কড়া আর কঠোর। সবার উপরে ছিলেন অনুপমার মত সর্ব্বংসহা সহধর্ম্মিণী—যিনি কোন দিনের জন্য মুখ ফুটে কিছু বলেননি, প্রতিবাদ করেননি। অনঙ্গমোহনের পানাসক্তি আর মার্গারেটপ্রীতির কথা অনুপমার অজানা ছিল না, সবই তিনি জানতেন। তবুও তাঁর অনিন্দ্য মুখের সরল হাসিটুকু

কখনও মিলায়নি—যতদিন না তার অপমৃত্যু হয়েছে! তাঁর তুলনায় মণিমোহনতো জিতেন্দ্রিয়!

অগ্নিদাহনে মৃত্যু হওয়ার পর কোথায় যে অনুপমার রূপরাশি উবে গেল কে জানে! কি বীভৎস সেই রূপ! আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যায় অনুপমার দুধের মত দেহবরণ। মুখাকৃতির কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়! পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রাশি রাশি কেশের বোঝা। দেখলে যেন চেনা যায় না সেই অনুপমাকে। কয়লার খনির ভেতর থেকে যেন টেনে হিঁচড়ে বের করা হয় তাঁকে।

এখনও সেই দৃশ্য চোখে ভাসলে কেমন নীরব, নিস্পন্দের মত হয়ে যান। অনুপমার আত্মার মুক্তি হয়েছে কিনা কে বলতে পারে! অপঘাতে মরণ বরণ করলে নাকি আত্মার মুক্তি বা শান্তিলাভ কোনটাই হয় না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, শেষ-ডাকের সাড়া দেওয়া নয়,—যথেচ্ছা আত্মহত্যা খোদার ওপর খোদকারি যেন! যৌবনের চপলতায় যার প্রতি কোনদিন অন্তরের দৃষ্টি দেননি অনঙ্গমোহন,—সেই নিজে কিনা মরণ ডেকে এনে নিজেতো চলেই গেলেন চিরকালের মত, স্বামীকেও তাঁর যেন মেরে রেখে গেলেন দুঃখশোকের জ্বালায়! সেই দুঃখের লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারেন না অনঙ্গমোহন। অনুপমা নিজেতো শুধু অগ্নিদগ্ধ হননি, অনঙ্গমোহনের মুখটি পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন লোকচক্ষে।

লোকে তখন দোষ দিয়েছিল অনঙ্গমোহনকে। তিনিই নাকি অবহেলায় হত্যা করেছেন নিজের স্ত্রীকে। প্রকারান্তরে তিনিই আসলে হত্যাকারী। অনুশোচনায় মর্ম্মাহত হয়ে থাকেন যেন অনঙ্গমোহন। তাঁর সদা-অপ্রসন্ন মুখে কেউ আর হাসির রেখা দেখতে পায় না।

এক নাগাড়ে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। নিজেকে বড় একা মনে হয়। কত দুর্ভাবনা আসে মনে। কত রকমের দুশ্চিন্তা!

ভাবেন, সেযুগের তুলনায় এযুগটা খুবই সংযত! তাঁদের তুলনায় মণিমোহন তো যুধিষ্টির!

রেডিওটা চালিয়ে দেবেন নাকি! তবুও যা হোক মনুষ্যকণ্ঠ শোনা যাবে নিরালা ঘরে। মানুষের মুখ দেখা যাক আর না যাক, মানুষের কথা শুনতে পাওয়া যায়। বিরক্তি আর বিষন্নতায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন অনঙ্গমোহন, তখন কত সময়ে রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরেন বিবিসি, রেডিও ফিলাডেল্‌ফিয়া, সিডনী, ড্যাভেন্‌ট্রি, পিটস্‌বার্গ কিংবা প্যারী ষ্টেশন।

সর্ট্ ওয়েভে ধরেন।

বহু দূরের সমুদ্রকুল থেকে ভেসে-আসা কথা অনঙ্গমোহন বোঝেন না, কেন না সেই ভিনদেশী ভাষায় নেই তাঁর দক্ষতা। কিন্তু গানের বা বাদ্যযন্ত্রের সুর, হোক না বিদেশী, শুনতে বেশ লাগে। ঘরের নিরবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। অন্দরের এক কক্ষে নির্জ্জনবাসে থেকেও সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। কোন খবর না রেখেও জানা যায় গোটা পৃথিবীর খবরাখবর। নিজের মনের কাছে স্বীকার করেছেন অনঙ্গমোহন, স্থবিরের কাছে, বার্দ্ধক্যের সময়ে রেডিও নিঃস্বার্থ সহচর। সুখের দুঃখের বন্ধু। মানুষের কথায় শুধু সুর, কিন্তু গানের একটি ছন্দ আছে। উত্থান আর পতন আছে। তান, লয় আছে। রেডিও আর চুরুট! বই আর সংবাদ পত্র—যার কেউ নেই তার এরা আছে।

বেতার, ধোঁয়া আর কাগজ তাই এত বেশী প্রিয় অনঙ্গমোহনের। তুমি স্বেচ্ছায় তাদের ত্যাগ না করলে, তারাও তোমাকে পরিত্যাগ করবে না। চেতনাসম্পন্ন মানুষের মত দুর্দ্দিনে ঠকাবে না। তোমার সুখে অংশ গ্রহণ করবে, দুঃখের জ্বালা ভুলিয়ে দেবে।

রেডিওর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন।

এ, সি কারেণ্ট, তাই যন্ত্রটি গরম হ'তে সময় নেয় কিছুক্ষণ। অনঙ্গমোহন ঝুঁকে পড়েন, কাঁটা ঘুরিয়ে চলেন এদিক সেদিক। আন্তর্দুনিয়ার অল ওয়েভ সেট। কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে কোন্ এক দেশ ধরা পড়ে কে জানে! কান পেতে থাকতে থাকতে শুনতে পাওয়া যায়, রেডিও ফিলাডেল্‌ফিয়ার নাম। নিমেষের মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হয়,—হাওয়াইয়ান গীটার আর পিয়ানোএ্যাকোর্ডিয়ণের দ্বৈত শব্দে কি এক গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর বাজতে থাকে।

রেডিও চালু হ'তে ফিরে দাঁড়াতেই দেওয়ালের আয়নায় সহসা চোখ পড়লো অনঙ্গমোহনের। অনেক দিন নিজেকে দেখেননি, হঠাৎ দেখতে পেতেই চট ক'রে এগিয়ে গেলেন আয়নার সামনে।

মুখখানা কি পুড়ে গেছে! কালি মাখানো! কপালে চিন্তার সদাস্পষ্ট কতগুলি রেখা পড়েছে! মাথার দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে! কোটরে কি ঢুকে গেছে দুই চক্ষু! দারিদ্র্যের হতাশ দৃষ্টি সেই চোখে, দেখলেই বোঝা যায়! অনঙ্গমোহনের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্ত কথা বেরোয়। বলেন,—দি ওল্ড্ আর ফুলস্, প্যারাসাইট্স্, হাফ-ডেড্!

হারিয়ে-যাওয়া, খরচা-হয়ে-যাওয়া লুপ্তশক্তি আর কি কখনও পুনরুদ্ধার করা যায়! যাটের কোটায় পা দিয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশা বৃথা—যখন অত্যাচারে আর অনিয়মে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে দেহ। হাতের মুঠো শক্ত করতে চেষ্টা করেন অনঙ্গমোহন, কিন্তু কেন কে জানে, পারলেন না! অত্যধিক হুইস্কি খেয়েছেন বয়সকালে, এখন তাই যকৃতের দোষ হয়েছে। অনঙ্গমোহনের দেহাকৃতিও কেমন যেন হলুদ আকার হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটোতেও হলদে আভা। মদ খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো সব প'ড়ে গেছে একে একে। তাই নকল দাঁত। ঝাপসা দেখেন চোখে। নার্ভের দোষ, তাই সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকেন।

—ভিয়েনে হুজুর আজ এলাহি বন্দোবস্ত !

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে শ্যামাপদ। দরজার আড়াল থেকে ! ভেবেছিলেন এ কথার কোন উত্তর দেবেন না। আরাম কেদারায় বসলেন অনঙ্গমোহন। অর্দ্ধেক পুড়ে-যাওয়া চুরুটের ছাই ফেললেন পাশের ছাইদানে। বললেন,—তুমি দেখে এলে নাকি ?

ঘরের আলোর সামান্য একটুখানি দালানে পড়েছে—দরজা ভেদ ক'রে ঘরের বাইরে পৌঁছেছে। সেই অল্প আলোয় উবু হয়ে ব'সে জ্বলন্ত ষ্টোভে আরও পাম্প করছিল শ্যামাপদ। সাপের ফোঁসফোঁসানির মত একটানা শব্দ শোনা যায়। শ্যামাপদর আশপাশে রান্নার সরঞ্জাম। চাকি আর বেলুন। এ্যালমুনিয়মের ছোট কড়াই। ময়দা আর মসলা। শাকশব্জীর ঝুড়ি। হাঁসের ডিম এক জোড়া। কয়েকটা পেঁয়াজ।

—হ্যাঁ হুজুর, ভিয়েনে গিয়ে যে দেখে এলাম আমি। এখনও অনেক বিলম্ব।

শ্যামাপদ কথা বলতে বলতে পাম্প ক'রে যায় ঘন ঘন। গমগমে আঁচ চাই। এখন থেকে জ্বলবে বহুক্ষণ। পাম্প করতে করতেই বললে, —কাটলেটের চিংড়ী এখন সবে থোড়া হচ্ছে। মাংস নামতে নামতে যার নাম রাত্তির দশটা !

—তাই না কি ?

একটা কোন কথা বলতে হয় তাই যেন বললেন অনঙ্গমোহন।

পাম্প্ করা শেষ ক'রে ষ্টোভে কড়াই চাপায় শ্যামাপদ। হয়তো ভিজে আছে এখনও, তাই হয়তো কড়াই শুকোতে সময় দেয়। শুকিয়ে গেলেই সরষের তেল ঢালবে—ভাজাভুজি আর সাঁতলানোর কাজ কটা আগেভাগে সেরে নেবে। শ্যামাপদ বললে,—কচি পাঁঠাতো আর নয়

হুজুর, যে চাপাতে না চাপাতে সেদ্ধ হয়ে যাবে। খাসির মাংস আনিয়েছেন বাবুরা! মনখানেক। নামতে নামতে যার নাম রাত দশটা এগারোটা!

কত কতদিন ভালমন্দ কিছু মুখে পড়েনি। অনঙ্গমোহন আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়লেন। আর পারছেন না সোজা ব'সে থাকতে। কোমর কনকনিয়ে উঠছে। পা দুটো ঠকঠক কাঁপছে। বললেন,—সদরে লোকজন এসেছে দেখলে শ্যাম?

—তা আর আসেনি হুজুর! বাবুরা ভাত ছড়াচ্ছেন, কাকের অভাব হবে? ঝেঁটিয়ে এসেছে সব।

—কে কে এসেছে দেখলে?

শ্যামপদ মুখে একটা শব্দ করলে। হতাশার কথা শুনে মানুষ যেমন চুকচুক শব্দ করে। বললে,—সে আর বলবেন না হুজুর। চন্দনপুরের যত সব ওঁচাগুলো এসে জড়ো হয়েছে!

সেযুগে সংযম না থাকতে পারে, থাকতে পারে উশৃঙ্খলা পুরোমাত্রায়, কিন্তু তখনকার যুগে রুচি ব'লে একটা পদার্থ ছিল। মনে মনে সেযুগ আর এযুগ খতিয়ে নেন অনঙ্গমোহন। তখনকার দিনে অভাব ছিল না, তাই রুচির বিকার ছিল না। এখন ঘরে ঘরে অভাব, তাই যেন এই অভাবীদের স্বভাব বলতে কিছু নেই। এখন রুচিবাগীশ নেই বললেই হয়। হাজার কেন লক্ষে একটা যদি চোখে পড়ে! তখনকার বাবুরা মিশতেন না যার তার সঙ্গে, আর এখন সকলের সঙ্গে মেলামেশা কর'তে হয়! রেডিও মারফৎ অনঙ্গমোহনের সারা দুনিয়ার সঙ্গে চেনাজানা। কোথায় কি রকম হাওয়া বইছে, সবই তিনি জানেন। মনে মনে বিষাদ-হাসি হাসলেন তিনি। ভাবলেন, এক মনোহর ও সুদৃশ্য অট্টালিকা—যার ওপরতলা আত্মগর্ব্বে একেবারে ধ্বসে যাওয়ায় নীচের তলার বাসিন্দারা মাথা তুলেছে। হাওয়া-ঘরের হাওয়া খাওয়া চলবে না আর! কুলশীলের

বড়াই শিকেয় তুলে রাখতে হবে। আবার মনে মনে হাসলেন অনঙ্গমোহন। যত সব ওঁচাদের আসার কথাটি বার বার মনে পড়ে তাঁর। ভাগ্য ভাল যে পৃথিবীতে নীচুতলার মানুষের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। অনঙ্গমোহন নিজেও এতকাল ছিলেন ঐ ওপরতলায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ এখন তিনি বাধ্য হয়ে নীচে নেমেছেন। বিলাস আর বাবুয়ানি কাকে বলে যেন ভুলে গেছেন। পৃথিবীতে অনঙ্গমোহনদের দলই ভারী, সেই আনন্দে মনে মনে তিনি হাসেন কত সময়ে। অনঙ্গমোহন এখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতি আছে; অত্যাচারী আর অত্যাচারিত। মানুষের জাত-কুল ঘুচে গেছে এখন, মুছে গেছে আসল জাতির কৌলীন্য।

কে কাকে অত্যাচার করে কে জানে! অনঙ্গমোহন নিজেকে অত্যাচারিতদের দলে ফেলেছেন! তাঁর বার্দ্ধক্য আর দারিদ্র্যের সুযোগে কে যেন তাঁকে অত্যাচার ক'রে চলেছে দিনের পর দিন। জমিদারী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, নিজের বয়সটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হারিয়েছে শরীরের শক্তি আর সামর্থ্য। যেমন প্রকট অর্থাভাব, তেমনি দুর্ব্বল দেহ। টাকা আর স্বাস্থ্য না থাকলে মানুষ নাকি আর মানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে যায়।

ভগবান নাকি বধির, বোবা আর অন্ধ!

কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! চন্দনপুরের যত সব ওঁচা আর অখাদ্যগুলো নাকি আজ সদরের আসরে জমা হয়েছে—এখনকার চন্দনধামের বাবুদের তারাই নাকি বন্ধু, সহচর, সোদরপ্রতিম।

ষ্টোভের 'পরে চাপানো কড়াই তেতে ওঠে। ষ্টোভের একটানা ফোঁসফোঁসানি শুরু হয়ে গেছে। গরম কড়ায় সরষের তেল ঢালতে ঢালতে শ্যামাপদ বলে,—হুজুর, হাঁসের ডিমের কি তৈরী করি বলুন? কি

খাবেন আজ? ঝাল না ঝোল? নাকি খাওয়ার পাতে গরম গরম অম্‌লেট খাবেন?

—যা হয় কর' একটা কিছু।

অনঙ্গমোহন নিস্পৃহের মত কথা বললেন।

—তবে হুজুর ঝালই বানাই। দাদাবাবুও ঝাল খেতে ভালবাসেন।

শ্যামাপদ কড়ায় ভাজাভুজির আলু-বেগুন ছাড়ে আর বলে।

—মণিমোহনের তো এখনও পাত্তা নেই! গেল কোথায় সে?

অনঙ্গমোহন যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন! বললেন,—শ্যাম, সদরের কোন ঘরে মণি নেই তো? দেখেছো তুমি?

কড়ায় ঝাঁজরি চালায় শ্যামাপদ। সরষের তেলের ঝাঁজে বার কয়েক কেশে নিয়ে বলে,—সদরে এখন যায় কার সাধ্য হুজুর? তবে লোক মারফৎ খোঁজ নিয়েছি, দাদাবাবু সদরে নেই। আমাদের দাদাবাবু সেখানে যাওয়ার পাত্রই নয়।

—তবে গেল কোথায়?

ঘরের ভেতর থেকে কথা ভেসে আসে। ষ্টোভের ফোঁস ফোঁস শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসে কথা।

ঝাঁজরি ওলটায় পালটায় শ্যামাপদ। আলু-বেগুন উলটে উলটে দেয়। বলে,—দাদাবাবু হয়তো তাসের আড্ডায় গেছেন। তাসে একবার বসলে তো দাদাবাবুর কিছুরই খেয়াল থাকে না!

—আমার ভয় হয়, মণিমোহন শুভাকাঙ্খী আত্মীয়-বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে মদ-ফদ না ধরে! এ্যাডিক্‌টেড্ হ'লেই যে ফ্যাসাদ!

অনঙ্গমোহন কথা বলেন ভীত, সন্ত্রস্তের মত। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফোটে ভয়ার্ত্ততা। তিনি যে জানেন মদ খাওয়ার অভ্যাসটা পাকাপাকি করলে বাঙালীর ঘরের সুখশান্তির ব্যাঘাত হয়! সারা জীবনের অভিজ্ঞতা

থেকে জেনেছেন,—বাঙালী জানে না মদ্যপান করতে, তাই ধাতেও সহ্য হয় না, ধোপেও টেঁকে না। অনঙ্গমোহন ঠেকে আর দেখে শিখেছেন, বাঙালীর সব কিছুতেই অতিমাত্রা। হাসিও যত কান্নাও তত। বজায় রাখতে পারে না, চালিয়ে যেতে পারে না, আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। ধোপে টিঁকতে পারে না।

বয়সকালে লজে আর ক্লাবের লাঞ্চ্ আর ডিনার পার্টিতে অনঙ্গমোহন দেখেছেন কত বিদেশী আর বিদেশিনীকে—যারা সত্তর পেরিয়েছে, তবুও বুড়িয়ে যায়নি! যেমন তাজা মন তেমনি সবল স্বাস্থ্য তাদের। হাসিতে উচ্ছল সদাক্ষণ। হয়তো সেই মরণের শেষ মুহূর্তেও ওদের ঐ হাসি, মুখ থেকে মিলায় না।

—দাদাবাবু আমাদের তেমন ছেলেই নয় হুজুর, যে মদ ধরবে!

বললে শ্যামাপদ। তেলের ঝাঁজে চোখ দুটোকে বন্ধ করে ফেললে। ঝাঁজটা যেন আর চোখে সহ্য হয় না কোন মতেই! চোখ দুটোকে ডান বাহুতে চেপে ধ'রে শ্যামাপদ বলে,— আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সারাটা দিন কলকাতায় হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন, এখন হয়তো তাই খানিক্ষণের জন্য তাস-ফাস খেলছেন কোথাও।

বৈশাখের উতল হাওয়া চলেছে। রান্নার সুগন্ধ বয়ে আসে বাতাসে। থেকে থেকে।

মাংস-রান্নার উগ্র লোভনীয় গন্ধ। হয়তো ভিয়েনের কড়ায় চপ কিংবা কাটলেট চেপেছে। পেঁয়াজ আর ডিমের মেশানো গন্ধ আসে হাওয়ায়।

কিছুক্ষণ আগেও এই গন্ধ নাকে পেয়েছিলেন অনঙ্গমোহন। তখন তাঁর অতৃপ্ত রসনা যেন চেয়েছিল আস্বাদন, কিন্তু এখন যেন আর ভাল লাগছে না। অরুচি ধরছে। অনঙ্গমোহন এখন যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধির রোগী। একমাত্র ছেলের মদ ধরার ভয় যেন তাঁর কাছে এখন

মৃত্যুভয়ের সামিল। অরুচি ধরছে তাই মাংসগন্ধে। চপ আর কাটলেটের লোভনীয় উগ্রগন্ধে।

মণিমোহন যে অনঙ্গমোহনের শেষ-বয়সে ঝাপসা চোখের মণি। সে যদি মদ ধরে! তাইতো এত দুশ্চিন্তা তাঁর। কে চালাবে তখন? চলবে কোথা থেকে? কলকাতায় কাকে পাঠাবেন তখন, জুয়া খেলতে, ঘোড়দৌড়ের বাছা বাছা ঘোড়া ধরতে! মণিমোহন এখন একটা পাকা জুয়াড়ী হয়ে উঠেছে শুধু ঐ অনঙ্গমোহনের সহযোগ আর অনুপ্রেরণায়! তবুও এখনও ঘোড়ার নাম অনঙ্গমোহনই বলে দেন, বাতলে দেন রেশ্ খেলার ফাঁক-ফোঁকর। কলকাতার রেশের মাঠের ঘোড়াদের কুলজী-কোষ্ঠী তিনি যতটা জানেন, হয়তো বা ঘোড়ার মালিকরাও জানে না। রেশুড়ে ঘোড়াদের কুলপঞ্জিকা অনঙ্গমোহনের নখদর্পণে। জকিদের নাম কণ্ঠস্থ।

কলকাতা থেকে কত দূরের চন্দনপুরে ব'সে ব'সে তিনি বিজয়ী ঘোড়াদের নামগুলি নাকি আগেভাগে ভবিষ্যদ্বাণীর মত ব'লে দিতে পারেন। তারই একমাত্র ওয়ারিশন্ মণিমোহন, সেও বড় একটা লোকসান দিয়ে আসে না সচরাচর। অনঙ্গমোহন খেলতে যা টাকা দেন, সেই টাকার দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়ে দেয় হাতে হাতে।

শুধু মাঠের খেলা নয়, রুদ্ধদ্বার ঘরের ভেতরের খেলার ফন্দী-ফিকিরও ছেলেকে শিখিয়েছেন অনঙ্গমোহন। কত দিন বলেছেন,—জুয়া খেলা ভাগ্যের খেলা নয়,—মাথার খেলা। ঠিক মাথাটি খেলিয়ে খেলতে পারলেই জয় সুনিশ্চিত। সীওর উইন!

টেবিল-মণি দিয়ে তেতাস্ খেলায় বসতে হলে কি কি কায়দা আয়ত্ত করতে হয়, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন,—এ খেলায় বিরুদ্ধপক্ষদের মুখের দিকে দেখতে হয়। কার হাতে কেমন তাস, ক'খানা টেক্কা বা

ক'জন রাণী আর ক'টা গোলাম চোখ দেখলেই বোঝা যায়। খেলোয়াড়দের মুখে নাকি এক সাইকোলজিক্যাল এফেক্টের ছাপ পড়ে। মুখ দেখে বুঝতে না পারো, ব্লাইণ্ড কল শুনেও যদি বুঝতে না পারো, তা হ'লে খেলতে যাওয়ার সময় সার্ট, পাঞ্জাবীর বদলে কোট প'রে খেলতে যেও। কোটটি হওয়া চাই ওপেন ব্রেষ্ট, অর্থাৎ বুক-খোলা। কোটের ভেতরে থাকবে দুটি ইনসাইড পকেট নয়, পকেটের জায়গায় আঁটা থাকবে দুখানি ছোট ছোট আয়না। ডানপাশের খেলোয়াড়ের হাত দেখতে চাওতো বামপাশের আয়নাটি দেখবে, আর বামপাশের হাত দেখতে হ'লে ডান দিকের আয়না আছে, দেখে নাও। তারপর হাত বুঝে নয় এগিয়ে যাও কিংবা দাঁড়িয়ে পড়'।

এ সব প্যাঁচ পুরানো হয়ে গেছে মণিমোহনদের সময়ে। চোখে ধোঁকা দেওয়ার সেই সেকেলে দিন আর নেই। জুয়া খেলায় ব'সে মণিমোহন বুঝেছে, ঠিকঠাক খেলতে হ'লে সোজা পথে না খেললেই মুশকিল! একবার দুর্ণাম ছড়ালে দল থেকে তাড়া খেতে হয়। দলে আর পাত্তা পাওয়া যায় না। অন্যায় পথ অবলম্বন করলে কত সময়ে সত্যি সত্যি মারধোর খেতে হয়। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে পৌঁছে যায় কত সময়ে। শুধু হাতে যখন কুলোয় না তখন চলে ছোরাছুরি। তাই বিশ্বাস রাখতেই হয়।

এত বেশী ধৈর্য্য নেই মণিমোহনের যে ব'সে ব'সে খেলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখন বিশ-পঁচিশ টাকা হাতে আসবে সেই আশায় থাকবে।

কলকাতা তথা বাঙলা দেশের পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে যখন এত শত মূর্খ নরনারী ছড়ানো আছে তখন জুয়ার আড্ডায় গিয়ে মাথা খাটানোর দরকার কি! এত কষ্টের কি বা প্রয়োজন?

ট্রাম বাস আছে কলকাতায়। সহরতলীতেও আছে মোটরবাস।

পাল-পার্ব্বণ আর পরব-উৎসবের দিনে ট্রামে আর বাসে মাথা গলানোর সাধ্য থাকে না কারও, এত বেশী ভিড়! শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে বাস ছুটেছে। দমদম-পাতিপুকুরের বাস চলেছে। এই বাস সোজা চলে গেছে ইটাণ্ডাপুর। শ্যামবাজার থেকে বনগ্রামের বাস আছে। ওদিকে দক্ষিণে ছুটেছে বাস বালীগঞ্জ ষ্টেশন, চলেছে খিদিরপুর, মোমিনপুর আর ঠাকুরপুকুরের বাস। শিয়ালদা আর হাওড়ার রুটেও বাস ছুটেছে। বরানগর থেকে টালিগঞ্জ, বেহালার বাসও আছে। ট্রামের কথা ধরলাম না।

মনিমোহন বাঙলা তারিখ দেখে নেয় দেওয়াল-পঞ্জিকায়।

ইংরেজী তারিখটা যদিও বা কোন রকমে মনে রাখা যায়, বাঙলা তারিখের ভুল হয় প্রত্যহ। মনে থাকে না। মনে পড়ে না। কেন কে জানে!

ক্যালেণ্ডারের তারিখে দেখে, লাল অক্ষর না কালো অক্ষর।

ছুটির দিন না কাজের দিন? তাই দেখে মণিমোহন। যদিও সরকারী ছুটির লাল অক্ষর না থাকলেও বারো মাসের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমানী এত তেরো পার্ব্বণ থাকে, যাদের উল্লেখ করতে হ'লে আমাদের দেওয়াল-পাঁজীর সব সংখ্যাই লাল অক্ষরে ছাপতে হয়।

সংক্রান্তি আর অমাবস্যার দিন লাল অক্ষরে লেখা থাকে না, মাসের মধ্যে এই দিনগুলিতেও বাসে বড় কম ভিড় হয় না। মনে হয় সত্যিই বুঝি বা ছুটির দিন। বাঙালা বছরের প্রথম দিন থেকে ধরলে পয়লা বোশেখের দিনও সরকার ছুটি দেন না। সেদিনেও ঐ কালো অক্ষর। শুধু বৈশাখেই কতগুলি উৎসব!

ট্রামে আর বাসে যেন মোচ্ছব লাগে, মানুষ কত প্রকারের হয় তারই একজিবিশনের। আমাদের জাতে কত রকমের মানুষ আছে যেন তারই

চলন্ত প্রদর্শনী হয়ে ওঠে ট্রাম বাস। প্রথমে বসতে পায় যাত্রী, যারা ডিপোর কাছাকাছি ওঠে; তারপর যারা ওঠে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর যারা ওঠে তারা দরজার কাছে ভিড় জমায়। তারপরও যারা উঠতে চায় তারা ভিতরে স্থান পায় না। বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয় তাদের। ট্রামের পা-দানি আর বাসের বম্পারে দাঁড়িয়ে ঝুলতে হয়।

হালখাতা শেষ হ'তে না হ'তে, গুড্ ফ্রাইডে, মুসলমানের শবেবরাৎ, ইষ্টারমণ্ডে। একাদশী আর অমাবস্যার ব্রতোপালনের স্নানযাত্রা মিটতে না মিটতে অক্ষয়তৃতীয়াব্রতম্। ঐদিন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। এই দিনটিতে পঞ্জিকামতে অনধ্যায়। ঐদিনে স্নানদানে অক্ষয়পুণ্য প্রাপ্তি। এই দিনটিতে শোনা যায় গঙ্গাদেবীর মর্ত্ত্যে অবতরণের দিন। এদিনে শিবের পূজা করতে হয়। গঙ্গা, কৈলাস, হিমালয় আর ভগীরথকে পূজা করতে হয়।

ট্রাম আর বাসে এই দিনটিতে বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে যায় যাত্রীরা। তারপর ষটপঞ্চমীব্রত পড়লো। সেদিনও শুদ্ধ,—গৃহপ্রবেশ, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, গৃহারম্ভ, উপনয়ন, দ্বিরাগমন, পঞ্চামৃত, রত্নধারণ, দেবতা গঠন, নৌকাগঠন, বীজবপন, ঋনের দান বা গ্রহণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, দীক্ষাগ্রহণ সবই পড়লো এই একই দিনে। তারপর এলো পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন এলো আর মুখর হয়ে উঠলো সহর, সহরতলী। এখনও আছে জহ্নুসপ্তমী বা জাহ্নবীপূজা, সীতানবমী।

ট্রামে আর বাসে যেদিন মানুষ ঝুলতে ঝুলতে যায়, পাশাপাশি বসতে পায় না এতই ঠাসাঠাসি—সেদিন থাকে হয়তো বারো মাসের তেরো পার্ব্বণের কোন একটা। ছুটির দিনের ভিড় দেখলে মণিমোহনের হাত দুটো যেন চুলবুলিয়ে ওঠে। নিসপিস করতে থাকে যেন হাতের আঙুলগুলো।

শ্যামবাজার থেকে দুর্নিবার গতিতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে দক্ষিণেশ্বরের যাত্রাবাহী বাস হয়তো ছুটছে। বাসে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। মণিমোহন ঠিক ঠাঁই পেয়েছে। লেডীজ সীটের কাছাকাছি লোহার রড আঁকড়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ী ঠাকুমা বসে আছেন হয়তো লেডীজ সীটে। তার সঙ্গে গাঁটছড়ার মত বাঁধা আছে দু'টি কিশোরী। ঠাকুমার নাতনী হয়তো বা।

মণিমোহন লক্ষ্য করে যাত্রীদের। নিজের টিকিটখানা আগেই কেটে নেয়। বকধার্ম্মিকের মত উদাস চোখে দেখে কোন্ যাত্রী কি ধরণের মানিব্যাগ পকেট থেকে বের করছে। যারা পাকাপোক্ত তারা ট্যাকে রাখে, কিংবা রাখে বুক-পকেটে। আর যারা কখনও ঘা খায়নি, পোড় খায়নি, তারা রাখে অসাবধানে। তাদের খেয়াল থাকে না, হুঁস থাকে না যে পকেটে টাকা আছে। এক আধবার যারা মার খেয়েছে তারা ক্ষণে ক্ষণে পকেটে হাত বুলোয়, দেখে নেয় ঠিক আছে না নেই। মেয়েদের অনেকে রাখে বুকের মধ্যে, জামার ভেতর। কি নির্লজ্জতা!

মণিমোহন ঐ গাদাগাদির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে উদাস চোখে। মাঝে মাঝে ইদিক সিদিক দেখে আড়নয়নে। কার মানিব্যাগ শাঁসালো আর কার পাৎলা দেখে নেয় টেরিয়ে টেরিয়ে। দেখে নেয় কে রাখলো বুকে আর কে রাখলো পাশ পকেটে। যে পাশ-পকেটে রাখে, সে গন্তব্যে পৌঁছে আর খুঁজে পায় না পকেটের ব্যাগ! মণিমোহন হাত সাফাই করে কখন কেউ দেখতে পায় না।

শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাস ছুটছে। আসনে যাত্রী, বাসের ভেতরে আর ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো যাত্রী, বমপারে ঝুলন্ত যাত্রী। লেডীজ সীটে বুড়ী ঠাকুমা আর দুই কিশোরী নাতনী—চলেছে হয়তো মা কালীকে দর্শন করতে, মনের কথা বলতে, পুণ্য অর্জ্জন করতে। ঠাকুমা ভয়ে আর

ভাবনায় নাতনীদের জড়িয়ে থাকেন, পাছে তারা বা তাদের গলার হার, কানের ছুল চুরি হয়ে যায়।

মণিমোহন দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক বকধার্ম্মিকের মত। মনে মনে হাসে সে।

কত আর সামলাবে বুড়ী? কতক্ষণ সামলাবে? কাকে সামলাবে? নিজেকে না নাতনীদের? মণিমোহনের চোখ ছুটি মধ্যে মধ্যে বেশ লোভাতুর হয়ে ওঠে। এক ছড়া সোনার হার, আজকের এই ছুর্দ্দিনে, আনবে অন্ততঃ শতখানেক টাকা। নিমেষের মধ্যে সোনার দোকানে বিক্রী হয়ে যাবে। এর তুলনায় জুয়ায় ব'সে অর্থোপার্জ্জন সত্যিই কষ্টকর। অনেক বেশী ধৈর্য্য আর সততার প্রয়োজন হয় সেখানে। কে এত কষ্ট করে খামাকা?

দক্ষিণেশ্বরের টারমিনাসে বাস পৌঁছে যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে। কাতারে কাতারে মানুষ—শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি আর সাধনপীঠ পঞ্চবটী দেখতে চলেছে। মা ভবতারিণীর চরণামৃত পান করতে চলেছে। দ্বাদশ শিব স্পর্শ করবে, গঙ্গাজল মাথায় ছোঁয়াবে, মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করবে, দেখবে সেই বিখ্যাত ভগ্নমূর্ত্তি!

ভবতারিণীর মন্দিরের ছুয়োরে শ'য়ে শ'য়ে নরনারী। কে কাকে দেখে, কে কাকে রাখে। কোন রকমে শুধু একবার দর্শনলাভ, মায়ের চরণদর্শনলাভ—সেই চরম মুহূর্ত্তের সুযোগ নেয় মণিমোহন। মন্দিরের দেওয়ালে ঝুলানো লেখা, কেউ পড়ে না। "পকেটমার হইতে সাবধান" হবে না মাতৃদর্শন করবে এই ঠাসাঠাসি আর গাদাগাদীর মধ্যে?

বুড়ী ঠাকুমা নিজেকে সামলাবেন না নাতনীদের! দর্শনের পর প্রাঙ্গণে নেমে মনে পড়বে নাতনীদের। তারা তখন হাত দেবে গলায় আর কাণে। হাতের পরশে দেখবে যেগুলি ছিল, সেগুলি ঠিক আছে না

নেই। ঠাকুমা তখন বলবেন,—মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি। মানুষের চাপে যেন শ্বাস রোধ হচ্ছিল!

একজন নাতনী দেখবে, ঠিক আছে তার কানের দুল আর কণ্ঠহার। একজন দেখবে দুল দু'টো ঠিক আছে। গলায় হাত দিয়ে গলার হার আর খুঁজে পাবে না। কিশোরী-কুমারী তখন ভয়-কাঠ কণ্ঠে বলবে,—আমার গলার হার?

—সে কি লা পোড়ারমুখী? হতচ্ছাড়ি! খুইয়ে যে মরলি, তোর বাপ মার কাছে আমি এখন মুখ দেখাবো কোন্ লজ্জায়! ও মা কি হবে গো, কে কোথায় আছো গো?

প্রায় কান্নার সুরে কথাগুলি বলতে বলতে ভূমিতে তখন বসে পড়বেন বুড়ী ঠাকুমা। ছোটখাটো একটি ভীড় জ'মে যাবে তৎক্ষণাৎ। কেউ কিছুই করতে পারবে না, তবুও ওপরপড়া হয়ে প্রশ্ন করবে একের পর একজন।

কেউ বলবে,—সোনা ছিল কতটা? ক' ভরি?

ঠাকুমা বলবেন,—মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলবেন,—ভরি ফরি নয়। আমরা গরীবগরবা, এই সাড়ে দশ আনাটাক সোনা ছিল!

সেই বাস তখন ফিরে চলেছে। দক্ষিণেশ্বর টু শ্যামবাজার।

বাসের কন্‌ডাক্‌টর হাঁকছে, যাত্রীদের ডাকছে। একেবারে পুরোপুরি ভর্ত্তি না হলে বাস ছাড়বে না! শুধু হর্ণ বাজাবে। লোক তুলবে।

মণিমোহন তখন বাসের কাছাকাছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখের তাজা সিগারেটে দেশলাই ধরায়। তার ট্যাঁকে সোনার হার, পাঁচ পাকে জড়ানো—তবুও বিঁধছে যেন কোমরে। সিগারেট শেষ হ'লেই উঠে পড়বে ফিরতি বাসে। শ্যামবাজার থেকে যাবে সোনাপটিতে।

দালানে ষ্টোভ জ্বলছে সাঁ সাঁ শব্দে। এতক্ষণে যেন গমগমে আঁচ হয়েছে। প্রথমে ছিল ফিকে নীল রঙ আগুনের। তারপর হয় হলুদ রঙ। তারপর এখন ঘন লাল রঙ হয়েছে।

—কি চাপিয়েছো শ্যাম। উনুনে কি চ'ড়লো!

চোখে অস্পষ্ট দৃষ্টি। দালানে আলো-আঁধার। ষ্টোভের আগুনের আলোয় কি আর তেমন আলো হয়! প্রদীপের নীচেই যে অন্ধকার!

—ভাজা চাপিয়েছি হুজুর। হয়ে এসেছে। তারপর ডাল চাপাবো।

—তুমি যে বললে শ্যাম, ভিয়েন থেকে কিছু রান্না আনবে, তার কি করলে!

অনঙ্গমোহন যেন ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন। ষ্টোভের কাছাকাছি এগিয়ে গেলেন কথা বলতে বলতে।

কড়াই থেকে আলু-বেগুন ভাজা নামায় শ্যামাপদ। অতি সাবধানে ঝাঁজরি নাড়াচাড়া করে। যদি প'ড়ে যায় দালানের মেঝেয়! তেলের গরম কড়াই নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে,—সে হুজুর ঠিক আছে। রান্নাবান্না এখনও সব চাপেনি। মাংসটা চেপেছে এতক্ষণে। হালুইকর-দের পান-দোক্তা খাওয়ার পয়সাও দিয়ে দিয়েছি আমি।

—কোন হালুইকরের দল এসেছে।

—হারাণ হালুইকরের দল। এ বাড়িতে হারাণ ছাড়া আমিতো কাকেও কখনও দেখতে পাইনি।

কথা বলতে বলতে শ্যাম আবার পাম্প করে ষ্টোভে। ডাল চাপাতে হবে, জোরালো আঁচ চাই।

—হ্যাঁ হারাণই আসে আমাদের কাজেকর্ম্মে। আগে ছিল হারাণের বাপ, তার নাম ছিল কি যেন! খানিক থেমে বলেন,—মনে পড়েছে, হারাণের বাপের নাম ছিল চূড়ামণি। ভারী ভাল হাত ছিল তার।

নাটকের সাজাহানের মত, বাদশাই ভঙ্গীতে, দালানের একদিক থেকে অপর দিকে পায়চারী করতে করতে কথা বলেন অনঙ্গমোহন। দালানের দেওয়ালে তাঁরই চলন্ত ছায়া।

ভিয়েনে থাকে কার সাধ্যি! একেই বৈশাখের গরম, তার ওপর গোটা ছয়েক আগুনের চুল্লী, জ্বলছে দাউ দাউ। ভিয়েনে যেন আগুনের প্রবাহ বইছে। ঘাম ঝরছে হালুইকরদের।

হারাণের মাথার বাবরি চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। তার চিবুক থেকে টস্ টস্ ঘাম পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। ভিয়েন থেকে বিরাজমোহন উঠে যাওয়ায় তবু যা হোক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে হালুইকরেরা। ছিনে-জোঁকের মত যেন বসেছিলেন বিরাজমোহন। তাঁর মোটা-কাঁচ চশমার ভেতর থেকে লক্ষ্য করছিলেন সকল কিছু। কে কি ভুল করলো, কে কাজে ফাঁকি দিলো, কেউ কিছু অপচয় করলো কিনা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

বিরাজমোহন ভাল ভাবেই জানেন পাক-প্রণালী। লুচি ভাজতে হ'লে কত জন লোকের কতটা ময়দার দরকার হয়, তরকারীতে কতটা তেল আর নুনের প্রয়োজন হয়, কিংবা এক মণ মাংস রাঁধতে হ'লে কতটা ঘি আর কতগুলো আলু দিতে হয়—সবই তিনি জানেন। চোখ বন্ধ ক'রে ব'লে দিতে পারেন। শ' তিনেক লোককে খাওয়াতে চাটনি বানাতে হ'লে কতটা মিষ্টি, কতটা তেঁতুল, কতটা আদা লাগবে, মুখে মুখে তিনি ব'লে দিতে পারেন।

বিরাজমোহন চলে যেতেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে বহুবার অন্তরের দরজা-জানলা দেখতে চেষ্টা করে হারাণ। রাতের অন্ধকার অন্দরে, কিছুই আর তেমন দেখা যায় না। হারাণ ভাবছিল, কোথায়

গেল মণিমালা, রাধাদিদি, শ্যামলী, কেকা, মঞ্জুদিদি, কমলা, ধীরা, বীরা, ইরা আর চম্পাবতীদের দল! হয়তো আশায় আশায় থেকে নিরাশ হয়ে চলে গেছে তারা।

বিরাট হাঁড়িতে মাংস ফুটছে টগবগিয়ে।

কড়ায় চপের কিমা রান্না হচ্ছে। লোভনীয় গন্ধের হাওয়া বইছে ভিয়েনে। চপের কিমা, খুন্তী দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হারাণ বললে, দলের একজনকে,—বলরামদা, কিমাটা একটু নাড়াচাড়া ক'রতো, আমি ততক্ষণে অন্দর থেকে চাটনীর তেঁতুলটা বোঁ ক'রে নিয়ে আসি।

বলরাম কাটলেটের চিংড়ী থুড়ছিল। বড় বিশ্রী কাজ এই চিংড়ি থোড়া। কিছুতেই যেন শেষ হ'তে চায় না। উঠে এসে হারাণের খুন্তী ধ'রে বলরাম বলে,—জিরে আর জায়ফলটাও আনতে ভুলে যেও না হারাণদা!

—জিরে আর জায়ফল এসেছে অন্দর থেকে। আছে ঐ কাগজের ঠোঁঙায়।

কথা বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে যায় হারাণ, অন্দরের অন্ধকার পথে।

অন্দরের ঠিক দুয়োরটি পেরুতে না পেরুতে কি এক সুগন্ধের এক ঝলক গন্ধ পায় হারাণ। পুরুষানুক্রমে হালুইকরের কাজ করছে, হারাণের নাক তাই বড় বেশী সজাগ। হালুইকরী করতে হ'লে রান্নায় হাত থাকার যেমন প্রয়োজন, তেমনি চাই তীব্র ঘ্রাণশক্তি। নাক টেনে না কি বলা যায়; কোন্ রান্নায় কি কি মশলা পড়েছে, উনুনের কোন রান্না কতদূর এগিয়েছে।

—হারাণ?

ফিস্ ফিস্ নারীকণ্ঠ অন্দরের দুয়োর মুখে।

কোমরে জড়ানো গামছাটি খুলে নিয়ে চেপে চেপে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে হারাণ বলে,—কে ডাকে! কে গা?

—আমরা হারাণ। ভিয়েনে এখনও কিছু রান্না হয়নি?

কিশোরী-কণ্ঠের মিষ্টি মিষ্টি কথা। হাতের চুড়ি না আঁচলের চাবির রিনিঝিনি থেকে থেকে। মাথার সুগন্ধি তেলের উগ্র গন্ধ। তেল না সেন্টের গন্ধ বোঝে না হারাণ। অন্ধকার, তাই কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না। কে যে কোথায় কিছুই দেখা যায় না। হারাণ হাসি চেপে বললে,—রান্নাবান্না সব চুকে গেছে। তোমরা কে তা বললে না?

—আমি মণিমালা।

ফিস্ ফিস্ কথা। মিষ্টি মিষ্টি।

—মণিমালাদিদি?

—হ্যাঁ গো হারাণ। চেঁচাও কেন অত? কেউ যদি শুনতে পায়?

—আরও কে কে যেন রয়েছে মনে হচ্ছে মণিমালাদিদি?

—আমি রাধা।

—আমি কেকা।

—আমি মঞ্জু।

মুখের হাসি চেপে হারাণ বলে,—আরও যেন কেউ কেউ আছে, ঠিক ঠাওর করতে পারছি না আমি।

মুখের মধ্যে আঁচল পুরে হাসতে থাকে মণিমালা। পাছে শব্দ হয় তাই। রাধা হাসি সামলে বলে,—কি গলা তোমার হারাণ? এত চেঁচাও কেন? হ্যাঁ, আরও আছে। কমলা, ধীরা, বীরা, ইরা আর চম্পা।

—তা কি বলছো তাইতো এখনও শুনতে পাইনি। দিদিমণিদের তা হ'লে দেখছি মনে আছে হারাণকে!

রাধা বললে,—তোমাকে আর কি বলবো বল' হারাণ? তোমাকে আবার মনে থাকবে না! ভিয়েনে কি কি চাপলো তাই শুনি।

হারাণ বলে,—শাকভাজা নেমেছে। বেগুনভাজা নেমেছে, কুমড়োর ছক্কা নেমেছে। মাছের কালিয়া, মাংস, চাটনীও নেমেছে। চপ কাটলেট গরম গরম ভাজা হচ্ছে! আর কি চাও?

—লুচি নামেনি? পাঁপড় ভাজা নামেনি? দই নামেনি?

বলতে বলতে খিল খিল হাসি শুরু করলো কে একজন।

—মিষ্টি নেবেছে, পানও এই নাবলো ব'লে। হারাণ হাসি লুকিয়ে বললে গম্ভীর স্বরে।

—কি যে ছাই কথা বাড়াও হারাণ? মুখের আঁচল বের করে ফিস ফিস বললে মণিমালা। বললে—এখুনি হয়তো বিরাজকাকা আবার ভিয়েনে এসে পড়বেন! হারাণ, আমাদের কিছু চাখতে দেবে না? মাছের কালিয়াটি নুনে পুড়িয়ে ফেলনি তো?

—মাংসে বড়এলাচ দিতে ভুলে গেছো তো? এতক্ষণে কথা ধরলো মঞ্জু। বললে—বাবুরা তা হ'লে আর রক্ষা রাখবে না তোমাদের!

—তা যা বলছো দিদিমণিরা! বললে হারাণ। বললে,—তবে দুঃখের কথাটি এই যে, এখনও কিছুই নাবেনি। এইবার সব একে একে হবে।

যারা অন্ধকারে বহু প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট গুনছিল আর মশার কামড় খাচ্ছিল তাদের সকলের চোখে একই সঙ্গে নামলো নিরাশ দৃষ্টি।

—তবে কিসের এত গন্ধ ছেড়েছো হারাণ? সেই গন্ধে গন্ধে আমরা যে এসেছি!

অভিমানী-কণ্ঠে কথা বললে রাধা। হতাশ স্বরে বললে।

হারাণ হেসে ফেললো। মজা দেখতে দেখতে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে

হাসে। গামছায় ঘাড়-পিঠ মুছতে মুছতে বললে,—যে যার এক একটা খুরী নিয়ে এসো দিদিমণিরা, মাংসটাই চেখে দেখো সব আগে। পাতে দেওয়ার যোগ্য যদি না হয়ে থাকে, তখন!

—কি যে তুমি বল' হারাণ! তোমার রান্না আবার পাতে দেওয়ার যোগ্য হবে না!

দলের লীডার হয়তো মণিমালা। সেই কথা বলে। সবার চেয়ে সেই নাকি বয়সে বড়। মণিমালা বললে,—এই চম্পা, তুইতো এলেবেলে, তুইই যা, খুরী চুরি ক'রে নিয়ে আয় যেখান থেকে পারিস।

চম্পাবতী, সেইই কনিষ্ঠা। সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। ক'দিন মাত্র ঘাগরা ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। চলতে ফিরতে শাড়ীর আঁচল সামলাতে পারে না এখনও। পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খায়। বুকের কাপড় বুকে থাকে না। যখন তখন কোমরের ফাঁস আলগা হয়ে যায়। বিনা সিঁথির টানা চুল বাঁধে। খোঁপা হয় না, তাই বিনুনী বাঁধে। জোড়া বিনুনী ঝুলতে থাকে দুই কাঁধে।

চম্পাবতীর ভয়ার্ত্ত কথার সুর। বললে,—আমার সঙ্গে ইরাদিকেও যেতে বল' মণিপিসী। অন্ধকারে আমার যে একা একা ভয় করবে ভাঁড়ারে যেতে।

মণিমালা ফিস ফিস বলে,—হ্যাঁ ইরা, তুমিও ওর সঙ্গে যাও। জ্যাঠাইমা কাকীমাদের কেউ যদি দেখতে পায় বলিস, সদর থেকে খুরী চাইতে পাঠিয়েছে।

—কেউ দেখতে পাবে না। বললে চম্পাবতী। বললে,—আমি ঠিক আঁচলের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে আসবো। চল' ভাই ইরাদি।

হারাণ বললে,—খুরী আনিয়ে ব'লে পাঠিও দিদিমণিরা। আমি তবে যাই?

—কাকেও বলবে না তো হারাণ ?

ফিস ফিস জিজ্ঞেস করলো মণিমালা।

রাধাও বললে,—তা হ'লে আর আমাদের রক্ষে থাকবে না! কর্ত্তাদের কাছে এক প্রস্থ হবে, অন্দরের গিন্নিদের কাছেও আর এক প্রস্থ হবে।

হারাণ বললে,—এই কি প্রথম চাখছো দিদিমণিরা ? সেই এ্যাতটুকুনি বেলা থেকে যে ঠিক এইখানটিতে এসে তোমরা—

—চুপ চুপ হারাণ! যাও, তুমি কাজে যাও।

ফিস ফিস বললে মণিমালা। বললে,—বাবুদের কেউ আসছেন না কি? চটিজুতোর শব্দ পেয়েছি আমি। এই, তোরা সব আয়, লুকিয়ে পড়ি আমরা।

তারপর আর কোন কথা নেই। শাড়ীর খস খস আর চুড়ি না চাবির ঠুং ঠুং। শ্বাস ফেলার শব্দ, একসঙ্গে অনেকের।

—কোথায় লুকোই রাধা ? বললে মণিমালা, একেবারে চুপিচুপি।

রাধা বললে,—কলতলায় যাবি ?

—না, যদি বিছে কামড়ায়, এই অন্ধকারে! মণিমালা বলে।

মঞ্জু বললে,—তারচেয়ে চল, শীগ্রি চল, নিরামিষ্যী রান্না-ঘরে ঢুকে পড়া যাবে।

—হ্যাঁ।

—ঠিক বলেছিস্।

শাড়ীর খস খস, হাতের চুড়ি না আঁচলের চাবির ঠুং ঠাং শব্দ পলকের মধ্যে যেন জোরালো হয়ে উঠলো। আবার অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশে গেল চকিতে।

অন্দরে আর যেতে মন চায় না। হারাণ হাসতে হাসতে ভিয়েনে পা বাড়ালো। কেশতৈল,এসেন্সের না স্নো পাউডারের উগ্র গন্ধটুকু যেন ভুলতে

পারে না হারাণ। টেনে টেনে শ্বাস নিয়ে বুকের মধ্যে যেন বহন ক'রে নিয়ে যায় সেই সুগন্ধ। পারুল মাতোয়ারার গন্ধ পর্য্যন্ত জানা আছে হারাণের। মেখেছে কত দিন। এ যে কিসের গন্ধ ঠিক ধরতে পারে না আন্দাজে।

যেন এক নতুন উদ্যম অর্জ্জন ক'রে হারাণ। হাসিমুখে হাজির হয় ভিয়েনে। চুল্লীর মুখে বিরাট বিরাট হাঁড়ী আর কড়া। আগুনের আলো চাপা পড়ে গেছে। ভিয়েনের আধো-আলো আধো-অন্ধকারে হারাণের হাসিমুখ দেখতে পায় না দলের কেউ। কোমরে গামছা বাঁধতে বাঁধতে হারাণ বললে,—বলরামদা, যাও, কাটলেট কটা থোড়া শেষ কর' তাড়াতাড়ি। আর আমাকে গোটা দুই পান যদি খাওয়াও।

দলের চাঁই হারাণ। সেই দল রাখে।

চিতপুরের গরাণহাটার কোন্ এক বস্তীতে বাসা আছে হালুইকর হারাণের। ঘর ভাড়া নিয়েছে সে নিজের নামে। ঐ বস্তী-অঞ্চলে— যেখানে আরও অনেক হালুইকরের দল আছে— যারা হারাণের প্রতিদ্বন্দী বৈ কিছুই নয়। সেই ভাড়া-ঘরে দড়ির খাটিয়া আছে হারাণের। ছারপোকায় ভর্ত্তি, তা হোক।

সেই খাটিয়ায় হারাণ বসে। দলের মধ্যে দু'একজন যারা পুরাণো লোক, তাদের কেউ কেউ বসতে পায় ঐ খাটিয়ায়, হারাণের আশপাশে। এক হুঁকোয় তামাক খায় তারা সকলে। দলের মধ্যে যারা নবাগত, যারা সবে শিখছে, হাত পাকাচ্ছে—তারা বসে মাটিতে। খাটিয়ার আশপাশে।

হারাণই দলের চাঁই। সে খাটিয়ার মধ্যিখানে বসে। মন ভাল থাকলে, বারোয়ারী হুঁকো ছেড়ে শুধু সে নিজে একা সিগারেট ধরায়। কাকেও দেয়না। হারাণের খাটিয়ার ময়লা তোষকের তলায় থাকে ক্যাপষ্টান সিগারেটের একটি দুমড়ানো প্যাকেট। কত বড় বড় ঘরের যজমানেরা

আসে কত সময়ে। কত বড়লোক বাবুরা আসেন কাজে কর্মে খোঁজ দিতে। হারাণের সব বড়লোক বাবু খদ্দেররা আসেন বাসন চাইতে, যাগযজ্ঞে।

সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরতে হয় তখন হারাণকে! তাঁরা খান আর না খান, তবুও দেখাতে হয় কতদিনের মিহানো সিগারেট।

দলপতি পান চেয়েছে। পান সাজতে ব'সে যায় বলরাম।

—হাত চালাও ভাই সব। রাত দশটার মধ্যে ফিনিশ দেবো কথা দিয়েছি। হারাণ কথা বলে কিমার কড়ায় খুন্তী খেলাতে খেলাতে। হঠাৎ কণ্ঠস্বর নীচু ক'রে চাপা স্বরে বললে,—আজ আবার বাবুরা সব বোতল চালাবেন! কার মেজাজ কখন কেমন থাকে বলা যায় না!

—বোতলের সঙ্গে সঙ্গে বাঈনাচ!

বলরাম কথা বললে, পানে চুণ মাখাতে মাখাতে।

ওয়াইন চেম্বারে সোডার বোতল খালি হ'তে থাকে।

শূন্য বোতল জড় হয় অনেকগুলো! ঘরের মেঝেয় বোতলের মুখের টিনের চাকতি আর ছিপি ছড়াছড়ি হ'তে থাকে। ঘরের এক কোণে কাঁচা বরফের চাঙড়, তাই ওয়াইন চেম্বার যেন অন্য ঘরের তুলনায় অনেক বেশী ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঘরের ভারপ্রাপ্ত রতনদা যেন হিমসিম খেতে থাকেন। বরফের বস্তায় আছে কয়েকটি বোতল। ঠাণ্ডা হচ্ছে।

এক এক সময়ে এক এক রকমের চাহিদা মেটাতে হয়।

বাবুদের একেক জন একেক ধরনের পানীয় চেয়ে পাঠান। হুইস্কির সঙ্গে সোডা, ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে জল, রামের সঙ্গে মিষ্টি-লেমোনেড মেশাতে মেশাতে জান যেন বেরিয়ে যায় রতনদার! কেউ আবার ধীরে ধীরে স্বল্

খাচ্ছেন, কেউ বা একের পর এক টল্ খেয়ে চলেছেন। কাঁচের গেলাশ আর বোতল—কত সাবধানে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়! সোডার বোতলের মুখের চাকতি খুলতে হয় গণ্ডায় গণ্ডায়।

সবই করেন রতনদা। আর কারও হাত দেওয়ার অনুমতি নাই। তাই আগাগোড়া তিনিই যা কিছু করেন। আর মধ্যে মধ্যে ফাঁক পেয়ে নিজের গেলাসটি মুখে তুলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক-আধ চুমুক খেয়ে নেন। ধীরে সুস্থে একটু একটু খেতে পারলে না কি নেশাটি অনেকক্ষণ থাকে। পানের সুখানন্দ উপভোগ করা যায়।

—মদ কখনও ঢোঁক ঢোঁক করে গিলতে নেই!

ঘরে যিনি ছিলেন তাঁর উদ্দেশে বললেন রতনদা। কথার শেষে নিজের পাত্রটি মুখে তুললেন। এক চুমুক খেলেন কি খেলেন না।

ঘরে ছিলেন চন্দ্রমোহন। জলসা থেকে উঠে এসেছিলেন।

বিশেষ একটি গেলাস তৈরী করাতে এসেছেন। বেয়ারাগুলোকে বললে যে তারা বোঝে না। এক নাম বলতে অন্য নাম বলে দেয়। এক চাইলে আরেক এনে দেয়। মেজাজ বিগড়ে যায় তৎক্ষণাৎ। মাথাও ঠিক রাখা যায় না।

চন্দ্রমোহন বললেন,—আমার আবার ঠিক উল্টো! প্রথম চোটে পর পর কয়েকটা টল্ পেগ না খেলে ফাউনডেশন্ই তৈরী হয় না। আমার ভিৎ তৈরী করতেই লাগে পেগ পাঁচ ছয়। তারপর ধীরে ধীরে এক একটা খাবো। স্লোলি স্লোলি।

বোতল থেকে গেলাশে পানীয় ঢালতে ঢালতে রতনদা বললেন,—হাফ্ সোডা আর হাফ্ জিন দেবো?

—না রতনদা। জিন্ আর হুইস্কি দাও, ওয়ান ফোর্থ সোডা।

—হোয়াইট লেবেল না রেড লেবেল দেবো বড়দা? নিজের গেলাশ

নামিয়ে রেখে জামার আস্তিনে ঠোঁট মুছে রতনদা বললেন,—হোয়াইট লেবেলের বোতল ক'টা শেষ হয়ে যাক্ না আগে। তারপর না হয় রেড লেবেল খোলা যাবে, কি বল?

চন্দ্রমোহনের কপালে রেখা ফুটলো। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন তিনি। বললেন,—তা, তুমি যখন বলছো তাই দাও।

—জিন্‌টা নাই বা আর খেলে! একরকমই খাও না। যে কোন এক রকম খাওয়াই ভাল। চেঞ্জ করা খুব খারাপ। তাতে ব্যাড্ এফেক্ট হয়।

কথা বলতে বলতে রতনদা হোয়াইট লেবেলের একটি বোতল বাম হাতের দু'আঙুলে ধরে তুলে ফেললেন। তারপর বোতলটিকে শূন্যে ছেড়ে দিয়ে পলকের মধ্যে ডান হাতে লুফে নিলেন।

চন্দ্রমোহন বললেন, একটি চোখ ঈষৎ বন্ধ করে বললেন,—জিন্ হুইস্কি কম্‌বাইন্‌ড্ না হ'লে আমি কিছু বুঝতেই পারিনা, এমনি অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে বলেন,- আমরা খাচ্ছি যে আজ নয়। বিশ বছর বয়েসে আরম্ভ করেছি, আর আজ আমার এজ্ নিয়ারলি ফিপ্‌টি টু। বাহান্নো। আমরা একেবারে যাকে বলে তোমার ভেটারেন।

রতনদা হুইস্কির গেলাশে জিন ঢালতে ঢালতে বলেন,—তা কি আমি জানি না বড়দা? আমরা যে সকলে এক সঙ্গেই শুরু করেছি। আমিও প্রথম যখন খাই তখন আমারও বয়েস আর কত হবে, এই বছর পনেরো।

—তা যদি বল' রতনদা, মদেই আমাদের জন্ম। মুখ ফসকে যেন কথাগুলি বলে ফেলেন চন্দ্রমোহন। বলেন,—মদ আমরা তিন চার পুরুষে খাচ্ছি। বাপ পিতামো যে নেশা—

পোকায়-কাটা চাপকান পরা একজন বেয়ারা ঘরে ঢোকে। বলে, —রতনবাবু, চটপট আট গেলাশ হুইস্কি, সেজবাবুর বন্ধুরা চাইছেন।

—সেজবাবুর বন্ধুরা চাইছেন? শুধোলেন রতনদা। বললেন,—ডাকো সেজবাবুকে, তিনি এসে না বললে আমি আর এক গেলাশও দেবো না। কথা বলতে বলতে হাতের তৈরী গেলাশ এগিয়ে ধরলেন চন্দ্রমোহনের সমুখে।

চন্দ্রমোহন বললেন, গেলাশটি হাতিয়ে নিয়ে বলেন,—কীপ কোয়ায়েট, ব্লাডি ফুল।

বেয়ারা ঘরের মেঝেয় চোখ নামিয়ে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেজবাবুর কাছে চললো।

রতনদা বললেন,—ড্রিঙ্ক্ যত স্লো করতে পারবে ড্রিঙ্কের তত মজা পাবে। তাড়াহুড়ো ক'রে গাঁজা খেতে হয়, পর পর না টানলে নেশা হয় না। মদ কিন্তু তা নয়।

হাতের টাটকা গেলাশে ওষ্ঠ স্পর্শ করলো।

যেন তৃষাতুর চন্দ্রমোহন, বহু প্রতীক্ষার পর এক পাত্র জল পেয়েছেন। বেশ খানিকটা জল পানের পর মুখ চুকিয়ে বলেন,—দ্যাট্ আই নো রতনদা, স্লো এণ্ড স্টেডি উইনস্ দি রেশ্। কিন্তু কি করবো বল ভাই, ঢুকুঢুকু একটু একটু আমার আদপেই চলেনা। অভ্যেসের দোষ আর কি!

—মদ ঢুকুঢুকুই খেতে হয়। কথা ধরলেন রতনদা। বললেন,—নেহাৎ ক্রিষ্ট্‌মাস্ আর পয়লা জানুয়ারী ছাড়া ভাল ইউরোপীয়নরা কোন দিন মাতাল হয় না। শুধু আমারাইতো আর হুইস্কি জিন্ খাইনা, ওরাও প্রচুর খায়।

—হাসালে রতনদা। মুখ থেকে গেলাশ নামিয়ে বলেন চন্দ্রমোহন। বলেন,—ইউরোপীয়নরাই তো হুইস্কি জিনের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমরা শিখেছি কাদের কাছে?

রতনদা ঈষৎ হেসে বলেন,—দুঃখের বিষয়, ওরা মদ খায়, খেয়ে সারাটা জীবন ভোগ করে, আর আমরা? মদ ধরতে না ধরতে মদেই আমাদের খেয়ে ফেলে। আমাদের দেশ না-শীত না-উষ্ণ দেশ, এদেশে দিন নেই রাত্তির নেই, এ্যাল্‌কোহল সহ্য হয় কখনও? মরেও তাই লীভার কাটিয়ে!

—যা বলেছো রতনদা! আমিও কতদিন একথা ভেবেছি। কত দিন মদ খেতে খেতে শুধু আমার এই কথাটাই মনে পড়েছে। কিন্তু—

কথার শেষে আবার গেলাশ তুললেন চন্দ্রমোহন। মুখে ঠেকালেন।

রতনদা বললেন,—ওরা মদ খায়, স্বীকার করছি প্রচুর মদ খায়, ওদের মত খেতে গেলে আমাদের দু'দিনে জিব বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু ওরা মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কি খায়! শাক, শব্জী, মাছ, মাংস, ডিম পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খায়। আর আমরা? আমরা দু' পাত্তর টানলে বড় জোর একটু চাট খাই।

—তা হ'লে কি হ'ল রতনদা? আমরা চাটি আর ওরা খায়?

কথাগুলি শেষ হওয়ার সঙ্গে চন্দ্রমোহন অট্টহাসি শুরু করলেন। তাঁর আপাদমস্তক যেন হাসতে লাগলো। সে কি প্রচণ্ড অট্টহাসি!

—যাও, তোমার নেশা ধ'রে গেছে বড়দা।

রতনদা তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে চন্দ্রমোহনের চোখ দেখে বললেন। তাঁর চোখ দেখে আর হাসির অস্বাভাবিক ধরণ শুনে।

একটি অর্গলহীন জানলা হঠাৎ খুলে গেল সশব্দে। হঠাৎ হাওয়ায়।

বাইরে কাল-বৈশাখীর মত ক্ষেপা হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে সেই চন্দনঝিলের ওপার থেকে হিম-হাওয়ার তরঙ্গ আসছে আর ঘিরে ঘিরে

ধরছে যেন চন্দনধামকে। গৃহের প্রাঙ্গনের গাছ-গাছড়া দুলে উঠছে। হাজার বাহু মেলছে যেন তারা, শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করছে।

ওয়াইন-চেম্বার কত দিন পরে খোলা হয়েছে তার ঠিক নেই।

ঘরের দরজার ভেতরকার অর্গল নেই, জানলায় নেই ছিটকিনি, পাল্লাগুলোয় উই ধরে ধরে যক্ষারোগীর ফুসফুসের মত ঝাঁজরা হয়ে গেছে। ক্যাবিনেটও তথৈবচ। ঘরের এক কোণে শূন্য বোতলের স্তূপ। কবেকার কে জানে! কিছু কাঁচের গেলাশ। ফাট-ধরা, ভাঙাচোরা।

ফেলে-আসা দিনগুলির কত স্বপ্ন যেন এখনও জেগে আছে ঐ কাঁচের গেলাশ-বোতলে। ঠুনকো কাঁচের নগণ্য পুরানো বোতল, আর গেলাশ, —কত মোহনীয় স্বপ্ন না জানি সৃষ্টি ক'রেছিল, রাতের পর রাত। কত মায়া আর কত মোহ। কত উদ্দাম উত্তেজনা! রোমাঞ্চ!

—ঠিক বলেছো রতনদা। বললেন চন্দ্রমোহন। গেলাশের অবশিষ্ট এক চুমুকে শেষ করে বললেন।—আমার নেশা ধ'রে গেছে, ঠিক বলেছো তুমি। আর এক পাত্র আমাকে পাঠাও।

হাসতে হাসতে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আসরে তখন গান শুরু হয়েছে। ধীর মন্থর গতিতে আলাপ চলেছে। কি সুর বোঝা যায় না।

চন্দ্রমোহন ফরাসের মধ্যিখানে বসতে বসতে দেখলেন ইদিক সিদিক। দেখলেন, কে কেমন আছে; কার কেমন অবস্থা। গানের আলাপ ছাড়া একটি চাপা গুঞ্জনের শব্দ পাওরা যায় জলসায়। চন্দ্রমোহন ঘরে আসতেই থেমে যায় গুঞ্জরণ। বাবুদের বন্ধুবান্ধবদের মনের কথার আদান প্রদানে বিরতি পড়ে। যে যার মুখ বন্ধ করেন।

আসরের মধ্যমণি চন্দ্রমোহন! তিনি আসন গ্রহণ করতে না করতে

কেউ কেউ তাঁর কাছে তাকিয়া ঠেলে দেয়। কেউ এগিয়ে ধরে সিগারেটের টিন। চন্দ্রমোহন সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন,—গানের পালা কখন চুকবে? বাঈনাচ শুরু হোক না।

—শুনছি রতে বারোটায় নাচ শুরু হবে। ততক্ষণ গান-বাজনা চলবে।

চন্দ্রমোহনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কথাগুলি চন্দ্রমোহনের কাণে কাণে বর্ষণ করলেন।

—তাই না কি? রাত বারোটায় বাঈনাচ?

—হ্যাঁ, তার আগে জমবে না নাচ। আজকে যে হোল্ নাইট্ পার্ফর্মেন্স!

—বাঈজী দু'জনকে দেখেছি, যাকে বলে তোমার খুপ্‌সুরৎ—

চন্দ্রমোহনের কথা থেমে গেল মধ্যপথে। বন্ধু তাঁর মুখে দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাটি ধরলেন। সিগারেটের মুখে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

হারমণিয়ামে আলাপ চলতে থাকে এক নাগাড়ে।

সঙ্গে তানপুরার সশব্দ ঝঙ্কার। আসল গান ধরলে তবলা ধরা হবে। তবলচি ব'সে থাকে গালে হাত দিয়ে!

—বেশী খেও না। বুঝেসুঝে খেও। পেঠের ব্যথাটা আবার যেন না চাগাড় দিয়ে ওঠে।

বন্ধু বন্ধুর কাজ করেন। নকল শাসনের সুরে বললেন চন্দ্রমোহনের কানে। চুপি চুপি বললেন।

বড়বাবু কথাগুলি শুনে মৃদু মৃদু হাসলেন।

সিগারেটে পর পর কয়েকটি টান দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, —এরই মধ্যে তিনটে টল্ হয়ে গেছে? এখনও যেন বুঝতেই পারছি না যে কিছু খেয়েছি।

—সে কি কথা চন্দর! আমি তো দু'টো গেলাশ মাত্র হুইস্কি খেয়েছি।

বন্ধুটি চুপি চুপি কথা বলেন। বলেন,—দু' গেলাস খেয়েই চোখে লাল-নীল দেখছি।

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন চন্দ্রমোহন। অট্টহাসির মত হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—তাই না কি? তা হ'লে আর এক গ্লাস দিক্! এ্যাও বেয়ারা ইধার লে আও।

বেয়ারার হাতে ট্রে। সারি সারি গেলাশ সাজানো ট্রে।

যার পাত্র শূন্য হয়ে পড়ে তার সমুখে ট্রে ধরে বেয়ারা। শূন্য রেখে পূর্ণ নাও। বেয়ারাটি কাছে আসতেই চন্দ্রমোহন নিজেই একটি গেলাস তুলে নিয়ে ধরলেন বন্ধুর সামনে।

—উপরি উপরি আমি খেতে পারি না। হবে'খন খানিক পরে।

—তা কখনও হয়! চন্দ্রমোহন বলেন,—ধর' ধর'। বেশী আর বিধবাপনা দেখাতে হবে না!

অগত্যা বন্ধু কি আর করেন। তিনি অনোন্যাপায় হয়ে গেলাশটি স্বহস্তে ধারণ করলেন। যেন কত নিশ্চিন্ত হ'লেন চন্দ্রমোহন। তৃপ্তির হাসি ফুটলো ধোঁয়াভরা মুখে।

গায়ক গান ধরলো:

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন—

সঙ্গে সঙ্গে তারিফের সুরে বাহবা বাহবা ধ্বনি উঠলো নাচঘরে। চন্দ্রমোহন বললেন, বেশ সজোর কণ্ঠে,—আহা—হা—হা! সুরটা কি সুর হে?

গায়কের আশপাশে উগ্র সঙ্গীতরসিকরা ঘিরে বসেছেন।

গানের সুর যেন তাঁরা বাতাসে ভাসতে দেবেন না কোন মতেই। নিজেরাই পুরাপুরি পান করবেন সঙ্গীতসুধা। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন,—সুর ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

গায়ক দ্বিতীয় পঙক্তি ধরলেন ঃ

প্রেম ফাঁসি দিয়ে বধিলে জীবন ॥

গান শুরু হওয়ার একই মুহূর্তে তবলা ধরলে তবলচি। সুর-বাঁধা তৈরী তবলার আওয়াজে নাচ-ঘর যেন গমগমিয়ে উঠলো।

গানের সুরে চাপা প'ড়ে যায় নাচঘরের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

যারা ছিল অন্য-মনে, আলাপচারীতে রত ছিল—তারা যেন সকলে একে একে নীরব হয়ে যায়। সুরেল কণ্ঠ গায়কের, অন্তরের দরদ মেশানো। গানের সুর শুধু নাচঘরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ঘরের বাইরে স্তব্ধ রাত্রি, কালো আঁচল বিছিয়ে ঢেকে দিয়েছে চন্দনপুরকে। এলোমেলা হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। চন্দনঝিলের অপর তীরের বন-বাদাড় থেকে যেন জোরালো নিশ্বাসের মত সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়ার ঝড় আসছে চন্দনধামকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে। অদৃশ্য বাতাসের সঙ্গে যেন সুরের মিতালী—নাচ ঘরের গান কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

কেউ বললে,—বহুৎ আচ্ছা ভাই!

কেউ বলে,—আহা, আহা!

আরও দুই পঙক্তি গাইতে থাকে গায়ক ঃ

দেখা হ'ল হ'ল ভাল, দু' দিনে সাধ ফুরাইল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥

গানের সুরে না কি আছে সম্মোহন। ঠিক ঠিক যদি গাইতে পারে কেউ, গান গেয়ে গেয়ে নাকি ভুলিয়ে দেওয়া যায় পৃথিবীর দুঃখ। হৃদয়ের অতি তীব্র ও অতি কোমল ভাব শুধু ভাষায় ফোটে না, যে জন্য রাগ রাগিনীর সৃষ্টি। বাক্য সীমাবদ্ধ, সুর অসীম। ভাবে কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা! গানের সুর কত কোমল, কত মধুর, কত তীব্র, কত সূক্ষ্ম, কত মর্ম্মস্পর্শী! সহস্রতন্ত্রী হৃদয়বীণার ঝঙ্কারে কত শত সুরতরঙ্গ!

নাচ ঘরের সমবেত শ্রোতাদের কে যেন সম্মোহিত ক'রে দেয় !

শুধু চন্দনধামের অন্দরমহলে বিষ ছড়িয়ে দেয় সুরের লহরী।

অন্তঃপুরবাসিনীদের কারও কারও কাণে যেন বিষ ছড়াতে থাকে ! গান কিংবা বাদ্যযন্ত্রের ভেসে-আসা সুর শুনলে ব্যথা লাগে মনে। বুকে যেন ঘন ঘন হাতুড়ীর ঘা পড়তে থাকে ! মাথা ঝিম ঝিম করে। বিরক্তি আসে মনে।

সুরের তরঙ্গ যেন কুহকিনীর মতই ভয়াল ভয়ঙ্কর। নাচ ঘরের গান-বাজনা শুনলে অন্দরের কেউ কেউ ভয়ে যেন সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে ওঠেন। নিজেদের ভাগ্যকে দোষ দেন।

অনঙ্গমোহনের ঘরের রেডিও, যত রাত হ'তে থাকে ততই যেন বিব্রত ক'রে তোলে অন্দরমহলকে। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না কি যত বিদেশী ষ্টেশন চালু হ'তে থাকে। অনঙ্গমোহনও রেডিওর কাঁটা ঘোরাতে থাকেন। বিবিসি ভাল না লাগলে, ধরেন হয়তো ফিলাডেলফিয়া বেতার-কেন্দ্র। সেখানে যদি শুধু নিরস বক্তিমা চলতে থাকে, তখন ধরেন ড্যাভেনট্রি কিংবা সীড্‌নী ষ্টেশন।

যেখানে গান কিংবা বাজনা চলে দেখে দেখে সেই মীটারটিতে কাঁটা থামিয়ে দেন।

শ্যামাপদ এ্যালমুনিয়ামের হাঁড়ীতে ডালের ফোড়ং ছাড়তেই চিড়বিড়িয়ে উঠলো হাঁড়ী। হাঁচতে শুরু করলো শ্যামাপদ। তাড়াতাড়ি সিদ্ধ ডাল ঢেলে হাঁড়ীতে ঢালতে ঢালতে বললে,—হুজুর, রাঙাবৌদির ঘরে লেগে গেছে।

রেডিও চলছে ঘরে। খুব আস্তে আস্তে।

তবুও ঠিক ঠিক শুনতে পেলেন না অনঙ্গমোহন। বললেন,—কি বললে শ্যাম? দাদাবাবু এসেছে?

—না হুজুর। আমাদের রাঙাবৌদির ঘরে খণ্ড-প্রলয় হচ্ছে শুনছি।

হাঁড়ীতে ঝাঁজরি ঘোরাতে ঘোরাতে কথা বলে শ্যামাপদ। কথার শেষে আরেকবার হাঁচলো।

খানিক আগে যে-ঘরে হাসি ছিল, এই কিছুক্ষণের মধ্যে সে-ঘরে তুলকালাম কাণ্ড চলতে থাকে। খানিক আগেই দেখেছিল শ্যামাপদ, নিজের চোখে দেখেছিল। রাঙাবাবুর খোলা দরজা আর জানলা থেকে ঘরের ভেতরটায় চোখ পড়তেই দেখেছিল রাঙাবৌদিকে—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি চুল বাঁধছেন। অসাবধানে তাঁর উর্দ্ধবসন খ'সে পড়েছে মেঝেয়। চুরিয়ে দেখতে দেখতে পাছে কেউ দেখতে পায় সেই ভয়ে শ্যামাপদ বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি তখন। যদি কেউ দেখে, কারও যদি চোখ পড়ে!

হন্তদন্ত হয়ে রেডিও ছেড়ে ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে পড়লেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—এত চেঁচামেচি কেন? কি হয়েছে কি?

শ্যামাপদ হাঁড়ীর মুখে চাপা দিয়ে বললে,—শুনুন না হুজুর। স্বকর্ণেই শুনতে পাবেন। রাঙাবাবু চটলে তো আর রক্ষে নেই?

—রাগারাগির কারণ কি?

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কথা বললেন অনঙ্গমোহন।

—শুনুন না হুজুর।

কথা বলতে বলতে শ্যাম আবার পাম্প করে ষ্টোভে। উপর্য্যুপরি পাম্প ক'রে যায়।

রাঙাবাবুর ঘরের সাজানো-গোছানো চেহারা অন্য আকৃতি ধরে। সহসা দেখলে মনে হয় কে বা কারা যেন তছনছ ক'রে দিয়েছে

ঘরের সকল কিছু। মধ্যে মধ্যে সজোরে চীৎকার করছেন রাঙাবাবু,—এখনও বলছি, চাবি দেবে কিনা বল!

রাঙাবৌদি, কাঠের পুতুলের মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অকথা কুকথা শুনেছেন, তাই চোখ বেয়ে তাঁর জলের ধারা নেমেছে। পাষাণ মূর্ত্তির মত তিনি নির্ব্বিকার হয়ে থাকেন। চোখে স্থির দৃষ্টি ফোটে।

রাঙাবাবু আবার বললেন,—চাবির গোছাটা দাও বলছি এখনও!

আমি জানি না কোথায় চাবি আছে। রাঙাবৌদি কথা বললেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে।

—তোমার চাবি, কোথায় আছে, তুমি জানো না! বিশ্বাস করতে হবে আমাকে!

রাঙাবাবুর কণ্ঠস্বর যেন সপ্তমে উঠলো। চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি বললেন।

—হারিয়ে গেছে যে! কি করবো আমি?

ভিজে ভিজে সুর রাঙাবৌদির কথায়। চোখের প্রান্তে টলমল জলবিন্দু। পা দুটো যেন তাঁর ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ক্রোধ আর উত্তেজনায়। যতবার চোখে পড়ছে, তাঁর সাজানো-গোছানো ঘরের বিপর্য্যস্ত রূপ, তত যেন জল ঝরছে চোখ ফেটে।

রাঙাবাবু চাবির গোছা খুঁজেছেন। বিছানার বালিস, তোষক আর গদী টেনে টেনে মেঝেয় ফেলেছেন। আনলার কাপড়-চোপড় ফেলে ছড়িয়েছেন। বাক্স আর সুটকেশ খুলে খুলে বের করেছেন যা পেরেছেন। কিন্তু চাবির গোছা মেলেনি, শুধু পণ্ডশ্রম হয়েছে।

চাবির গোছায় আলমারী আর দেরাজের চাবি আছে। রাঙাবাবু আলমারী খুলতে চান। আলমারীতে কি আছে কে জানে!

রাঙাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন সজোরে,—এটা তোমার বাপের জমিদারী, তা মনে ক'র না! ভাল চাও তো চাবি বের করে দাও মিত্রা!

রাঙা অধর থরো থরো কেঁপে উঠলো রাঙাবৌদির। লজ্জা আর অপমানে সর্ব্বাঙ্গ যেন তাঁর জ্বলতে থাকে। রাঙাবৌদির পুরা নাম সুমিত্রা। তিনি বললেন,—আমি জানি না কোথায় আছে। যা খুশী করতে পারো তুমি!

আরও যেন চ'টে উঠলেন রাঙাবাবু। আগুনে যেন ঘিয়ের ছিটা পড়লো! বললেন,—তবে রে পোড়ারমুখী! দেখবি তবে?

—কি আর দেখাবে তুমি! বললেন সুমিত্রা। বললেন,—তোমায় মুরদ কত তা আমার খুব জানা আছে! অভদ্র, ছোটলোক তুমি একটা!

—মুখ সামলে কথা বলবে মিত্রা, এখনও আমি বলছি!

—তুমিও মুখ সামলে কথা কইবে।

—চাবি দাও বলছি এখনও।

—দেবো না, দেবো না, দেবো না। যা পারো কর' তুমি।

একেবারে বেপরোয়ার মত বলেন সুমিত্রা দেবী। নাচার হয়ে বলেন।

—দেবে নাতো? রাঙাবাবু কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান ধীরে ধীরে।

—না দেবো না।

সুমিত্রার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গালে পড়লো একটি সজোর চড়। চপেটাঘাতের শব্দ ছড়ালো অন্দরে। আচমকা মার খেয়েছেন সুমিত্রা। বড় বেশী জোরে মেরেছেন রাঙাবাবু। সুমিত্রা যেন চোখে অন্ধকার দেখতে থাকলেন।

নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে আঁচল তুললেন। চোখ

হু'টি যেন কিসের অসহ্য ব্যথায় সজল হয়ে উঠেছিল। সুমিত্রার রঙ ফর্সা। তাই হয়তো লাল হয়ে উঠলো চড়-খাওয়া গাল। চোখে আর মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

—চাবি না দিলে আলমারী ভেঙ্গে খুলবো আমি, তাও বলে দিচ্ছি।

রাঙাবাবুর উচ্চকণ্ঠে অন্দরমহল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর কণ্ঠ মিলাতে না মিলাতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুমিত্রা দেবী যেন আর নীরবে কাঁদতে পারেন না, গুমরে গুমরে কাঁদেন। অনেক অকথা কুকথা অনেক্ষণ ধরে বলে চলেছিলেন রাঙাবাবু। বাক্যবাণে যেন জর্জ্জরিত হয়ে গেছেন সুমিত্রা। সহের সীমা ছাড়িয়ে যায় মার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কেমন যেন এক করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—যা খুশী তুমি করতে পারো, আমি চাবি দেবো না, দেবো না, দেবো না।

রাঙাবাবু রাগে যেন কাঁপতে থাকেন। ক্রোধের আতিশয্যে সুমিত্রার ঘারে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন,—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! দূর হয়ে যাও ঘর থেকে হারামজাদী!

ঘরের এক কোনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল সুমিত্রার এক মাত্র কন্যা—সুচিত্রা। ভয়ে যেন সেও কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মাকে আছড়ে পড়তে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। নাবালিকা কিশোরী, সে, অত শত বোঝে না। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। কান্না সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাবার ভয়ে।

সুমিত্রা মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। শরীরের কোথায় যেন বিশেষ আঘাত পেয়েছেন তিনি, ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর হাতের কনুই দেওয়ালের সঙ্গে ঘষে গেছে সহসা। নারীদেহ কোমল, তাই হয়তো ঈষৎ রক্ত ঝরতে থাকে তাঁর কনুই থেকে। সুচিত্রা দেবী স্বামীকে প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলেন যে, স্বামী তাঁর কি এক বিশ্রী পানীয়

পান করেছেন। মদ খাওয়া উগ্র মূর্তি রাঙাবাবুর। তাঁর শ্বাসে দুর্গন্ধ ছড়ায় ঘরে।

অনঙ্গমোহন তাঁর দালানে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে ওঠেন। কান্নার করুণ সুর, কথা কাটাকাটি—সবই তাঁর কানে পৌছয়। তিনি বললেন,—শ্যাম, বৌটাকে মেরে ফেললে না কি? দেখে এসো না! বৌটা প'ড়ে প'ড়ে মার খাবে আর আমরা কি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো!

দুঃখের হাসি হাসলো শ্যামাপদ। ষ্টোভের পাম্প করার কাজে ক্ষান্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—উপায় কি হুজুর? কে বলতে যাবে বলুন? শেষে কি বলতে গিয়ে মারধর খাবে!

—তা বটে। বললেন অনঙ্গমোহন।—হোয়াট ননসেন্স্! এই লাঠালাঠির অর্থটা কি?

হাতের কাজে ঘেমে উঠেছিল শ্যামাপদ।

চটপট কাজ সারতে হবে। ষ্টোভটা যাতে নিছক জ্বলতে না থাকে, সেদিকেও চোখ আছে। মিছামিছি কেরাশিন পুড়বে! ডালের হাঁড়ী ফুটতে দিয়ে উঠে পড়ে শ্যাম। ঘেমে উঠেছে সে। এতকালের পুরাণো ষ্টোভ, পাম্প করতে করতে জান হিমসিমিয়ে গেছে যেন।

শ্যামাপদ বললে,—সদরে যে হুজুর সমন এসেছে!

—সমন? Summons! অনঙ্গমোহন আঁৎকে উঠলেন। বললেন,—কার নামে?

—রাঙাবাবুর নামে।

শ্যামাপদ কথা বলতে বলতে রাঙাবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। এতক্ষণ কানে শুনছিল, দেখতে যায় বারেকে। দূর থেকে চোরা-দৃষ্টিতে

দেখবে, কারও নজরে পড়বে না। এক নজরে দেখে বুঝে নেবে পরিস্থিতি। বেশীক্ষণ দেখতে হবে না।

এমন এমন ঘরোয়া দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে শ্যামাপদর জীবন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। এখন আর তাই দেখেও বিকার আসে না মনে। শুধু আশঙ্কা হয়, রক্তারক্তি থেকে খুনোখুনি না হয়!

অন্দরের ঘরে ঘরে ললনারা সজাগ হয়ে উঠেছেন। কেউ দরজায় আর কেউ জানলার পাল্লা খুলে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা কাটাকাটি চলছিল এতক্ষণ, তাই কেউ আর এতটা খেয়াল করেননি। ধাক্কাধাক্কি, মারাধরার শব্দ শুনতে পেয়ে কেউ যেন স্থির থাকতে পারলেন না।

বারবাড়ীতে সমন এসেছে। থানা থেকে সমন এসেছে।

আদালতের ডাক এসেছে। উপেক্ষা করলে, যার নামে সমন তার নামে ওয়ারেণ্ট জারী হয়ে যাবে। হাতে হাতকড়া বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে।

গানের জলসায় ব'সেছিলেন রাঙাবাবু। সমন আসবে তাতো আর জানতেন না। হুইস্কির নেশাটি যখন সবে মাত্র ধরেছে,সেই ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আদালতের পেয়াদা এসে হাজির। এক হাতে লাঠি, আরেক হাতে সমনের কাগজ। নাচঘরের আসরে তখন মাথাটি যেন কাটা গেছে রাঙাবাবুর। হুইস্কির গেলাশ রেখে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়েছেন। নেশা চ'টে গেছে।

অনেক ভেবে ভেবে বুদ্ধি ঠাউরেছিলেন রাঙাবাবু। পেয়াদাকে যদি দশ পনেরো দিয়ে আজকের মত ভাগিয়ে দিয়ে, দু'দিন পিছিয়ে দিতে পারা যায় সমনের ডাক! পেয়াদাকে শুধু রাজী করাতে পারলেই চলবে। পেয়াদা ফিরে গিয়ে বলবে আসামী পশ্চিমে হাওয়া খেতে গেছে। দু চার দিনের মধ্যেই ফিরবে। আসামী তো যা তা ছোটলোকের ঘরের মানুষ নয়, জমিদারবাবু।

অনঙ্গমোহন শুনে প্রথমে আঁৎকে উঠেছিলেন।

সমন এসেছে। এমনই ভয় পেয়েছিলেন, যেন কোন এক নিকটতমের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন অতর্কিতে। চিন্তার কারণ আছে তাঁর। মণিমোহন কলকাতার জুয়ার আড্ডায় ঘোরাঘুরি করে, চীনাপল্লীতে যাওয়া আসা করে। গড়ের মাঠে যায়। ফাটকা বাজারে ঘোরে।

কলকাতার চীনাবাজারে কত জুয়ার আড্ডা চালায় চীনা রমণী। মুখে মদির হাসি আর বুকের মধ্যে, গাউনের আড়ালে, শানানো ছুরি থাকে তাদের।

মণিমোহনের নামে যদি সমন আসতো, সেই ভয়ে না কি আঁৎকে উঠেছিলেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—রাঙাবাবুর নামে সমন এলো কেন শ্যাম? জানো না কি কিছু?

শ্যামাপদ দূর থেকে এক নজরে দেখে নিয়ে ফিরে এসে জবাব দেয়,—পাওনাদার হয়তো নালিস ঠুকে দিয়েছে। বাবুদের একোজনের পাওনাদার তো কম নয়।

অনঙ্গমোহন গলা কাঁপিয়ে বললেন,—সমন এসেছে, তা বৌ কি দোষ করলে? ও ব্যাচারী মার খায় কেন?

রাঙাবাবুর ঘরের কান্না তখন আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কোন কাকেও অহেতুক ধরে মারলে যেমন অসহায় স্বরে কান্না শোনা যায়, এ যেন সেই ধরনের কান্না।

সুমিত্রা দেবী সহায়হীনা। ঘরে কেউ আসে না বাধা দিতে, ঐ মারমুখ স্বামীকে। রাঙাবাবু নেশা করেছেন এখন, কে যাবে তাঁকে রুখতে!

সুমিত্রা চেঁচিয়ে উঠলেন কান্নার সুরে,—ডাকো আদালতের পেয়াদাকে, দেখে যাক এই রক্তপাত! সমন এসেছে, বেশ হয়েছে! ধরে নিয়ে যায় না কেন?

আরও যেন ক্ষেপিয়ে দিলেন স্বামীকে। রাঙাবাবু লাথি মারলেন আচমকা, মেঝেয় লুটিয়ে পড়া সুমিত্রার কাঁকালে। বেশ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন নিশ্চুপ, নিস্পন্দ হয়ে থাকলেন হঠাৎ আঘাতে। অনেক্ষণ পরে আবার সেই কান্নার গুমরানি শুরু হ'ল। সুমিত্রা দেবীর মুখ যেন নীল হয়ে গেছে। হাতের কনুই রক্তাক্ত। দুই গালে আঙুলের লম্বা লাল দাগ পড়েছে। রাঙাবাবুর হাতের মুঠোয় উঠে গেছে সুমিত্রা দেবীর মাথার কিছু কেশগুচ্ছ।

রাঙাবাবু বললেন,—চাবি দাও বলছি এখনও। আলমারী ভেঙ্গে ফেলবো আমি!

কথার প্রতিধ্বনি ওঠে অন্দরে। ঘরে ঘরে ললনারা চমকে চমকে উঠেন। কখন কার ভগ্যে কি আছে কেউ বলতে পারে না। এইতো সবে কলির সন্ধ্যা, এখনও সারা রাতটাই বাকী প'ড়ে আছে। বাবুরা যখন সুস্থ মস্তিস্কে থাকেন তখন এত ভয় আর ভাবনা থাকে না। সাদা চোখ থাকলে বাবুদের বুদ্ধিও সাদা থাকে। কিন্তু আজকের রাতে বাবুদের সকলেই প্রায় রঙীন জল পান করবেন। মাত্রা চাড়িয়ে পান করবেন যার যত খুশী। তারপর একেকজন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করবেন। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে না। আর তখন কার ঘরে যে কি অঘটন ঘটবে কে বলতে পারে!

ব্যথাহত সুমিত্রা অতি কষ্টে নিজেকে তুলে উঠে বসলেন, কাঁদতে কাঁদতে কোমল দেহ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। উর্দ্ধাঙ্গের বসন সামলাতে সামলাতে বললেন,—আলমারী ভেঙ্গে কি পাবে কি? কিছু কি রেখেছো! সবই যে ঘুচিয়েছো তুমি!

—তা জানি না, এখন আমাকে বাঁচতে হবে। বললেন রাঙাবাবু। আগের মত জোরালো স্বরে নয়, কিছু স্তিমিত কণ্ঠে। বললেন,—আমি

তো বেশী চাইছি না, পনেরো বিশ টাকা পেলেই চলবে। পেয়াদাকে আপাততঃ বিদেয় করতে পারলে মামলা আমি উইতড্র করিয়ে নেবো।

কাঁকালের লাথি খাওয়ার নতুন ব্যথায় কাতর হয়ে উঠেছেন সুমিত্রা। হঠাৎ আঘাত পেয়েছেন, বড় বেশী লেগেছে হয়তো। সারা দেহ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কাঁকাল কন কন করছে।

রাঙাবাবু এতক্ষণে রক্তের ধারা দেখতে পেয়েছেন সুমিত্রার এক বাহুতে। টাটকা লাল রক্তের রেখা। চোখ পড়তে ক্ষণেকের জন্য রাঙাবাবুর মন যেন হু হু করে ওঠে। বিবেক যেন দংশায়। রাঙাবাবু যেন বুঝতে পারেন যে, অন্যায় করেছেন। এতটা মেজাজ গরম না করলেও চলতো। মেয়েমানুষের গায়ে কি হাত তুলতে আছে! ঐ মার-খাওয়া, লুটিয়ে পড়া, ব্যথায় কাতর, রক্তাক্ত সুমিত্রার মত মেয়ের অঙ্গে কি হাত তুলতে আছে!

কত দিয়েছে সে! নিরাভরণা হয়ে সকল অলঙ্কার একে একে দিয়েছে। হাজত বাস থেকে বাঁচিয়েছে স্বামীকে।

রাঙাবাবুর কে আর আছে, যে বিপদের সময় এসে পাশে দাঁড়ায়!

কোন আত্মজন নয়। কোন বন্ধু-বান্ধব নয়। থাকেন শুধু সুমিত্রা দেবী। কত অন্যায় কুকার্য্য করেছেন রাঙাবাবু। কত বিপদে আপদে পড়েছেন! জেলবাস থেকে বেঁচে গেছেন কতবার! বাঁচিয়েছে যে সে ঐ সুমিত্রা।

রাঙাবাবু নেশাখোর, দুশ্চরিত্রের মানুষ। শুধু বদখেয়ালে আজ পর্য্যন্ত কত যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার হিসেব জানে না কেউ। উপভোগই তাঁর জীবনের ফিলজফি—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ প্রবচনটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চান। চরম অভাবের দিনেও ত্রিমকার-সাধনা করেন। বাঁধা দিয়ে আর ধার-দেনা চালিয়ে ফুর্ত্তি করেন।

যাদের পাওনা দেনা মেটাতে পারেন না, স্বদ গুনতে পারেন না যাদের দেওয়া টাকার, তাদের কেউ কেউ কখনও কখনও টাকা ফেরৎ পাওয়ার আশায় থেকে থেকে থানায় নালিশ করে। রাঙাবাবুর নাম-সই দেখিয়ে ডায়েরী লেখায়।

থানার অফিসার বিশ্বাস করতে চায় না ফরিয়াদী-পক্ষের বক্তব্য। অফিসার হয়তো বলেন,—রাঙাবাবু নাম-জাদা ঘরের লোক, তিনি এমন কাজ করেছেন! রাঙাবাবুরা সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের, এই সামান্য টাকা ফিরিয়ে দেন নি, এ কেমন কথা?

ফরিয়াদী-পক্ষ বলে,—মিথ্যে কখনও নালিশ চলে কারও নামে? বিশ্বাস না হয় এইতো দেখুন না হাতচিঠে রাঙাবাবুর নাম-সই। সই কি আর জাল করা যায়! না ভদ্রলোকে করে?

স্বমিত্রা দেবীকে সংসার করতে হয়। দশজনের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে হয়। সমাজের কাছে মুখ দেখাতে হয়। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হয়। রাঙাবাবু নেশা করতে পারেন, রাতের পর রাত অন্যত্র কাটাতে পারেন—তার জের স্বমিত্রাকেই সামলাতে হয়। লোকের মুখে চাপা দিতে হয়। গায়ের গয়না দিয়ে রাঙাবাবুর ধার-দেনা মেটাতে, জেলবাস থেকে বাঁচাতে হয়।

কিন্তু এখন প্রায় সবই ফুরিয়ে গেছে। ঘড়ার জল গড়াতে গড়াতে ঘড়া শূন্য হয়ে এসেছে।

তাজা লাল রক্ত দেখে মনটা কেন কে জানে ক্ষণেকের জন্য যেন হু হু ক'রে ওঠে রাঙাবাবুর। নেশার ঘোরে কি গর্হিত কাজই তিনি করলেন! বারেকের জন্য অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে থাকে বুকের ভেতরটা। ক্রোধ আর উত্তেজনার ঠকঠকিয়ে কাঁপছেন রাঙাবাবু। মনে অনুশোচনা জাগলেও শরীর এখনও উত্তেজিত। হাঁফাতে থাকেন তিনি. ঘন ঘন শ্বাস ফেলেন।

কিশোরী মেয়ে সুচিত্রা, সেও ভয়ে যেন সিঁটিয়ে যায়। গলা ছেড়ে কাঁদতে সাহস পায় না, বাবার ভয়ে। মুখে হাত চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

অসহ্য ব্যথা পান সুমিত্রা দেবী। শুধু কাঁকাল নয়, দেহের আরও কোথাও কোথাও যেন ভীষণ ব্যথা লাগে। এতক্ষণ তিনি যেন ছিলেন অন্য এক পৃথিবীতে; ভুলে গিয়েছিলেন চন্দনধামের অন্দরমহলের কুলবধূ তিনি। ব্যথার চেয়ে লজ্জায় যেন আরও কাতর হয়ে পড়লেন। কত কে শুনলো কে জানে! দূরে দাঁড়িয়ে, সুমিত্রার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে শুনলো হয়তো এই লজ্জাকর ঘটনা! শুনলো যত মুখোসপরা যাদেইজীর দল। শুনে কত খুশী হ'য়েছে অন্য অন্য সরিকরা! কত হাসাহাসি করলো তারা নিজেদের মধ্যে! এর চেয়ে স্বামী যদি তাঁকে একেবারে মেরেই ফেলতেন! দিনের আলো ফুটলে কোন লজ্জায় মুখ দেখাবেন ঘর থেকে বেরিয়ে?

—পনেরো বিশ টাকা? হঠাৎ কথা বললেন সুমিত্রা। অত্যন্ত মিহি কণ্ঠে। কষ্টকাতর সুরে। বললেন,—আগে যদি বলতে আমাকে! মিথ্যে মিথ্যে এই রক্তারক্তি করলে তুমি।

স্ত্রীর ভাব-পরিবর্তন দেখে রাঙাবাবুর চোখ দুটি যেন চিকচিকিয়ে উঠলো। তিনিও কেমন এক করুণ সুরে বললেন,—সদরের দরজায় সমন-হাতে পেয়াদা, তাইতো চাবির গোছাটা চাইছি! তুমি কিছুতেই যে দিলে না চাবি।

—চাবি তোমার হাতে কক্ষণও দেবো না আমি। এখনও নয়।

আবার সেই কাতর সুরে কথা বললেন সুমিত্রা। কথা বলতে বলতে আঁচলে মুখ ঢাকেন। চোখে আঁচল চেপে অশ্রুধারা রোধ করতে চান যেন। মুখ থেকে আচল সরিয়ে বললেন,—টাকা না চেয়ে তুমি যে কেবল চাবির গোছাই চেয়ে চললে! সোজাসুজি টাকা চাইলে আমি কি—

—জানো সুমিত্রা? কথা বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন রাঙাবাবু, বললেন,—মদ খেয়েছি কিনা, তাই মাথাটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেছে সমন আসতে শুনে। এখন আমাকে তুমি বাঁচাও, উদ্ধার কর'। তুমি ছাড়া কে আছে আমার? কত বিপদ থেকে কতবার তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়েছো!

—তুমি যদি বলতে টাকার দরকার, তা তো তুমি বললে না।

মুখ সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে বললেন সুমিত্রা দেবী। অতি কষ্টে কথা বললেন। কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছেন যেন এখনও। বললেন,—তোমার হাতে কখনও আমি চাবির গোছা তুলে দিতে পারি? তোমার এই নেশার মধ্যে?

—অন্যায় হয়ে গেছে সুমিত্রা। ক্ষমা কর'। আমাকে বাঁচাও। রাঙাবাবু কথা বলেন কাঁদো কাঁদো সুরে। বলেন,—ক্ষমা কর' সুমিত্রা, অন্ততঃ আজকের মত।

—টাকাতো নেই। যা আছে তাতে এক হপ্তার র‍্যাশনটা হ'তে পারে।

জলভরা চোখ তুলে বললেন সুমিত্রা দেবী। বললেন,—টাকা দশ বারো আছে।

—যা আছে তাইই দাও।

রাঙাবাবুর অসহায় কণ্ঠের অনুরোধ।

সুমিত্রা বলেন,—তারপর? তারপর যতদিন না মাস কাবার হচ্ছে, মহল থেকে টাকা না আসছে, উপোসে থাকতে পারবে তো? আমার এক ফোঁটা মেয়েটা না খেয়ে থাকবে? কাল রাত পোয়ালেই র‍্যাশন আনাতে হবে না?

—তা হ'লে উপায়? রাঙাবাবু শুধোলেন। সভয়ে।

ঘরের কড়িকাঠে চোখ তুললেন সুমিত্রা। সজল আঁখিতে তাঁর নৈরাশ্যের ছায়া ফুটে আছে। ঈষৎ কুঞ্চিত মুখে ব্যথার কাতরতা।

—তুমিই বল' উপায় কি। বিষণ্ণ সুরে বললেন সুমিত্রা। তাঁর পরনের জামার বোতাম খুলে গেছে না ছিঁড়ে গেছে টানা-হেঁচড়ায়। কথা বলতে বলতে তিনি জামা আঁটতে থাকেন। ব্লাউসের একটা দু'টো বোতাম ছিঁড়ে গেলেও আরও ক'টা থাকে।

—এত রাতে আমি কোত্থেকে টাকা জোগাড় করি!

রাঙাবাবু কথা বলতে বলতে ব'সে পড়লেন ঘাটের এক কিনারায়। হতাশ হয়ে যেন ব'সে পড়লেন!

—কার কাছে দেনা করেছিলে? শুধোলেন সুমিত্রা। বললেন,—কে নালিশ করলে?

—আর বল কেন! বললেন রাঙাবাবু। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন,—এক ব্যাটার ছেলে আছে, মাত্তর পঞ্চাশটা টাকার জন্যে না ব'লে ক'য়ে নালিশ ঠুকে দিয়েছে!

—ওগো সত্যি কথা বল'।

অনুরোধের কাতর সুরে সুমিত্রা বলেন।

—মাইরী বলছি, কোন শালা মিথ্যে কথা বলে! বললেন রাঙাবাবু। বললেন,—যেখান থেকে হোক টাকাটা শোধ দিয়ে দেখে নেবো না শূয়ারের বাচ্ছাকে! ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি শালা—

—ওগো, আমার কচি মেয়ে ঘরে রয়েছে, তুমি অমন অভদ্দর ভাষা আর বল' না।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন সুমিত্রা। শ্রাবণের আকাশের মত ধারা যেন থামে না। মেয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন,—চিত্রা, ঘর থেকে যাও! দেখে এসো বাইরের দালান থেকে, কারা দাঁড়িয়ে শুনছে। কে কে আছেন!

যত লজ্জা সুমিত্রার, ঐ অন্য সরিকদের কাছে। কি ভাবলো তারা!

স্বমিত্রার প্রতি তার স্বামীর এই নির্লজ্জ দুর্ব্যবহার দেখে কত হাসলো মনে মনে! তাদের পরচর্চ্চার খোরাক জুটলো একটা, যারা লুকিয়ে থেকে শুনছে কাণ খাড়া রেখে।

দিনের আলো ফুটলে, ঘর থেকে বেরিয়ে কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে স্বমিত্রা! গালের কালসিটের দাগ দেখাতে বেরুবে! কনুইয়ে ছ'ড়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে পাবে না কেউ ?

নীরব দু'জনে। রাঙাবাবু সিগারেটে টান দিয়ে যান। এতক্ষণের অনেক ক্রোধ আর অনেক উত্তেজনা প্রশমিত হয় যেন ধূম পানের সঙ্গে সঙ্গে। ঘন ঘন টান দিয়ে যান সিগারেটে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়েন।

এই নীরবতার মধ্যে, বহু দূর থেকে ভেসে-আসা গানের সুর, কাণে যেন বড় বেশী বাজতে থাকে। সেই সদরের নাচঘর থেকে, রাত্রির গভীর অন্ধকার ছিন্ন করতে করতে, কত প্রাচীর আর কত দেওয়াল ভেদ ক'রে ভেসে আসে সারেঙ্গীর কান্না!

একটি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্বমিত্রা। হঠাৎ কি যেন মনে পড়লো তাঁর। বললেন,—একখানা হাফ্-গিনি আছে। তাতে তোমার কাজ হবে না!

এক রাশি হাসি ফুটলো রাঙাবাবুর মুখে। প্রসন্ন হাসি। বললেন,—খুব হবে স্বমিত্রা, খুব কাজ হবে। ওঃফ্, বাঁচালে আমাকে। তুমি যে আমার লক্ষ্মী। তুমি আমার—

—থাক, ঢের হয়েছে।

অতি কষ্টে, নিজেকে টেনে টেনে, উঠলেন স্বমিত্রা। উঠে দাঁড়ালেন। কাঁকালের ব্যথাটা যেন চাগিয়ে উঠলো, মুখ বিকৃত করলেন। বললেন,—থাক্। আমি কেউ নই। আমি শুধু লাথি খেতেই আছি। কথা

বলতে বলতে এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললেন,—ঐ হাফ-গিনিখানা দিয়েই তুমি প্রথম মুখ দেখেছিলে চিত্রার!

—দাও। একখানা হাফ্-গিনি গেলে—

বলতে যেন আটকায় না রাঙাবাবুর। মরুর মাঝে বারিবিন্দু দেখেছেন তিনি। অথৈ-জল-সাগরের মাঝারে দেখেছেন খড় কুটো। নির্ম্মম নিরাশার মধ্যে দেখতে পেলেন আশার উজ্জ্বল আলো! সুমিত্রাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কত যে আশ্বস্ত হ'লেন কে বলবে! নিশ্চিন্তার শ্বাস ফেললেন তিনি। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম যেন আরামের টান দিলেন সিগারেটে।

—তুমি সদরে যাও। মিনতি মাখানো কথার সুর সুমিত্রার। বললেন,—তুমি সদরে যাও, চিত্রাকে দিয়ে গিনিখানা পাঠিয়ে দেবো আমি।

কথাগুলি শুনে মনে যেন ব্যথা পান রাঙাবাবু। বিপদে পড়েছেন, অগত্যা কি আর করবেন। খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। বলেন, —আমার সামনে আলমারী খুলতে চাও না তুমি ?

—না!

—আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না সুমিত্রা ?

—না!

—আমি তোমার স্বামী, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে ?

—হ্যাঁ!

—কেন তাই বল ?

—তুমি যে অবিশ্বাসের কাজ ক'রেছো। আমার অসাক্ষাতে আলমারী আর দেরাজ খুলে যখন যা মন চেয়েছে বের ক'রে নিয়েছো। আমার কত গয়না, কত দামী দামী সাড়ী, কত সৌখীন জিনিষ তুমি

ছাড়া আর তো কেউ নেয়নি! কথা বলতে বলতে কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বললেন কাঁপা কাঁপা স্বরে,—সে-সব নিয়ে কি যে ক'রেছো তুমিই জানো।

—আমার সংসারেই দিয়েছি। অভাবের দিনে, যখন কোথাও কিছু পাইনি, তখন তোমার মুখে হাসি ফোটাতে ও সমগুলো বিক্রী করতে হয়েছে।

—মহল থেকে তোমার ভাগে যে-টাকা আসে, তাতে আমার তো কোন দিন কোন অভাবই থাকেন। তুমি মিথ্যে কথা ব'লছো!

—আমি মিথ্যে ব'লবো?

—হ্যাঁ। তাই তোমার স্বভাব। কেমন যেন দীপ্তকণ্ঠে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিমর্ষ স্বরে সুমিত্রা বললেন,—যাকগে। আমার যা গেছে, চিরকালের মত ঘুচে গেছে তাদের আর ফিরে পাব না, তা আমি জানি।

—সুমিত্রা!

—যাকগে, মিথ্যে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি যাও, সদরে যাও। সমনের পেয়াদা তো আর তোমাদের জমিদারীর প্রজা নয় যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে! সদরে যাও না তুমি।

—বেশ, তা হলে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

কথার শেষে সিগারেটে শেষ-টান দিতে দিতে রাঙাবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এখন তিনি যেন অন্য এক মানুষ। শান্ত, স্তিমিত, সুস্থির ভদ্র জনের মত।

সুমিত্রা আর কোন কথা বলেন না। বলতে যেন ইচ্ছাও করে না তাঁর। কত সময়ে ঐ স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখতে ইচ্ছা করে না। মৌখিক কথাবার্ত্তাও কত দিন বন্ধ ক'রে দেন। সুমিত্রার কাছে রাঙাবাবু যেন

এক মূর্ত্তিমান গ্লানি— যাঁর লজ্জায় মুখখানি তাঁর দিনে দিনে পুড়ে গেছে একেবারে।

রাঙাবাবু নেশায় আসক্ত। মদ খেয়ে ফিরে এসে কি নির্লজ্জ কাণ্ডই না কত দিন করেছেন এক অন্দর লোকের সামনে। মাতলামি করতে করতে কত রাতে নির্ম্মম প্রহার করেছেন স্ত্রীকে! কত পাওনাদার রাঙাবাবুর! সুমিত্রা নিজের গায়ের অলঙ্কার দিয়ে দিয়ে :থানা থেকে পাওনাদারের নালিস মিটিয়ে দিয়েছেন। নির্ঘাৎ :জল থেকে বাঁচিয়েছেন স্বামীকে!

তার ওপর রাঙাবাবুর কে কোথায় আছে একজন—যে নাকি বশ ক'রে ফেলেছে রাঙাবাবুকে। চোখে দেখেননি তাকে কখনও সুমিত্রা, দেখতেও চান না। লোকমুখে শুনেছেন, আছে একজন কোন কেউ। চন্দনপুরেই আছে। কোথায় কাছাকাছি। রূপ আছে না গুণ আছে কে জানে, সে নাকি বশীকরণ করেছে রাঙাবাবুকে। আছে কে একজন অজাত কুজাতের মেয়ে। ডাগর-ডোগর, ভরা-যৌবনা।

সুমিত্রা দেবীর রূপ আছে। তাঁর সুঠাম দেহ থেকে এখনও যেন যৌবন বিদায় নেয়নি। তাঁর রূপ আছে, রঙ আছে, অপূর্ব্ব গঠনও আছে অটুট। তবুও, তবুও রাঙাবাবু কেন যে ফিরে দেখলেন না, কেউ বলতে পারে না। তবুও কাব্যে পড়া যায়, মানুষ না কি স্রেফ রূপের পূজারী, ভালবাসে একমাত্র সৌন্দর্য্যকে।

বন-জঙ্গলে বনফুল ফোটে। আগাছার কাঁটাভরা জঞ্জালে ফোটা ফুলটির মতই সুমিত্রা দেবী যেন সংসারে আছেন, কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে, সরিক আর সমাজকে এড়িয়ে। কাঁটার ঘা তবুও এড়াতে পারেন না। রক্ত ঝরে ফুলের পাপড়ি থেকে।

—চিত্রা !

প্রায় ফিসফিসিয়ে ডাকলেন সুমিত্রা। পাছে কেউ শুনতে পায় সেই ভয়ে। আবার ডাকলেন,—চিত্রা !

ঘরে ঢুকলো সুচিত্রা। ঘরের ভেজানো-দরজা আস্তে আস্তে খুলে ঘরে ঢুকলো। বললে,—মাগো !

তখনও চোখে জল সুচিত্রার। কেমন যেন দুঃখ-পাওয়া মুখ। থমথমে, বিষণ্ণ।

কোথায় ব্যথা সারাবেন নিজের, ছ'ড়ে-যাওয়া রক্তাক্ত কনুইয়ে কোথায় ওষুধ লাগাবেন তা নয়। সুমিত্রা দেবী দেরাজের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন। কাঁকালের ব্যথায় চলতে যেন পারেন না। ফিস ফিস বললেন,—হ্যাঁরে চিত্রা, বাইরের দালানে কেউ শুনছিল।

—হ্যাঁ। বললে সুচিত্রা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে। বললে,—দালানে আলো নেই, তাই সকলকে দেখতে পাইনি মা।

—তবুও কাকে কাকে দেখলি ? কাকীমারা কেউ ছিল না ?

—হ্যাঁ। মেজকাকী, সেজকাকী আর ফুলকাকীকে দেখেছি।

—জ্যাঠাইমাদের কেউ ছিল না ?

—দেখতে পাইনি। বড় জ্যাঠাইমা নিজের ঘরের দরজা থেকে শুনছিল।

দেরাজের মাথায় আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, মাটির শুভ মূর্তি। সুমিত্রা মূর্তি সরিয়ে লুকিয়ে-রাখা চাবির গোছা তুলে নিলেন। রাঙাবাবুর ভয়ে আগেভাগে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আলমারীর চাবি খুলতে খুলতে বললেন,—অপর্ণাকাকী ছিল না ?

—অপর্ণাকাকীমা তো ঘরে, ধীরাজের খুব জ্বর হয়েছে যে।

সুচিত্রা কথা বলতে বলতে চোখ বড় করলো।

আলমারী খুলে এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটি ছোট ক্যাশ-বাক্স বের করলেন সুমিত্রা দেবী। বাক্স খুলতে খুলতে বললেন,—বাবাকে এই টাকাটা চুপি চুপি দিয়ে এসো চিত্রা। যেন হারিও না।

—না না।

—মুঠোর মধ্যে নিও।

—হ্যাঁ।

মেয়ের হাতে গিনিখানা দিতে দিতে সুমিত্রার হাতখানি কাঁপতে থাকে যেন। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখে যেন অন্ধকার দেখেন আরেকবার।

—এ কেমন টাকা মা? সোনার টাকা?

সিঁদুর-মাখানো হাফ্‌গিনিখানা তুলে ধ'রে জিজ্ঞেস করলো সুমিত্রা।

—হ্যাঁ। যেন হারিও না। মুঠোর মধ্যে নিও। বাবাকে দিয়ে এসে ধীরাজ এখন কেমন আছে দেখে আসবে।

ঘরের বাইরে, দালানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সুচিত্রা, নিমেষের মধ্যে। কত দালান আর কত সিঁড়ি পেরিয়ে তাকে যেতে হবে সদরে। কত অন্ধকার ভাঙতে হবে তাকে। সেও বুঝেছে বিপর্য্যয়ের অশান্তি নেমেছে তাদের ঘরে।

অপর্ণার ছেলে ধীরাজমোহনের খুব অসুখ।

মেয়ের মুখে শুনে সুমিত্রা ভাবছিলেন, একবার ছেলেটাকে দেখতে না গেলে বিশ্রী দেখায়। তাঁকেও মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়। কোথায় ব্যথা সারাবেন সুস্থির ব'সে থেকে, ওষুধ দেবেন কোথায়, তা নয়, অপর্ণার ছেলের অসুখ শুনে কর্ত্তব্যজ্ঞান জেগে উঠলো এখন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে।

দেরাজের লম্বা আয়নায় হঠাৎ দেখতে পেলেন সুচিত্রা, নিজেকে চোখে পড়লো তাঁর। আয়নার কাছে এগিয়ে গেলেন—দেখলেন মুখখানি রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছে যেন। কেঁদে কেঁদে ফুলেছে দুই চোখ। চোখের কাছাকাছি, বাম গালে কালশিটের নীলাভ চিহ্ন। আঙুলের লম্বা ছাপ এঁকে দিয়ে গেছেন রাঙাবাবু। সুমিত্রা দেবীর চাঁদের মত ঢলো ঢলো মুখে কলঙ্ক পড়েছে যেন। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। খোঁপা খুলে ঝুলছে বিনুনী। কাঁটা ক'টা খ'সে পড়ো-পড়ো।

নীরব ঘর। ঝড় থেমে যাওয়ার উত্তর মুহূর্ত। সাড়াশব্দ নেই ঘরে। সুমিত্রা দেবীর তপ্ত শ্বাস ফেলার শব্দ শুধু।

নাচঘর থেকে উড়ে-আসা সারেঙ্গীর কান্নাটা যেন এখন বড় বেশী বাজতে থাকে কাণে। আয়নায় নিজের মূর্ত্তি দেখে, নিজের ফুলে-ওঠা মুখখানি দেখে ঘর থেকে আর বেরুতে সাধ হয় না।

কি লজ্জা, কি লজ্জা! কতদিনে এই কালশিটের দাগ মিলোবে কে জানে। তেমনি কি জ্বলছে ছ'ড়ে-যাওয়া কুনুইটা। সুমিত্রার আঁচলের এক প্রান্তে রক্তের লালিমা। কনুইয়ে আঁচল চেপে চেপে রক্তপাত বন্ধ ক'রেছেন, তারই লাল প্রতিচ্ছবি।

অপর্ণার ছেলেটির জন্য মন অস্থির চঞ্চল হয় সত্যিই কিন্তু এই চেহারা কাকে দেখাবেন! সাহানুভূতি আর সমবেদনা কুড়োতে বেরুবেন! কেমন যেন ভগ্নমনে খাটে ব'সে পড়লেন সুমিত্রা। দেরাজের মাথায় রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি—তাঁর প্রতি যেন অভিমানের কঠোর দৃষ্টিতে একবার দেখলেন। আবার শ্রাবণের ধারার মত অনর্গল অশ্রুপাত শুরু হয়। কান্না যেন থেমেও থামতে চায় না।

মেয়েটাকে এখন অপর্ণার ঘরে, তার ছেলে ধীরাজকে দেখতে না পাঠালেই যেন ভাল ছিল। অপর্ণা যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল কিছু জেনে

নেয় সুচিত্রার কাছ থেকে! কত কি এলোমেলো চিন্তা এসে যেন জড় হয় সুচিত্রার মনে। পাষাণ মূর্ত্তির মত নিথর হয়ে বসে থাকেন তিনি। আর দর দর বেগে জলের ধারা নামে দুই চোখ থেকে।

শিয়াল ডাকছে না! কত রাত হয়েছে কে বলতে পারে। চন্দন-ধামের আশপাশে বাঁশবন। রাতের বেলায় কেউ মাড়ায় না সেদিক। অন্ধকারে দেখা যায় না ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশঝাড়—শুধু দেখা যায় দূর আকাশের তারার মত, জোনাকি জ্বলছে অজস্র। বাঁশবনের যতেক শিয়াল, মিলে মিশে এক হয়ে প্রহরে প্রহরে ডাক দেয়।

চন্দনধামের ঘুমন্ত শিশুরা চমকে ওঠে সেই বিকট আওয়াজে।

পালাজ্বরের রোগী ধীরাজমোহনও চমকে উঠলো। অসুখে ভুগে ভুগে হয়তো দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সুস্থ থাকলে তার চাঞ্চল্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয় অপর্ণাকে। সেই ছেলে পড়ে আছে যেন মৃতপ্রায়ের মত। কঙ্কাল-সার শরীর, যেন মিশিয়ে গেছে বিছানার সঙ্গে। আদুড় গায়ে দেখলে বুকের পাঁজরা ক'খানা যেন গুনে ফেলা যায়। দেখলে কে বলবে এই সেই দস্যি দামাল ছেলে!

অপর্ণা দেবীর ঘরের এক কোণে রেডিও চলছে। অত্যন্ত মিহি সুরে। পাছে ছেলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। খানিক আগে বার্লি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন ছেলেকে। গভীর ঘুমে যখন প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছে ছেলে, তখন অত্যন্ত সন্তর্পণে খুলে দিয়েছেন রেডিও।

কখন যেন দেখেছিলেন অপর্ণা, বেতার-জগতের পৃষ্ঠা খুলে আজকের অনুষ্ঠানসূচী দেখেছিলেন। রাত দশটা নাগাদ গান আছে দিলীপকুমার রায়ের। ভজন গান।

অপর্ণা দেবী ভীষণ পছন্দ করেন দিলীপকুমারকে। তাঁর কণ্ঠকে। তাঁর গান শুনতে পেলে দুনিয়া ভুলে যেতে পারেন অপর্ণা। কি সুমিষ্ট কণ্ঠ, কত দরদভরা!

দুই হাতে দেহের ভর রেখে উপুড় হয়ে খাটে শুয়েছিলেন অপর্ণা। পড়ছিলেন যেন কি একখানি মোটা আকারের বই। শরৎচন্দ্রের 'শেষ-প্রশ্ন' পড়ছিলেন। ঘরে শুধু রেডিওর ক্ষীণতম ধ্বনি। কলকতা বেতার-কেন্দ্র থেকে কে এক নতুন গায়িকা খেয়াল শোনাচ্ছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইছেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে।

অলকমোহন ব'সে আছে অপর্ণাবৌদির পায়ের কাছে। সেও যেন এক মনে, নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছে কি একটি খাতা। বাঁধানো একসাইজ বুক।

হঠাৎ অলকমোহন মুখ তুললো।—অপর্ণাবৌদি, বল'তো কার লেখা? অর্পণা কৌতূহলী হাসি হাসলেন মৃদু মৃদু। বললেন,—কোন্‌টা কার লেখা?

অলকমোহন বললে,—এই যে আমি পড়ছি। তুমি শোন।

—বেশ পড়। তবে খুব আস্তে আস্তে, রোগা ছেলে না উঠে পড়ে ঘুম থেকে!

অলকমোহন পড়তে থাকে:

তোমাকে বললাম—এস
তোমার ধূসর জীবন হতে এস,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এস,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে,
যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীক্ষ্ণ নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

তুমি কোনো উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে,
সে ক্লান্ত, স্তিমিত হাসিতে
রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা।

'শেষ-প্রশ্ন' বন্ধ ক'রে ফেললেন অপর্ণা। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন, সাবধানে উঠে বসলেন ধীরে ধীরে। এক ঝলক হেসে বললেন,—কার লেখা? রবীন্দ্রনাথের?

অলকমোহন ঠোঁট ওলটালো। নিরাশ মুখ করলো। বললে,—শুধু ঐ এক রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ! আর বুঝি কেউ কবি নেই আমাদের সাহিত্যে।

হেরে গেছেন অপর্ণা। বলতে পারেন নি, সেজন্য লজ্জা পাবেন। অপর্ণা আবার এক ঝলক হেসে বললেন,—কেন থাকবে না। মাইকেল আছেন, সত্যেন দত্ত আছেন, নজরুল ইসলাম আছে—

—আর কেউ নেই?

কেমন যেন ধমকের সুর অলকমোহনের। বিরক্ত মুখাকৃতি।

—কার লেখা বল না ঠাকুরপো?

উগ্র আগ্রহের সঙ্গে, মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করেন অপর্ণা। মিনতির আভাষ যেন কথার ধরণে।

অলকমোহন বললে,—লেখকের নাম সমর সেন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

অপর্ণা অবাক হ'লেন যেন। চোখে ফুটলো স্থির চাউনি। নতুন জ্ঞান অর্জ্জনের বিস্ময় যেন চোখে। বললেন,—আমি ভেবেছি তোমার লেখা বুঝি!

—তুমি একটা আস্ত মূর্খ। আমি আবার কবে কবিতা লিখলাম? অলকমোহন খাতার পাতা ওলটায় আর কথা বলে।

—আমি ভেবেছি এ বুঝি তোমারই মনের কথা বলছো তুমি আমাকে। কেমন যেন ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেন অপর্ণা। কথার শেষে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন। যেদিকে রেডিও, সেদিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

—আমার মনের কথা হ'তে যাবে কেন? বললে অলকমোহন। খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে,—কবির লেখা!

ঈষৎ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন অপর্ণা! আগে থেকে না জেনেশুনে, কথাগুলি ব'লে ফেলেছেন!

কিছুক্ষণ নীরবে খাতার পাতা উলটে উলটে থামলো অলকমোহন। কোন্ এক পাতায় থেমে গিয়ে পড়তে থাকলো মনে মনে। অপর্ণা লজ্জা-রাঙা মুখ ফিরিয়ে আড়-নয়নে দেখলেন অলকমোহনকে। তার আনত মুখ। খাতার পাতায় চোখ।

অলকমোহন বললে,—আচ্ছা এটা কার লেখা বল'।

অপর্ণা আবার আগের মত এক ঝলক হাসতে চেষ্টা করলেন, যেন পারলেন না। বললেন,—নিশ্চয়ই আমি জানি না। আচ্ছা তুমি পড়'।

অলকমোহন আবৃত্তির সুরে পড়া শুরু করলো:

বর্ত্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা—
মাঝে মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।
নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে—

মাথা নত করলেন অপর্ণা। চোখ নামালেন! আকাশের অল্প-বিদ্যুতের মত একবার যেন চমকালেন।

অলকমোহন থামলো। দেখলো একবার কাব্যের শ্রোতাকে। তারপর আবার পড়তে থাকলো ঃ

নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল-সঙ্কুল কোনো নির্জ্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি ;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান ;
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান ;
সেখানে দুপুর শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাঙলার বধূ নামে ;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোণো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।

থামলো অলকমোহন। খাতার মধ্যে আঙুল চালিয়ে বন্ধ করলে খাতা। বললে,—কার লেখা বল ?

কি বলবেন কি অপর্ণা। বিস্ময়ের ঘোর নামে তাঁর মুখে চোখে। বললেন,—জানি না আমি। বলতে পারবো না ভাই।

বিরক্ত হয়ে বললে অলকমোহন,—তুমি কোন' কম্মেরই নয়। এটাও ঐ সমর সেনের লেখা।

অপর্ণা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেন কে জানে। ভাবছেন এই নামে কি সত্যি আছেন কোন কবি? সত্যিই কি অলোকমোহনের লেখা নয়! মিথ্যাই বা বলবে কেন অলক! পরের লেখা কেউ কেউ নিজের নামে চালাতে হয়তো পারে, কিন্তু নিজে লিখে অন্যের নামে কেউ কখনও চালাতে পারে! কথায় কথায় ঝলকে ঝলকে হাসছিলেন অপর্ণা,আর যেন হাসতে পারেন না।

অলকমোহন আবার খাতার পাতা ওলটাতে থাকে। পাতার পর পাতা, প'ড়ে না, চোখ বুলিয়ে যায়।

অপর্ণার অসুস্থ ছেলে ধীরাজমোহন, বেশী জ্বর আর গভীর ঘুমের ঘোরে শিউরে শিউরে উঠছে কখনও। চোখ কপালে তুলে ঘুমোচ্ছে। অর্দ্ধনেত্রে। অপর্ণার মনে পড়লো, ছেলেকে এখনও আজ ওষুধ পর্য্যন্ত খাওয়ানো হয়নি। ওষুধ আনতে যাওয়ার নাম করে বিরাজমোহন গেছেন। গেছেন সেই কতক্ষণ আগে! সবে যখন সন্ধ্যে উৎরেছে। অপর্ণার মণে পড়লো, তিনি বলে গেছেন সাইকেলে যাবেন। ফেরবার নাম নেই কেন তবে এখনও! গেছেন তো আসছেন না কেন? নাচঘরে জ'মে যাননি তো! হাতে টাকা পাওয়া মাত্র কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কে জানে। যেখানেই যান, ছেলেটার ওষুধটা কিনে দিয়ে গেলেই চ'লতো। নাচঘরে একবার ভিড়লে আর কি উঠতে পারবেন খুব শীঘ্রি! অপর্ণা বিচলিত হয়ে ওঠেন, ভাবতে ভাবতে। বিনা ওষুধে থাকবে ছেলে?

অলকমোহন পাতার পর পাতা ওলটায় খাতার। কখনও থ' হয়ে থেমে থাকে। কখনও বা গুঞ্জরণ শোনা যায় অস্পষ্ট।

যুঁই ফুল এক রাশি দিয়েছিল অলকমোহন। সেই সন্ধ্যায়। ঘরের হাওয়ায় টাটকা যুঁইয়ের গন্ধ ভাসে যেন। অপর্ণাও থেকে থেকে যুঁইয়ের গন্ধে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে। কবিতা শুনে যেন নির্ব্বাক হয়ে যায়।

বিরাজমোহন যদি নাচ ঘরে ভিড়ে যান, তখন কে ডাকবে তাঁকে। কাকে পাঠিয়ে ডাকাবে অপর্ণা এই ছমছমে অন্ধকারে!

নাচ ঘরে সারেঙ্গী কাঁদছে, ককিয়ে ককিয়ে। এক টানা।

কখনও দ্রুত আর কখনও বিলম্বিত। কিন্তু যেন বিরামবিহীন। যেন থামবে না আর। নিদারুণ শোকের নিরবিচ্ছিন্ন কান্নার মত শোনায় যেন। হয় তো মাত্রা-তাল-সম-লয় আছে, আছে মীড়, বাদী আর বিবাদী—সপ্তস্বরের খেলায় আছে আরও কত কি! তবুও কান্নার শোকার্ত্ত স্বর যেন সারেঙ্গীর একটানা ওঠা-নামায়।

বৈশাখের এলোপাতাড়ি বাতাস শুধু তালে তাল রাখতে পারে না। হাওয়ার গতি যে কোন্ দিকে ধরা যায় না।

চন্দনধামের শীর্ষে মরচে-ধরা লোহার ওয়েদার-কক। মোরগের লেজ খ'সে গেছে কতকালের বৃষ্টিজলে! লেজ-কাটা মোরগটা অন্ধকারে ঘুরছে বনবনিয়ে। কোন মতে স্থির হয়ে থাকছে না এক মুহূর্ত্ত।

নাচ ঘরের দ্বারে-বাতায়নে লাল ভেলভেটের ঝুলন্ত পর্দ্দা—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। উড়তে থাকে অভিসারিকার লুটানো আঁচলের মত। দামী সিগারেট, মূল্যবান পানীয়—তাদের উগ্র গন্ধকে হার মানিয়ে দিয়েছে বেল আর যুঁয়ের মন-মাতানো গন্ধ। না'চ ঘরের দেওয়ালে আছেন বিগত পুরুষরা—তাঁদের তৈলচিত্র। কেউ ব'সে আছেন, কেউ দাঁড়িয়ে আছেন—চোখে অভিজাত দৃষ্টি ফুটিয়ে। সারি সারি ছবিতে আজ মালা পড়েছে একেক ছড়া। কি ভাগ্য পূর্ব্বপুরুষদের! যাঁরা ছিলেন ন্যায়, নিষ্ঠা আর নিয়মের জীবন্ত পরাকাষ্ঠা—তাঁদেরই পাশে পাশে নগ্ননারীর চিত্ররূপ। বটিচেলী, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোর বিখ্যাত ছবির নকল অঙ্কন। আসল আর নকলে যে কি ভীষণ পার্থক্য কে ধরবে! কি অক্ষম অনুকরণ!

গান আর বাজনার ঝঙ্কারে নাচঘর যেন গমগম করছে।

ঢুলু-ঢুলু-চোখ বাবুদের কেউ কেও সোজা আর বসতে পারছেন না।

তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছেন নেশার উগ্রতায়। কড়া হুইস্কির নেশায় চোখে যেন কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড নেশায় কারও কারও মুদিত চক্ষু —নিমীলিত আঁখি। কেউ কেউ কারণে অকারণে হাসাহাসি করছেন। হাসির কথা নেই, তবুও হাসি। শুধু হাসি নয়, অট্টহাসি। জোরালো নেশার রাশ-ছেঁড়া সজোর হাসি।

সারেঙ্গী ককিয়ে ককিয়ে উঠছে। কখনও দ্রুত, কখনও বিলম্বিত।

কে একজন গান ধরেছেন। খাম্বাজ বেহাগের মত টপ্ খেয়াল গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সারেঙ্গী, তানপুরা আর তবলা। মাত্র চার পঙক্তির গান, গীতিকার শোরীর রচনা—গাইতে সময় নেয় কতক্ষণ! গান চলতে থাকে বাবুদের হাসাহাসির সঙ্গে। গানটি এই :

সাথিড়া মানো সাথ্ নিভানা
হম পরদেশী লোক বিগানা।
ইস্ গলিয়াঁ বীজ আঁদানি জাঁদা
শোরী অপনা সো অপনা বিগানা সো বিগানা॥

সুধাতে যে স্বাদ নেই, মধুতে নেই যে মিষ্টতা, সুরায় নেই যে মাদকতা —সঙ্গীতে তা আছে। যে হৃদয় শত সহস্র জল-প্রপাতের গর্জ্জনে, শত বজ্রের একত্র নির্ঘোষে কাঁপে না, গানের মধুর সুরে তা অভিভূত হয়। কে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করেছে নাচঘরের মানুষদের। হুইস্কির কড়া নেশা না খেয়াল গান, কে বলতে পারে! হাতে হাতে পানপাত্র, বরফ-ঠাণ্ডা। যেন গলানো তরল সোনা, গেলাসে গেলাসে—চলকে চলকে উঠছে তাল দেওয়ার তালে তালে। বাবুদের কেউ কেউ তাল দিচ্ছেন। মাথা দুলিয়ে, পা নাচিয়ে, টুস্কি দিয়ে।

বড়বাবু চন্দ্রমোহন নেশায় একেবারে চুরচুরে হয়ে পড়েছেন। দীর্ঘ দুই চোখ করমচার মত রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখখানা যেন তাঁর অসম্ভব

লাল হয়ে গেছে। এক তাকিয়া থেকে অন্য এক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতে বসতে চন্দ্রমোহন বললেন,—কার গান হে?

—শোরীর গান বড়বাবু। সুর ভৈরবীবহার, তাল মধ্যমান।

গায়ক গান থামিয়ে বললেন সবিনয়ে।

—এক্সাইটিং! ভারী চমৎকার গাইছো ভাই তুমি। বহুৎ আচ্ছা!

চন্দ্রমোহন বললেন ঠোঁট চেপে। তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে জ্বলন্ত সিগারেট। থ্রি ক্যাশেলস্, তিলে তিলে পুড়ে চাই হয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়া ছড়িয়ে। বড়বাবুর চোখে ধোঁয়ার স্পর্শ লাগে। তাই তাঁর বাম চোখ এখন প্রায় বন্ধ। এক চোখে দেখছেন। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, —এ গানে কি বলতে চায় শোরী?

ঈষৎ গর্ব্বে গায়ক খুশীর মৃদু হাসি হাসলো। মুদ্রা মূল্য নয়, শুধু মাত্র মৌখিক তারিফ শুনেই আনন্দ। গায়ক কথা বলে, গানের মত কথাতেও দরদ ফুটিয়ে। বললে,—মেনে লও, তোমাতে আমাতে মিলন হবে না। হম পরদেশী লোগ বিগানা। আমি পরদেশী, তাই পর। ইস্ গলিয়াঁ বীচ আঁদানি জাঁদা। কিন্তু, এই স্থানে আসা যাওয়া চিরকালের। শোরী অপনা সো অপনা বিগানা সো বিগানা। শোরী বলছে, যে আপন সে আপনই থাকবে, সে পর সে পরই থাকবে।

—আহা!

কে যেন বললে, ভাবে বিভোর হয়ে।

হঠাৎ এক রাশ দমকা হাওয়া আসে খোলা দরজা দিয়ে। অনেক, অনেক দূর থেকে, ছুটতে ছুটতে আসে যেন আজ রাতের লোভে লোভে! মুক্তদ্বার পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরের ফরাসে। আলোর ঝাড় দোলাদুলি করে। মন্দ গতিতে দুলতে থাকে ঘরের আলো।

—হুজুর।

ডাক শুনে চোখ ফেরালেন চন্দ্রমোহন।

ট্রে-হাতে বেয়ারা! বড়বাবুর হাত শূন্য দেখে, ট্রে এগিয়ে ধরে ভয়ে ভয়ে।

দৃষ্টি ফিরিয়েই বড়বাবু বললেন,—হোয়াই ডু উ ডিস্টার্ব্ ননসেন্স!

থতমত খেয়ে স'রে যায় বেয়ারা। যেন ধাক্কা খেয়ে ক'হাত পিছিয়ে যায়।

গানের ব্যাখ্যা শুনিয়ে আবার গান ধরেছে গায়ক। ঠিক পূর্ব্বের মত সুললিত কণ্ঠে। থেমে-থাকা তবলা তানপুরা আবার বেজে উঠেছে!

খেই হারাণো ভৈরবীর সুর আবার যেন ছোটাছুটি শুরু করলো চন্দনপুরের আকাশে আর বাতাসে। ঘন কালো রাতের জমাট অন্ধকার বৈশাখী হাওয়ায় যেন খান খান হয়ে যায়। আকাশের ঘন নীল মেঘ ছড়িয়ে পড়ে ইদিক সিদিক। স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাত্রির আকাশ!

কোথায় যে এক ফালি চাঁদ লুকিয়ে আছে, চোখে পড়ে না সহসা। আছে কি নেই, দেখা যায় না। মেঘে ঢাকা ওড়না যেন, কোন্ লজ্জায় খুলতে চায় না। দেখাতে চায় না চাঁদমুখ।

দিনে মাছি, রাতে মশা। কাঁচা নর্দ্দমা আর এঁদো পুকুরের ছড়াছড়ি চন্দনপুরে। যেখানে সেখানে বাঁশবন, আকাশচুমী তাল, নারকেল, বাবলা, মাদার আর দেবদারু। আকাশ থেকে বোমা পড়ার ভয়ে যেন প্রাকৃতিক কামেফ্লেজ! পৃথিবীর যত ভারতলোভী ভিন্‌দেশী আকাশচারী-দের দূরবীন-চোখ থেকে বাঁচাতে হবে যেন এই চন্দনপুরকে!

এমনই নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন চন্দনপুর। তবুও সেও যেন আজ রাতটুকুর জন্য, এলোমেলো বৈশাখী বাতাসের মত, বাবুদের ঐ আলো-ঝলমল নাচঘরের মত, সারেঙ্গীর ধ্বনির মত, আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে প্রবল হাওয়ায় গাছের পাতা খড়খড়িয়ে ওঠে।

পাতায় পাতায় চুমোচুমি চলে, কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতায় মনে হয় যেন হাসাহাসির শব্দ। কারা যেন কাদের উপহাস্য করছে। হাসছে অট্টহাসি।

চন্দনধামকে ঘিরে আছে, গাছ-প্রহরী।

সে যুগের বাবুদের সখের বাগান ছিল। গোলাপ বাগান। সৌখীন ফুলের বাগিচা। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে কবে কোন কালে, শুধু বেঁচে আছে এখনও তাল, নারকেল, আম কাঁঠাল, জামরুল আর দেবদারু। পেঁপে আর সুপুরী গাছ। চন্দনধাম পড়ো পড়ো হয়ে এসেছে। প্রাঙ্গনের প্রাচীরও তথৈবচ। কোথাও কোথও ভেঙ্গে ধ্বসে পড়েছে। বাহির আর ভিতরের পথ খুলে গেছে। এর তার গরু ছাগল পর্য্যন্ত আসা-যাওয়া করে সেই পথ ধ'রে! সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে, রোমন্থকের দল চরতে আসে তাই! ঘাস খেতে আসে।

চন্দনধাম জরাজীর্ণ। গাছ-গাছড়া এখনও সজীব, সতেজ আছে। যত্ন নেই, কেউ দেখে না, তবুও বছরে বছরে ফল ধরে এখনও।

এলোপাতাড়ি হাওয়ায় থেকে থেকে গাছের পাতা খড়খড়িয়ে ওঠে। অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করতে কারা যেন অট্টহাসি হাসে।

কে এমন হাসে। মাতালের মত?

এমন দুখের রাতে কার এমন হাসি আসে! ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের উপহাস্য! অন্দরমহলে কেউ কেউ চমকে ওঠেন হাসির শব্দে। এক পক্ষ হাসাহাসি করছে না কি অপর এক পক্ষকে দেখে! এক সরিক হাসছে না কি অন্য সরিকের দুঃখে! শত্রু হাসছে!

এক অন্ধকার দালানে দু'জন ভীরু। অন্দরের অন্তরে থেকেও এক

সঙ্গে যেন চমকে উঠলো হাসাহাসির শব্দে। উড়ু উড়ু হাওয়ায় গাছের পাতা নেচে ওঠে। যেন জীইয়ে ওঠে। শাখা প্রশাখা জড়াজড়ি করতে থাকে একে অন্যকে।

রাধারাণী ফিস ফিস বললে,—কারা হাসছে বল'তো জয়াবৌদি ?

—কি জানি ভাই! আমার যেন ভয় ভয় করে।

রাধারাণী কারও একটি হাত নিজের হাতের মুঠিতে চেপে ধ'রলো। খিল খিল হাসি হাসতে থাকলো। চাপা হাসি। বললে,—নাহি নাহি ভয়, হবে হবে জয়। কথার শেষে আবার হাসি শুরু করলো। কথাগুলি বললে যেন গানের সুরে।

রাধারাণীর মুঠোর মধ্যে কার বন্দী হাত, ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। যেন একটু টুকরো বরফ। রাধারাণী হাসি থামিয়ে বলে,—এত যদি ভয়, তবে মরতে এলি কেন ?

—বড্ড যে অন্ধকার! কখন কি কামড়ায় তার ঠিক নেই। যেমন অন্ধকার, তেমনি কি দম-আটকানো গরম! যদি কেউ এসে পড়ে ?

—ভয় নেই। বাঈনাচ ছেড়ে উঠে আসবে না কেউ।

রাধারাণীর কথায় আশ্বাসের সুর। নিশ্চয়তা। কথা শেষ ক'রেই এক ছত্র গান গাইলো রাধা,—স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে—

ঘন নীল রঙের নীলাম্বরী রাধার শ্রীঅঙ্গে। অন্ধকারে যেন মিশে থাকে, দেখাই যায় না। ফেঁসে যাওয়া, তালি-পড়া, সেলাই করা—তা হোক। তবুও নীলাম্বরী। কি একটা চেনা চেনা গন্ধ পাওয়া যায় রাধারাণীর গা থেকে। স্নো, পাউডার না এসেন্সের গন্ধ ঠিক ধরা যায় না। কি মেখেছে রাধা কে জানে!

—এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি তাই ব'লে ?

গান থামিয়ে রাধারাণী বললে,—এখানেই থাকতে হবে।

—কতক্ষণ ?

—যতক্ষণ না আসে। ফিস ফিস কথা বলতে বলতে কাকে যেন জড়িয়ে ধরলো রাধা। বললে,—জয়াবৌদি, তুই কি মিষ্টি ভাই! কি নিটোল শরীর তোর! কত নরম!

—থাক্, ঢের হয়েছে।

—মাইরী বলছি, আমি এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলছি না। আয় তোকে একটা চুমু খাই।

—আবার ছেলেমানুষী হচ্ছেতো? ছিঃ রাধা।

—মনে মনে অহঙ্কার হচ্ছে না তোর? আমি যদি তোর মত হতুম, কি যে করতুম তার ঠিক নেই!

—থাক্, আমার মত হয়ে আর কাজ নেই! কপাল পুড়িয়ে কাজ নেই।

কেমন যেন ভীতিকাতর কণ্ঠে কথা বললে জয়াবৌদি। দুঃখভারাক্রান্ত সুরে। নিজেকে মুক্ত করে নিলো রাধারাণী আবেষ্টন থেকে।

নেহাৎ ঘনকালো আঁধার, তাই দেখা যায় না জয়াকে।

জয়ার পরণের সাদা শাড়ী শুধু চোখে পড়ে আবছা আবছা! লাল পাড় তাঁতের শাড়ী। যেমন পাৎলা, তেমনি মসৃণ। নেহাৎ অন্ধকার, তাই জয়াকে যেন দেখা যায় না। শুভ্র ফুলের মতই জয়ার শান্ত রূপ। ছিপ-ছিপে দেহের গঠন। কোঁকড়া চুলের চূর্ণ কুন্তল নেমেছে কপালে। নধর, নিটোল অঙ্গপ্রতঙ্গ। টিকালো মুখে কেমন যেন অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা। ভাসা-ভাসা চোখের কোলে কালিমা!

—কপাল তুমি স্বেচ্ছায় পুড়িয়েছো জয়াবৌদি, তা তুমি যাই বল' না কেন!

—কেন? আমার দোষটা কি তাই শুনি?

চুপ ক'রে থাকে রাধা। জবাব দেয় না কথার। ঠিক যেন অন্ধকারের

মতই নিথর হয়ে থাকে। কি গভীর অন্ধকার এই দালানে! যেন নিরেট কাজল! দালানের কাঠের কড়িকাঠের ফাঁকে ফাঁকে কবুতরের বাসা। থেকে থেকে বকম বকম শব্দ তোলে শান্তির দূতেরা। দুনিয়ার বিলকুল যত অশান্তিপ্রিয়রা মেনে নিয়েছে ওদের প্রতীক!

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে দালানের নালী-নর্দ্দমায়। অবিরাম নয়,—থেকে থেকে, থেমে থেমে ডাকছে। কেমন যেন ভ্যাপসা গরম এই বদ্ধ দালানে! হাওয়ার চলাচল নেই।

—কথা কইলে না যে রাধাঠাকুরঝি? আমার দোষটা কি, তা তো শোনালে না!

হাতে হাত দেয় রাধা। নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে জয়াবৌদির বরফের মত ঠাণ্ডা একখানি হাত। যেমন ঠাণ্ডা আর তেমনি কি নধর নরম! রাধা বললে,—স্বামীকে যে তুমি আস্কারা দিয়েছিলে! সময় থাকতে বাঁধ বাঁধতে পারলে না। গেরো আলগা ক'রেছিলে তাই ছিঁড়ে গেল!

—আমি এসেছি তখন পরের ঘর থেকে, আমি কি দিয়ে বাঁধ বাঁধবো?

—কেন, রূপের ফাঁদের বাঁধ কোথায় ছিল তখন?

জয়াবৌদি থেমে থাকে কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর হতাশ-স্বরে বলে,—তা থাকলে কি ভাবনা ছিল কিছু! রূপ আমার কোথায়! তোমাদের উচিত ছিল, কোন' সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমাদের দাদার বিয়ে দেওয়া। তা হ'লে—

—তা হ'লে কি? রাধা শুধোয় ফিসফিসিয়ে।

—তা হ'লে তিনিও সুখে থাকতেন, আমারও কপালটা পুড়তো না।

—আজেবাজে বক' কেন? তুমি বলতে চাও, তোমার রূপ নেই?

—না।

—যা আছে তাই যা কার থাকে?

—কোন' কাজে লাগলো না ভাই। বৃথাই গেল।

—তাপসদা এখন কেমন আছেন ? ডাক্তাররা কি বলছে ?

—আছেন একই রকম। ডাক্তার বলছে যে, এ অসুখ সারবার নয়। কোন ওষুধ নেই।

প্রশ্নটি যেন না করলেই পারতো রাধা। বিষণ্ণকাতর কণ্ঠে কথা বলে জয়া। নিরাশয় ভেঙ্গে পড়ে যেন। উত্তর শুনে রাধার মত মুখর আর চপল মেয়েও নীরব হয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাধা।

তাপসমোহনই জয়ার জীবনদেবতা—বিবাহিত স্বামী—ইহকাল আর পরকাল। মৃত পিতার একমাত্র বংশধর তাপসমোহন। হাতে সম্পত্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় প'ড়ে বিগড়ে গেলেন রাতারাতি। কাপ্তেনী আর বাবুয়ানির জন্য জলের মত টাকা ওড়াতে শুরু করলেন। একেই কাঁচা বয়স, তার ওপর কাঁড়ি কাঁড়ি কাঁচা টাকা হস্তগত হওয়ার আনন্দে তাপসমোহন ভুলে গেলেন যেন সংসার-দুনিয়া। কলকাতার সেরা সেরা রূপসীদের পায়ে যে কত কতটাকা ঢাললেন, তার কোন ঠিক থাকলো না। বিনিময়ে প্রেম না ভালবাসা কি যে পেলেন কে জানে। তবে এক দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ এড়াতে পারলেন না। সেরা সেরা সুন্দরী রমণীদের দেহবল্লরী যে বিষাক্ত হ'তে পারে, ভাবতে পারেননি তাপসমোহন। কল্পনা করতে পারেননি,—চাঁদেই থাকে কলঙ্ক, সুগন্ধি ফুলে থাকে কীট-পতঙ্গ, তেমনই রূপবতীর দেহ হ'তে পারে বিষ-জর্জ্জর! তাপসমোহন তো আর এমন কিছু নীলকণ্ঠ নয়, যে, যা খাবেন তাইই হজম ক'রে ফেলবেন!

রাশি রাশি টাকা জলের মত খরচা ক'রে ব্যাধি কিনেছেন তাপস-মোহন। শরীরও তাঁর অকালেই পঙ্গু আর অকেজো হয়ে পড়েছে। উত্থানশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, তাই এখন শয্যাশায়ী। তাপসমোহনের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখন লুপ্তশক্তি, পক্ষাঘাতগ্রস্থের মত অনড় আর অচল। বাকশক্তি প্রায় নেই বললেই হয়। মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত। মানুষ চিনতে পারেন না। ঘোর তপস্বীর মতই যেন বাহিরের জ্ঞানশূন্য। প্রথম প্রথম তাঁর সেবা আর শুশ্রূষার জন্যে ছিল রমণী-নার্স, আর এখন!

স্রেফ চাকরের দয়ায় থাকতে হয় এখন। চাকর যা করায় তাই করেন। ডাক্তার শুধু ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে যায়।

অথচ কত রূপ জয়াবৌদির এখনও! দিনে দিনে পাপড়ি খ'সে যায়, ফুল শুকিয়ে যায়,—কিন্তু জয়া যেন দিনকে দিন তিলোত্তমা হয়ে উঠছে।

—তোর জন্যে মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় আমার। বললে রাধা। এক হাতে জয়ার কোমর জড়িয়ে ধ'রে বললে,—তাইতো আজ তোকে এখানে পাকড়াও ক'রে এনেছি। কত কষ্টে আছিস তুই!

—কেন, এখানে কেন? বিস্ময়ের সঙ্গে কথা বলে জয়া। বলে,—এখানে এই ভ্যাপসা গরমে আমার কোন্ কষ্টটা সারবে তাই শুনি! এখানে কি আছে? তোমার হেঁয়ালীর কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না ভাই আমি!

কি যেন বলতে চায় রাধা, বলতে পারে না মুখ ফুটে! আমতা আমতা করতে করতে বললে,—বৌদি, আমি একটা কথা ব'লবো তোকে. রাখবি?

—কথাটা কি তাই শুনি আগে।

—রাখবি বল্?

—আগে শুনি তারপর বলবো। কি কথা?

—যদি না রাখিস্, তখন?

—চেষ্টা করবো, ব'লেই দেখ' না তুমি।

কি যেন চাপতে চায় রাধা। বলতে পারে না। পেশ করতে পারে না তার বক্তব্য। বলে,—জানিস্ বৌদি, তপনদা তোকে ভালবাসে।

খিল খিল হাসি হেসে উঠলো জয়া। সহজ, সরল হাসি। তার হাসির প্রতিধ্বনি ভাসলো দালানে।

রাধা বললে,—বিশ্বাস করলি না তুই ?

হাসি থামিয়ে জয়া বলে,—এ কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য? তপন তো শুনতে পাই তোকেই ভালবাসে।

—তপনদা এখুনি আসবে এখানে, তার মুখেই শুনবি'খন তুই।

—রক্ষে কর' ভাই। তার মুখে আর শুনে কাজ নেই। তপন আমাকে ভালবাসে! হাঁসালি তুই।

আবার খিল খিল হাসি ধরলো জয়া। হাসির বেগে যেন বেসামাল হয়ে পড়লো।

রাধা বললে,—তপনদা বলছিল, তোমাদের ঐ জয়াবৌদির সঙ্গে যদি আলাপ করিয়ে দিতে পারো, তা হ'লে—

—তা হ'লে, থামলি কেন ?

—তা হ'লে, আমাকে তপনদা এক জোড়া কানের দুল গড়িয়ে দেবে কালীকেষ্ট স্যাকরার দোকান থেকে।

—তাই না কি ?

অবাক-স্বরে বললে জয়া। চোখ বড় ক'রে বললে।

হ্যাঁ রে বৌদি। তুই ভাই আপত্তি করিস্ না যেন। ঐ বোধ হয় তপনদা আসছে।

— রক্ষে কর' ভাই। আমি পালালাম এখান থেকে। তোমাদের এই নন্দনকানন থেকে।

—দু'টি পায়ে পড়ি বৌদি, যাসনি ভাই।

দালানের অন্য প্রান্তে যেন এক ছায়ামূর্তি। হঠাৎ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে।

জয়া বললে,—তুমি থাকো ভাই রাধাঠাকুরঝি, আমি আর নয়।

—হু'টি পায়ে পড়ছি তোর। তপনদা তোকে—

—না, না তা হয় না, তা হয় না।

কথা বলতে বলতে, চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জয়াবৌদি। যে-পথে এসেছিল সেই পথ ধরে দৌড়তে থাকলো।

দালানের নালী-নর্দ্দমায় হয়তো ছিল সাথীহারা একটা বেড়াল। ম্যাও ম্যাও ডাক শুরু করলো। ডাকলো বিড়ালীকে।

সুবিশাল চন্দনধামের এই তল্লাট জনশূন্য। মানুষের বসতি নেই। পরিত্যক্ত।

যাদের অধিকার তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন অনিচ্ছায়। অভাব আর অনটনের তাড়নায় বিক্রী ক'রে দিয়েছেন কাকে যেন। দখল নেয়নি ক্রেতা এখনও। ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। বিক্রেতারা ঘর-দালান খালি ক'রে দিয়ে চ'লে গেছেন চন্দনধাম থেকে। নগদানগদি টাকা কয়েক হাজার পেয়ে, হাতে যেন স্বর্গলাভ হওয়ায় ভাগ্য ফেরাতে গেছেন কলকাতার শহরতলীতে। কলকাতার ঠিক বুকের ওপর থাকতে না কি অনেক কাঠ, খড় পোড়াতে হয়। শহরতলীতে তত হয় না, অথচ কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় অতি সহজে।

—রাধা!

—হ্যাঁ। তপনদা?

—হ্যাঁ।

—আজ কোন্ দিক দিয়ে এলে? কেউ দেখতে পায়নি?

—আকাশের চাঁদও দেখতে পায়নি, মানুষ তো দূরের কথা। এসেছি তোমাদের বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে। একটা কুলগাছ ছিল, অন্ধকারে

দেখতে পাইনি। কুলগাছের কাঁটায় আমার পাঞ্জাবীটাই ছিঁড়ে গেল কতখানি!

—আহা! গায়ে-টায়ে ফুটে যায়নি তো!

—পদ্মফুল তুলতে নেমে কাঁটাকে ভয় করলে কি চলে?

—আমি কতক্ষণ ধ'রে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, তোমার জন্যে। একা একা আমার ভয় করে না বুঝি? দেরী করলে কেন এত? জয়া-বৌদিও ছিলেন এতক্ষণ। তাড়াতাড়ি এলে আলাপ করতে তার সঙ্গে।

—অন্ধকারটা জমাট না বাঁধলে চোর কখনও চুরি করতে বেরোয়! আমার দুর্ভাগ্যি!

—কি চুরি করবে তুমি?

—কেন, তোমাকে!

—ধ্যেৎ! কেবল তোমার ইয়ারকি। বাজে কথা আর ধাপ্পাবাজী, রোজ রোজ ভাল লাগে না।

—আমি যে নিরুপায়।

—কেন? চল' না, তোমাতে আমাতে কেটে পড়ি দু'জনে। কোন-দিন বাড়ী থেকে একটা উটকো জানোয়ারের সঙ্গে হয়তো বিয়ে দিয়ে দেবে! চলে যেতে হবে কানপুর কি লক্ষ্ণৌ, দিল্লী কিংবা বোম্বায়ে। তারপর তখন?

—একটা চাকরী-ফাকরী না জুটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি গাছতলায় দাঁড়াবো তোমাকে নিয়ে?

—কত বি, এ আর এম, এ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে মরছে, তুমি কোত্থেকে চাকরী জোটাবে?

—বি, এ আর এম, এ-রা কি চাকরী পায় রাধা? তারা ঐ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেই মরে। চাকরী জোটাতে না পেরে শেষকালে সুইসাইড

করে। কাগজে দেখতে পাও না, গড়ের মাঠের গাছে ঝুলে শিক্ষিত বেকার যুবকের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার খবর ?

—তোমাকে কে দেবে চাকরী ?

—কেন আমার অমন মামা যখন রয়েছেন তখন আমার চাকরীর ভাবনা ? কংগ্রেসী মিনিষ্টারদের সঙ্গে আমার মামার যাকে বলে হলায়-গলায়।

—তাই না কি ?

—কলকাতার রাজভবনের লাঞ্চ্ আর ডিনার পার্টিতে ডাক পড়ে মামার। ভেবো না, ভেবো না রাধা, তোমাকে আমি ঠিক—

—থাক্, থাক্, তোমার শুধু সব সময়ে বড় বড় কথা! কদ্দিন থেকে শুনছি আমি!

—আমাকে তুমি ভুল বুঝলে রাধা ?

—ভুল বোঝাবুঝির কি আছে ? আমি কি বেওয়ারিস্ না কি ? শুধু মুখের কথায় কাজ বাগাতে চাও তুমি! ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাও আমাকে। আমি কি কিছু বুঝি না ?

অনেক কষ্ট আর অনেক ব্যথা বুকে পুষে কথাগুলি যেন বলতে থাকে রাধা। কেমন যেন ক্ষীণ আর করুণকণ্ঠে। অন্ধকার, তাই দেখা যায় না, রাধার চোখ দু'টিও জলে ভ'রে গেছে। কুমারী-মন রাধার, তাই বড় বেশী যেন তাকে কাতর দেখায়। মেঘ না ডাকতেই যেন জল ঝরতে থাকে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। নীলাম্বরী শাড়ীর আঁচল চোখে তুললো রাধা।

—মিথ্যে মিথ্যে রাগ ক'রছো তুমি।

—না তপনদা, আর নয়। অনেক হয়েছে, আর নয়।

—রাধা, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে!

—না না, ভুল নয়। আমারই ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় হয়ে গেছে।

তুমিও আর এসো না! বিয়ে যদি করতে না পারো, কোনদিন পাবে না আমাকে।

—রাধা! তোমার কি হয়েছে কি আজ?

—কিছু হয়নি! সোজা আর স্পষ্ট কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলুম। আর ঠকতে আমি রাজী নই।

—একটা চাকরী জোগাড় না ক'রে কেমন ক'রে—

—তবে চাকরী হোক আগে, তারপর এসো সাড়া পাবে আমার। আমি চ'লে যাচ্ছি এখন। আর নয়, অনেক হয়েছে।

—রাধা!

—না, আর নয়।

—রাধা!

—উহুঁ।

—রাধা!

—না, না।

—রাধা! রাধারাণী!

কোথায় কে! নন্দনকানন থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল রাধিকা। বাঁশীর ডাকে আর সাড়া মেলে না অভিসারিকার। চোখে যেন শুধুই অন্ধকার দেখে তপন। ঝিঁঝিঁ ডাকে, যেন বিদ্রূপের সুরে। দালানের নালী নর্দ্দমায় বেড়ালটা ক'বার ডাকলো ম্যাও ম্যাও। সাথীকে ডাকলো হয়তো। কোথায় যে হারালো বিড়ালী!

চোরের ছায়ামূর্ত্তি, তপনকৃষ্ণের কায়ামূর্ত্তি, খানিক নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে, দালানের অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। আকাশের চাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ফিরতে হবে। কুলের কাঁটা বিঁধবে হয়তো দেহে! কাঁচা বাঁশের বেড়া ডিঙোতে হবে।

আবার কে অন্ধকারে আঁচল টানে অভিমানিনী রাধার।

এক হ্যাঁচকা টানে থামিয়ে দেয় যেন চলন্ত রাধাকে। চমকে শিউরে উঠলো সে। সক্রোধে ফিরে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠতে পারে না ধরা পড়ার ভয়ে, বাড়ীর লোকের কাছে। সাপের মত ফোস করলো যেন রাধা। ফিরে দাঁড়িয়ে কি বললে,—কেঃ ?

— আমি রে ঠাকুরঝি।

—কেঃ ? জয়াবৌদি ?

—হ্যাঁ।

—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো তখন থেকে ?

—হ্যাঁ ভাই। শুনছিলুম তোদের প্রেমালাপ। ধন্যি মেয়ে বটে তুই ! ভাগিয়ে দিতে হয় এমন নিষ্ঠুরের মত ?

চোখভরা জল রাধার। ছলছল দুই চক্ষু। অনুতাপের জ্বালা ধরছে যেন বুকে। এমন কড়া কড়া কথাগুলো না বললেই হয়তো চলতো। কিন্তু কত জ্বালায় যে কথা ক'টা রাধা বলেছে, তা হয়তো কেউ জানে না। সমবয়সী আত্মীয় আর প্রতিবেশীদের কেউ আর বাদ নেই এখন, সকলেই পেরিয়ে গেছে একে একে। শুধু রাধাই আছে একলা-সঙ্গী। পাত্র জোটে তো দাবী মেটানো যায় না। দাবী যদি মিটলো, পাত্র পছন্দ হয় না। পর্ব্বতপ্রমাণ দাবী করলো হয়তো বরপক্ষ, নয়তো খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, পাত্রটি স্রেফ্ উজবুক আর অশিক্ষিত। দুইয়ের সমন্বয় হয় না, তাই রাধাকেও থাকতে হয় কুমারী। কুড়ির ঘরে পা পড়লো, তবুও এখনও সিঁদুর উঠলো না সীঁথিতে। আইবুড়ী নাম ঘুচলো না। মরুপথে নদীর ধারা যে হারাতে চললো সত্যিই !

ঘন অন্ধকার, তাই দেখা যায় না।

আঁচলে চোখ মুছলো রাধা। বললে,—ভাগিয়ে দিয়েছি, বেশ করেছি! বিয়ে যদি না করতে পারে, কি সম্বন্ধ আমার সঙ্গে?

—তাই ব'লে অমন মুখ-ঝামটা দিয়ে তাড়িয়ে দিবি। আহা, এসেছিল হয়তো কত আশায় আশায়!

—খুব চিনি আমি। পুরুষরা ঐ ধরণেরই হয়, কাজ বাগিয়ে কেটে পড়ে। কথা বলতে বলতে আবার রাধা চোখ মুছলো আঁচলে। তপ্ত অশ্রুধারা মুছলো।

—দয়া মায়া নেই তোর মনে, যাই বল্ কেন।

চুপচাপ থাকলো রাধা। সত্যিই যেন দিনকে দিন কেমন নির্দ্দয় আর আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে সে। আগে যেন ছিল শান্ত-কোমল। এখন কঠোর, কঠিন, মমতাবিহীন। আগের দিনের সেই নম্রতা আর নেই। এখন যেন শুধু রুক্ষ-রুষ্ট, তিতিবিরক্ত।

রৌদ্রের আলোয় যেন ঝলসে-যাওয়া ফুল। সুগন্ধ উবে গেছে। রঙ জ্ব'লে গেছে। কবে বুঝি পাপড়ি খ'সে ঝরে পড়বে!

ঝিঁঝিঁর ডাক কখনও থামে, কখনও চলতে থাকে। মাঝে মাঝে যেন দম ফুরিয়ে যায় ক্ষণেকের তরে। সাথীহারা বেড়ালটা ডাকছে তো ডাকছেই। হয়তো কাঁদছে। কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে বিড়ালী! কে যে চুরি করেছে, কে জানে।

রাধার চোখের জল বুঝি শুকিয়ে যায়। বলে,—বেড়ালের কান্না ভাল নয় বৌদি! বেড়াল ডাকলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়।

—তা জানি। অমঙ্গলের বাকী কিছু আছে? জমিদারী চলে যাচ্ছে বাস্তবাড়ী বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। কে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে বলতে পারে?

—কেন এমন হ'ল ভাই?

—জমিদারবাবুদের দোষে। জয়াবৌ কথা বলে সামান্য জোরাল কণ্ঠে। বললে,—ওড়ালে আর পোড়ালে টাকা থাকে কখনও! উড়িয়ে আর পুড়িয়েই চন্দনধামের বাবুরা ফতুর হয়ে গেল।

কথায় কেমন যেন আক্রোশ ফুটিয়ে রাধা বললে,—কোন' দিকে দিকপাতই নেই বাবুদের, শুধু নিজেদের নিয়েই মত্ত হয়ে আছেন! কোথা থেকে যে আসবে, কোথা থেকে যে চলবে তার ভাবনা-চিন্তা নেই।

রাধা হয়তো ব'লতো না এ সব কথা। সত্যিই যে দৃকপাত নেই চন্দনধামের বাবুদের। চোখ নেই যেন কোন কিছুতেই। আর তাই যদি থাকতো, রাধা কি তবে এতদিনেও থাকতো অবিবাহিত। কবে তার বিয়ে হয়ে যেতো। লজ্জা থাকতো না, অপমানের জ্বালায় জ্বলতে হ'তো না রাধাকে। চন্দনধামের বাবুদের প্রতি রাধার কোন রাগই থাকতো না। কিন্তু এখনও যে সিঁদুর পড়লো না সীমন্তে, মাথায় ঘোমটা উঠলো না।

দালান ধরে এগোতে এগোতে কথা বলাবলি চলতে থাকে। দালানে যেন একটা একটা কথার প্রতিধ্বনি ভাসতে থাকে। চন্দনধামের এই পরিত্যক্ত অংশ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে দু'জনে। কেমন যেন গা ছম ছম করতে থাকে। ভয় ভয় করে।

পরিত্যক্ত অংশ যেন দানবের মত হাঁ করে আছে। একটা কুটো পড়লে শব্দ ওঠে, এমনই ফাঁকা। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমন অন্ধকার। উঠানে ঘাস গজিয়েছে; আলিশা, কার্নিশ আর পাঁচিলে বট আর অশ্বত্থের চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে পশু আর পাখী বাসা বেঁধেছে। পায়রায় ডিম পাড়ছে। বিল্লী বাচ্ছা বিইয়েছে গণ্ডায় গণ্ডায়। সাপে খোলস ছেড়েছে। দালানের কোথাও ডিমের খোলা, কোথাও মরা

বিড়াল-ছানার অস্থি, আবার কোথাও বা সাপের খোলস। হাওয়ায় যেন দুর্গন্ধ বইছে।

কোন্‌দিন হয়তো ঝড়ের দোলায় ধ্বসে পড়বে এই অংশটা।

—আচ্ছা বৌদি, তোর কষ্ট হয় না? রাধা কথা বললে কতক্ষণ পরে।

—কেন? কষ্ট হবে কেন?

—আমি হ'লে থাকতে পারতুম না। বিগড়ে যেতুম ঠিক। তাপসদা তো শয্যাশায়ী, পঙ্গু!

এক ঝলক লজ্জা নামে জয়ার মুখভাবে। দুঃখের লজ্জা। কথাগুলি শুনতে শুনতে হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে! সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলতে থাকে লজ্জার ব্যথায়।

তবুও হাসলো জয়া। ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার ঠোঁটের ফাঁকে। বললে,—ও সব কথা যেতে দে ঠাকুরঝি। কপালে যা আছে—

—কপাল! বিশ্বাসই করি না আমি। কেমন যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে রাধা। জোরাল কণ্ঠে। বলে,—আমি যদি তুই হতুম দেখতিস কি করতুম! কপালতো মানুষের নিজের হাতে।

—এমন যেন কারও না হয় কখনও। পরম শত্রুরও যেন না হয়!

—তাইতো তোকে দেখলে আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকে!

কথায় দুঃখ ফুটিয়ে কথা বলে রাধা। সহানুভূতি ফুটিয়ে।

হঠাৎ কোন্ এক ঘর থেকে সামান্য এক ফালি অস্পষ্ট আলো পড়লো মুখে। যত এগোতে থাকে তত যেন স্পষ্ট হয় আলো। তত যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে দু'জনের মুখে। মিশ্‌কালো অন্ধকার থেকে আলোর আভায় এসে আসল রূপ যেন চোখে পড়ে।

—কে লা তোরা ?

কোথা থেকে প্রশ্ন করলে এক বৃদ্ধা নারীর কণ্ঠ।

চমকে উঠলো দু'জনে। রাধা আর জয়া। পরস্পর দু'জনে দু'জনের টেপাটেপি করলো।

ফিসফিস বললে রাধা,—কাণ আছে তো বুড়ীর !

—কি হবে ঠাকুরঝি। যদি বলে, এদিকে কেন আসছো ?

আবার সেই বৃদ্ধা নারীর কণ্ঠ কথা বললে,—কে ? কথা কও না কেন ? কে জানে বাবা, চোর-ছ্যাঁচোড় নয়তো ! কে গা তোমরা ?

যে-ঘর থেকে আলো ছড়িয়েছে, সে-ঘরে আছেন কে এক নারী, যাঁর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠ।

রাধা হাসতে শুরু করলো বুড়ীর ব্যস্ত কথায়। মুখে আঁচল পুরে ধরলো। ঈষৎ ঝুঁকে পড়লো হাসতে হাসতে। তাই না হেসে পারলো না জয়া, সেও হাসতে থাকলো সঙ্গে সঙ্গে।

—ভয় দেখাবি বৌদি ?

হাসির বেগ কমিয়ে বললে রাধা।

—না ভাই। সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যদি চেঁচিয়ে-ফেঁচিয়ে ওঠে !

বৃদ্ধা আবার বললেন,—কে তোমরা ? কথা নেই কেন ?

হাসতে হাসতে যেন লুটিয়ে পড়ে রাধা। ঘরের দরজার কাছে এগোয় বৌদির একটি হাত ধ'রে, টানতে টানতে। জোর ক'রে হাসি থামায় রাধা। বলে,—ছোট্‌ঠাগ্‌মা, আমরা এসেছি চুরি করতে। কে বল'তো আমরা ?

—তাই বল'। আমি ভাবনু কে না কে ! আচ্ছা মেয়েতো তোরা ! বৃদ্ধা কাঁপা কাঁপা স্বরে কথাগুলি বললেন।

—আমি কে তাই বল' না।

—রাধা না তুই ?

পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো দু'জনে। চোখ বড় ক'রলো রাধা। অবাক-দৃষ্টি ফুটলো বিস্ফারিত চোখে।

—চোখই না হয় গেছে, কান যাবে কোথায় !

ছোটঠাকুমা বললেন সামান্য গর্ব্বের ভঙ্গীতে। বললেন,—ইদিকে কি মনে ক'রে ?

এ দেখলো ওর মুখপানে। রাধা বললে,—চুরি করতে এসেছি ছোট্‌ঠাকুমা।

বৃদ্ধা দৃষ্টিহীনা। ক'বার ছানি কাটিয়ে কাটিয়ে এখন আর চোখে দেখতেই পান না। প্রায় আটের কোটায় পা দিয়েছেন বলতে গেলে। শীর্ণ হয়ে পড়েছে দেহ, চর্ম্ম লোল হয়ে গেছে। এককালে নাকি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, এখন দেখলে কে বলবে। সেই টানা টানা চোখ এখন কোটরগত। ডালিম-লাল অধরের ফাঁকে দন্তহীন মাড়ি। পিঠ ভর্ত্তি কালো পশমের মত রাশি রাশি চুল ছিল কে বলবে। মাথায় এখন কদম ছাঁটের পক্ক কেশ। সেই ভরাট দেহ এখন বাঙলা 'দ' অক্ষরের মত ত্রিভঙ্গ আকার হয়ে গেছে। অন্ধ হয়ে পড়েছেন শেষ বয়সে, তাই আছেন কারাবাসিনীর মত, চার দেওয়ালের ঘরে। কারায় পাহারার প্রয়োজন নেই, কয়েদী সম্পূর্ণ অন্ধ।

—কি আর চুরি করবে ভাই! এই হাড় ক'খানা? কিই বা আছে আমার!

বৃদ্ধা যেন হেসে কথা বলেন। শব্দহীন হাসি।

ছোটঠাকুমার ঘরে সত্যি কিই বা আছে। মান্ধাতার আমলের যত কিছু ডেয়ো-ঢাকনা আর ক'খানা ফেঁসে যাওয়া থান কাপড় ছাড়া কিই বা আছে এই ঘরে। ঝুল-কালো দেওয়ালে টাঙানো ক'খানা রঙীন ছবি,

যত সব দেবদেবীর। কালীঘাটের কালী, দশভুজা দুর্গা, ধরিত্রীর অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধাত্রীর ছবি।

—তা এয়েছিস যখন কষ্ট ক'রে, আয় দু'দণ্ড গল্প করি তোর সঙ্গে।

ছোটঠাকুমা অবরোধবাসিনী, দৃষ্টির শক্তি হারিয়েছেন।

—এই মাটি ক'রেছে।

ফিসফিসিয়ে স্বগত করে রাধা। বলে,—ছোট্ঠাগ্‌মা, আর কে আছে বলতে পারো? আমার সঙ্গে?

—কে? দেখতে তো পাইনে ভাই।

—তোমার এক নাতবৌ।

—কে বল্‌তো?

—জয়াবৌদি।

—অ।

—ডেকে তোমার পাশে বসাও ছোট্ঠাগ্‌মা। ও খু—ব গল্প করতে পারে।

—রক্ষে কর' ভাই! তোমার দাদার রাতের খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তুমিতো জানো। তারপর—

—থামলে কেন? তারপর?

জয়ার মুখে প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্য। মুখের হাসি কোথায় যেন মিলালো চোখ নামালো জয়া। ভূমিতে দৃষ্টি রেখে বললে—তারপর আজ জমিদারবাবুরা না কি ককটেল পার্টিতে মেতে উঠেছেন। আজ শুনছি একেবারে হোল্ নাইট পারফরমেনশ্‌!

—তাতে তোর ভয় কি? তোর বরতো আর মাতেনি।

—ভয় আছে বৈকি। ভয় না থাকলে আর বলছি কেন!

ভ্রু কুঁচকে উঠলো রাধার। তেমনি চোখ পাকিয়ে বললে,—কেন তাই শুনি!

মিহি হাসির ক্ষীণ হাসির আভাষ খেলে যায় জয়ার মুখে। খানিক চুপচাপ থাকতে থাকতে বলে,—ড্রিঙ্ক করলে শুনতে পাই আপন পর চিনতে পারেন না। এখন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।

— যাও না তুমি। কে তোমাকে, ধরে রেখেছে?

রাধার ভ্রু আর সোজা হয় না তখন থেকে। কথার সুরও যেন তেমন আর নেই। কেমন যেন রাগো রাগো।

—তাই যাই ভাই।

কথা বললো আর গুণ্ঠন টানলো জয়া। আকপাল ঘোমটা টেনে চললো তরতরিয়ে।

রাত কত কে জানে। হয়তো দশটা বেজে গেল এতক্ষণে। তাপসমোহনের রাতের পথ্য দেওয়ার সময় উৎরে গেল। জয়া পা চালালো অন্ধকারে। সাপের মত হিলহিলিয়ে এগিয়ে চললো দালান উঠোন ঘরে। এক মহল থেকে আরেক মহলে যেতে হবে, কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে। কত অন্ধকারের জটলা ছাড়িয়ে তবে সেই তাপস-মোহনের ঘর।

পঙ্গু, অনড়, অচল, স্থবির তাপসমোহন। হয়তো বাঁচবেন না, তাই ভগ্নহৃদয়। বুঝতে পেরেছেন তাপসমোহন। পাপ করেছিলেন একদা। অজস্র অর্থব্যয়ে ব্যাধি কিনেছিলেন। যাদের দেহ পোকায় কাটা, যারা কীটদষ্ট, তাদের দেহ থেকে তাপসমোহনের দেহে বিষ ছড়িয়েছিল।

জয়া চলেছে তো চলেছেই। পথও যেন আর শেষ হয় না। দালান উঠান, সিঁড়ি, যেন আর শেষ হয় না। ভয়ে যেন সিঁটিয়ে যায় সে।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিষণ্ণ ঠেকছে রাধারাণীর। বড় বিশ্রী লাগছে এই ঘুপসি ঘরের বদ্ধতায়। হাঁফ ধরছে যেন। পরণের জামটা ঘামতে শুরু করেছে। রাধা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে করুণ চোখে। গোপন অভিসারের সঙ্গিনী বেঁকে দাঁড়ালো। কথায় সায় দিলো না জয়াবৌদি। মুখের ওপর কথা শুনিয়ে চ'লে গেল তাকে একা ফেলে।

তালি-পড়া নীলাম্বরী শাড়ীর আড়ালে রাধার বুক ওঠা নামা করে ঘন ঘন। ছোটঠাকুমার ঘরের অল্প-আলো প্রদীপের সোনালী আভায় রাধাকে দেখায় যেন সিলুয়েট্ ছবি। দেখা যায় না যেন, শুধু দেখা যায় রাধার ডাগর দেহের বহিরেখা। নীলাম্বরীর আবরণ আছে কে বলবে! যেন অন্ধকারের কালি মেখেছে সে। রাতের কালো-কাজল মেখেছে।

—হ্যাঁ ভাই, অমন চুপ মারলে কেন? মুখে কথা নেই কেন? বৃদ্ধা বললেন অন্ধ চোখ মেলে। প্রদীপের স্বল্প-আলোয় তাঁকে দেখায় বড় ভয়াবহ। দৃষ্টিহীন চোখ দু'টিতে স্থির চাউনি। অস্থিসার কুব্জ শরীরে অসংখ্য কুঞ্চনরেখা। বিবর্ণ দেহাবরণ। শীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কথা বলতে গেলে মাথাটি ঠকঠকিয়ে কাঁপতে থাকে। ক্ষীণ ও কম্পমান কণ্ঠস্বর!

বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে রাধারাণীর। বিষণ্ণ চোখে বিমর্ষ দৃষ্টি। গম্ভীর মুখে প্রচ্ছন্ন হতাশা। কড়া কড়া বাক্য শুনে চলে গেছে তপনকৃষ্ণ, আর কোনদিন আসবে কি না কে জানে। অনুশোচনার জ্বালা ধরে রাধার দেহ আর মনে। বড় বিশ্রী লাগে যেন এই চার দেওয়ালের ঘর, বৃদ্ধা ছোটঠাকুমাকে।

রাধা ঢোঁক গিললো। গলা শুকিয়ে গেছে যেন। বললে,—মন-মেজাজ ঠিক নেই ছোট্‌ঠাগ্‌মা।

—কেন লা, মনের আবার কি রোগ ধ'রলো?

নীরব রাধা। যেন নিস্পন্দ। ঘরের দরজার একটি কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। নিরাশায় যেন ভেঙ্গে পড়েছে। মুখে যেন কথা নেই, বোবা যেন।

ছোটঠাকুমা উত্তর না পেয়ে বলেন,—হ্যাঁ ভাই রাধা, বে থা হচ্ছে না, তাই বুঝি অভিমান হয়েছে?

—ধ্যেৎ!

—প্রজাপতি দয়া না করলে, ফুল না ফুটলে কি হয় ভাই!

রাধা হেসে ফেললো! ম্লান হাসির মৃদুরেখা ফুটলো তার ঠোঁটের কোণে। বললে,—কি যে তুমি বল' ছোট্‌ঠাগ্‌মা!

চন্দনপুর তথা সমগ্র বাঙলার ছেলেদের প্রতি রোষ দৃষ্টি হানলো রাধা।

ঘর মেলেতো ঘরানা মেলে না। ছেলে মিললো যদি কথায় মিললো না। কোথায় একটা অমিল আছে রাধার মিলনপথে। কে জানে, সম্বন্ধ আসতে না আসতে কেঁচে যায়। পাকা কথা পর্য্যন্ত এগোয় না, কি কুগ্রহ!

রাধা বললে,—প্রজাপতির দয়া ফয়া সত্যযুগের কথা। পারতো আমার বাবা অফুরন্ত ঢালতে তা হ'লে কি আর—

—পোড়াকপাল আমাদের রাধা! তা না হ'লে আমাদের অত সাধের জমিদারী কেড়ে নিচ্ছে কংগ্রেস!

ছোটঠাকুমার শীর্ণ শীর্ণ হাত দু'টো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও যেন অস্থির হয়ে ওঠেন। বলেন,—খুঁজে পাচ্ছি না কেন রাধা?

—কি ছোট্‌ঠাগ্‌মা?

অবাক মেনে বললো রাধা। ঘুরে দাঁড়ালো।

—আমার আফিমের কৌটটা।

চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। চোখ থাকতেও চোখ নেই। যখন তখন হারিয়ে ফেলেন যা কাছে থাকে। ইদিকে রাখতে সেদিকে রাখেন। হেথায় রাখতে সেথায় রাখেন। শীর্ণ হাত দুটো হাতড়াতে থাকেন, খুঁজতে থাকেন দরকারের বস্তু।

—আফিমের কৌট! চমকে উঠলো রাধা।

—হ্যাঁ ভাই। কোথায় ফেলেছি বল্‌তো?

—দেখো না খুঁজে, আছে নিশ্চয়ই কোথায়।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল রাধা। প্রদীপের আলো সিলুয়েট্‌ ছবি এতক্ষণে যেন পরিচ্ছন্ন ফটোগ্রাফে পরিণত হয়ে উঠলো। আলো ছড়ালো রাধার মুখে। কি বিষণ্ণ বিমর্ষতা সেই মুখে।

হ্যাঁ, ঠিক এই মুহূর্ত্তে যেন প্রয়োজন ছিল একটুখানি আফিমের। ছোটঠাকুমার কাছে এগিয়েছে রাধা। এলোপাতাড়ি খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে মাদুর—বিছানা হাতড়ে।

—কোথায় ফেলেছি কে জানে! কার হাতে আবার পড়বে!

—এইতো রয়েছে তোমার পায়ের কাছে।

খুঁজতে খুঁজতে বললে রাধা। আফিমের ছোট কৌটটা তুললো নিজের হাতে। খুলে ফেললো কৌটর ঢাকনি। কি বিশ্রী গন্ধ।

এক ঝলক বিষাক্ত গন্ধ নাকে ভেসে আসতেই রাধার মুখে বিকৃতির রেখা ফুটলো। গা গুলিয়ে উঠলো যেন। বমি আসলো।

—দাও ভাই। বাঁচালে দিদি।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণ হাত তুললেন প্রবৃদ্ধা। হাত মেললেন। কৌটটা সেই হাতে বসিয়ে রাধা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। পলকহীন চোখে দেখে বুড়ী কোথায় রাখে ঐ বিষের কৌট।

জানতো না তো রাধা। লোকের জিজ্ঞাসু চাউনি আর মামুলী কথাগুলো শুনতে শুনতে যখন গা জ্বলতে থাকে, লজ্জা আর অপমানে যখন চোখ ফেটে জল পড়তে থাকে; তখন লোকের সেই দৃষ্টি আর কথাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

রাধা ভাবছিল তাই, এই তো উপায় আছে এড়ানোর। লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার ওষুধ আছে। এইতো রয়েছে।

কত কত দিন সকালের খবর-কাগজে রাধা পড়েছে কত কার খবর —প্রথম পৃষ্ঠায় যাদের ঠাঁই মেলে না। কাগজের পাতা উলটে উলটে, কলম হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে হয়, কোথায় সেই এক টুকরো করুণ সংবাদ —রয়টার, ইউ, পি'র নয়, স্রেফ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত। ষ্টাফ. রিপোর্টার প্রদত্ত। গ্রামের খবর যদি হয় তখন হয় সংবাদদাতা আর শহুরে খবর দেন ষ্টাফ্ রিপোর্টার। কতদিন রাধা কাগজে পড়েছে, জনৈক যুবতীর অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যার বিবরণ। কতটা আফিম, কখন খেয়েছে, খাওয়ার কতক্ষণ পরে মৃত্যু হয়েছে, সব তথ্যই আছে! বিবরণে ভুল নেই, তবে কারণ অজ্ঞাত। আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই!

গায়ে যেন কাঁটা দেয় রাধার। ভয় ভয় করে। মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পায় নাকি! বুড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। চললো যেদিকে দু'চোখ যায়। কে আবার কান্না শুরু করলো কে জানে! কানে যেন কান্না শোনে।

কার আবার কোথায় ব্যথা বাজলো। এমন করুণ-করুণ সুরে কে কাঁদলো কোথায়!

বাতাসে কান্নার তরঙ্গ যেন।

বোশেখের এলোমেলো হাওয়া, কোথা থেকে আসছে যেন ঝড়ের মত। চোখে-মুখে অফুরন্ত চুমু খেয়ে আবার কোথায় পালায় চকিতের মধ্যে। কখনও গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত ন'ড়ে না, কখনও গাছে গাছে জড়াজড়ি চলে। কাজল-কালো আকাশ থেকে যেন দুরন্ত বেগে নামতে থাকে পৃথিবীর বুকে, রাশি রাশি মেঘশীতল কালো বাতাস। আসে আর ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, ধরা দেয় না। হাওয়ার গতি বোঝা দায়।

চাপা-কান্নার ব্যথাতুর গুমরানি শুনে প্রকৃতির হাওয়া বুঝি থমকে থাকে। স্থির হয়ে থাকে।

সারেঙ্গীর সুরেল কান্না কতদূর থেকে কানে আসে। কখনও দ্রুত, কখনও বিলম্বিত, সুরের ওঠানামা চলছে তো চলছেই। তানপুরা, সারেঙ্গী আর ডুগী-তবলার মেলামেশায় চন্দনপুর নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এমন জনবহুল গ্রাম-শহরে মানুষের বসতি কি না বোঝা যায় না। রাতের চন্দনপুর, যেন অন্য মূর্ত্তি এখন তার। শুধু গান-বাজনার শব্দটুকু ভেসে ভেসে বেড়ায় এখান থেকে সেখানে। মজা পুকুর, পোড়োবাস্তু, বুনো ওলের বাগিচায় ছুটে ছুটে বেড়ায় হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা, গান আর তারের গোঙানি।

বাবুদের কারও কারও নেশা লেগে গেছে। কড়া হুইস্কির কড়া নেশা। জ্ঞানগম্যি থাকে কি না থাকে। কতদিন বিদেশী ওয়াইন আর লিকুয়ের চোখে দেখা নেই, রসনায় নেই তাদের আস্বাদন। দেশীর সঙ্গে বিদেশীর তুলনাই চলতে পারে না। দেশী জলে শুধু দুর্গন্ধ, বিদেশী জলের ব্লেন্ড্ নাকে লাগলেই গন্ধে গন্ধে নেশা ধরে যায়।

আজ রাতের মত বাবুরা যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছেন হুইস্কি, জিন আর ব্র্যাণ্ডির জোয়ারে। আজকের মত ভাঁটা আর পড়বে না। কোন রকম বাধা-নিষেধ নেই, যে যত পারো খাও। সহ্য করতে না পারলে, দাঁড়াতে

না পারলে, প'ড়ে থাকো কেন ফরাসে মুখ থুবড়ে। পেটে না সয়, উগ্‌রে ফেলো যখন খুশী। গলায় আঙুল চালিয়ে।

কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ টেনো না যেন কোন মতে। অন্ততঃ আজ রাতের মত চালাও যত পারো। ভারত-আইনের কেতাব থেকে সূর্য্যাস্ত আইনের পরিচ্ছেদ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন হয়তো এ জীবনে ও মুখ আর না দেখতে পারো।

শিশু সরকার তার চেয়ে যদি আকাশের চাঁদ চেয়ে বায়না ধ'রতো! জমিদার আর জমিদার থাকবে না; জমিদারের হাতে আর খাজনা আদায়ের ভার থাকবে না, জমিদারকে আর ডাকবে না মধ্যস্থতার কাজ করতে। জমি বিলির পাট চুকে যাবে। কাছারীতে তালা পড়বে।

প্রকট মরণ যেন দিনকে দিন এগিয়ে আসছে। জমিদার আর জমিদার থাকবে না। যরে জমি তাকে দেওয়া হবে। লাঙল যার জমি তার হবে।

নাচঘরে তখনও নাচ শুরু হয়নি তবু।

রাত্রি আরও গভীর হোক, আরও ঘন হোক কালো আঁধার। সারা চন্দনপুর ঘুমিয়ে পড়ুক। নেশাটা আরও একটু জ'মে উঠুক। তারপর।

তারপর নর্ত্তকীর নাচ, বাঈজীর গান বাবুদের যেমন খুশী চলবে। আসর জাঁকাবে মতিবিবি আর নূরজাহান। নাচবে, গাইবে, কথা বলবে চোখে চোখে, ঢলাঢলি করবে।

বড়বাবু চন্দ্রমোহনের এখনই ঢুলু ঢুলু রক্তিম আঁখি। সোজা আর বসতে পারছেন না যেন। চোখে সহ্য করতে পারছেন না ঝাড়লণ্ঠনের জোরালো আলো। মাথার টেরী ঠিক নেই আর, আলুথালু চুল। বড় বেশী লাল হয়ে উঠছে তাঁর কর্ণমূল আর নাসিকা।

শোরীর খেয়াল গান শেষ হতে না হ'তে আবার গান ধরেছে কে!

বাবুদের মধ্যে গান-বাজনার সমঝদার বেশী যিনি, তাঁর নাম সতু ওরফে সত্যেন্দ্রমোহন। হঠাৎ বললেন কথা,—এ গান তোমার শেষ ক'রে দাও, নূতন সুরে বাজাও বীণাখানি।

ধ্রুপদ আর ধামার থেকে খেয়াল ঠুংরী। মার্গ-সঙ্গীতের শেষ চুটকি গজল?

গায়ক সলজ্জায় থামলেন শুরুতেই। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রোধ করলো হঠাৎ। তানপুরা, তবলা আর সারেঙ্গী থামলো যুগপৎ।

চন্দ্রমোহন বললেন,—যখনকার যা তখনকার তা। স্থান কাল আছে সব কিছুর। গান-বাজনারও তাই!

সত্যেন্দ্রমোহন গুছিয়ে বসলেন নিজে। একটি তাকিয়া তুললেন কোলের 'পরে। দুই বাহু রেখে বললেন,—এখন সামার সীজ্‌ন, যাকে বলে তোমাদের ভরা গ্রীষ্ম। পাক্কা বোশেখ মাস এটা। দেয়ারফোর এই সীজ্‌নের গানই গাও না কেন।

—কোন্ গান অর্ডার করুন আপনি! যেমন বলবেন তেমনিই গাইবো।

গায়ক কথা বললে সবিনয়ে। যেন নিবেদন করলে।

চন্দ্রমোহন হো হো শব্দে হাসি ধরলেন কেন কে জানে! অর্থহীন হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,—ভরা দুপুরে যদি কেউ গায়, নিদ নাহি আঁখি-পাতে। কনকনে শীতের রাত্রে যদি ধরা হয়, এ ভরা ভাদর। কিংবা খটখটে গরমের দিনে যদি কেউ গাইতে থাকে, এমন দিনে তারে বলা যায়? নয়তো ঝমঝমে বর্ষায় যদি গাও বসন্তের গান!

গাইয়ে আর বাজিয়েরা নীরব শ্রোতার মত ব'সে থাকে চুপচাপ। গুরু যেন পাঠ দেন, শিষ্য শোনে যেন একাগ্রচিত্তে।

সত্যেন্দ্রমোহন বললেন,—ঠিক কথাইতো। যখনকার যা। শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ছয় রাগ গাইবে ছয় ঋতুতে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—এ্যাজ ফর একজাম্‌প্‌ল্‌?

ত্ব'এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবতে থাকেন সত্যেন্দ্রমোহন। মনে মনে যেন খতিয়ে নেন। তারপর বলেন,—সঙ্গীত-রত্নাকরে আছে, ভৈরবো মালকোশশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা। শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃস্মৃতাঃ।

—অর্থাৎ? চন্দ্রমোহন শুধোলেন। নিমীলিত চোখ মেললেন। বললেন,—মানেটা বাংলে দাও সতু। দেবভাষা যে বুঝি না আমরা কেউ।

সত্যেন্দ্রমোহন বলেন,—গ্রীষ্মে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালকোশ, শীতে শ্রীরাগ, বসন্তে হিন্দোল গাওয়াই আমাদের প্রথা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে গাওয়ার নিয়ম অন্য আর কোন সভ্য দেশেই নেই।

সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা কারও কারও ভাল লাগে না। গান-বাজনা শুনতেই ভাল লাগে, যেমন শুধু পড়তে ভাল লাগে গল্প আর কবিতা। কাব্য আর সাহিত্য! কে আর জানতে চায় সাহিত্যের ভাষার উৎপত্তি, ব্যাকরণ, ব্যবহার-রীতি!

অখিলমোহন গুম হয়ে ব'সেছিলেন নিজের বন্ধুদের মধ্যিখানে। শুনছিলেন, কে কি বলে না বলে। যেন থাকতে না পেরেই তিনি বলেন,—লেকচার ফেকচার ভাল লাগছে না আর। এটা তো গান-বাজনার স্কুল নয়, ভুলে যাও কেন? পয়সা খরচা ক'রে এই নিরস বক্তিমে শুনতে হবে না কি!

গানের সুর নেই। বাজনার ধ্বনি থেমে গেছে। নাচঘর যেন থমথম করছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে দুলিয়ে দিয়ে যায় ঝাড়লণ্ঠন;

দুয়োরে ঝুলানো লাল ভেলভেটের পর্দ্দা। দেওয়ালের ছবিতে টাঙানো ফুলের মালা।

—গানের পালা চুকিয়ে দিয়ে নাচের পালা শুরু হোক না।

কে যেন কথার পিঠে কথা জুড়লো নিজেকে লুকিয়ে।

—গান-বাজনা যেদিন খুশী চালাতে পারো। কিন্তু—

বড়বাবু চন্দ্রমোহনের যেন সাড় ফিরলো। তাকিয়ায় এলিয়ে ছিলেন তিনি। সোজা হয়ে বসলেন। একটি সিগারেট ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,—বেশ তাই হোক। বহুৎক্ষণ গান-বাজনা চলেছে, আর নয়।

সিনেমার হাফ্-টাইমের মত, মঞ্চাভিনয়ের বিশ্রামের মত, ক্ষণেক বিরতি পড়লো। একটি অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল নাচঘরে। যাঁরা ছিলেন নীরব গম্ভীর, তাঁদের মুখে মুখে হাসি আর কথা ফুটলো। ব'সে থেকে থেকে যাঁদের পায়ে ব্যথা ধ'রে গেছে, তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। নাচঘরের বাইরে চলে গেলেন যেন ব্যথা ছাড়াতে। টলটলায়মান কেউ কেউ। উগ্র নেশার ঘোরে কেউ কেউ বোবা হয়ে গেছেন যেন।

নাচঘরের ফরাসের কোথাও কোথাও শূন্যতা বিরাজ করে। ঘরের হাওয়া যেন হালকা হয় এতক্ষণে। হাওয়ায় মদ, সিগারেট আর ফুলের গন্ধের মিশ্রণ।

—বাঈজীদের ডেকে আনছি আমি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাচ শুরু হবে। ভেবো না কেউ। আমি যাবো আর আসবো।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রমোহন। টলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলেন নিজেকে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নাচঘর ত্যাগ করলেন।

অস্পষ্ট গুঞ্জন স্পষ্টতর হয়। বড়বাবু নাচঘরে নেই, কথার তোড় আর

হাসির মাত্রা ক্রমেই যেন বাড়তে থাকে। মাতলামি আর হাসাহাসির রেশারেশি চলতে থাকে যেন। দেওয়ালে ঝুলানো সারি সারি তৈল চিত্র। চন্দনধামের বিগত পুরুষরা—যেন উত্তরপুরুষদের বেলেল্লাপনায় সক্রোধে তাকিয়ে আছেন নিষ্পলক চোখে। মৃতজনদের আশপাশে আরও ছবি আছে—নগ্নকায়া নারীমূর্তির তেলরঙ ছবি। মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, বটিচেলী, গগাঁ, রেনল্ড আর লুত্রেকের নকল ছবি—দেশী শিল্পীর ব্যর্থ অনুকৃতি মাত্র।

—যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ বন্ধ থাকে কেন? রণে ভঙ্গ দিই কেন?

—হ্যাঁ, তাই না তাই। গান না চলে বাজনা চলুক।

—ধ্যেৎ ঘোড়ার ডিম! গান-বাজনা তো রেডিও খুললেই শোনা যায়! মতিবিবি আর নূরজাহানের নাচ কি আর ইহজীবনে দেখা হবে? গান-ফান বাজনা-টাজনা লাগে না ওদের পায়ের কাছে।

—পায়ে তবে গড়িয়ে পড়'। ওদের পায়ে গড়াগড়ি খাও।

—ওদের পায়ে গড়াতে হলে তোর আমার ধাতে সইবে না। পায়ের তলায় পিষে যাবো। লক্ষপতি কোটিপতি হওয়া চাই।

—কোটি আর লক্ষপতিদের একজন হওয়া চাই, নইলে নয়?

—আলবৎ!

—এক রাতের জন্যে যদি হই? একটা রাতে তো আর এক লাখ খরচা হয় না।

—এক হাজার তো হয়।

—হ্যাঁ, তা হয় বটে। তবে পাই কোথা তাও?

—তবে? মারবে লাথি আর হাটিয়ে দেবে।

—মতিবিবির পায়ের লাথি? না জানি কত মিষ্টি!

বৈশাখ রাতের দমকা হাওয়ায় লাল ভেলভেটের পর্দা নেচে উঠছে

যেন নিতম্ব দুলিয়ে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ভেলভেটের লালিমা খেলছে আলোছায়া। নাচঘরে বেলা আর যুঁইয়ের তীব্র গন্ধ ভাসছে। ঘূর্ণায়মান বিজলী পাখার সজোর বাতাসে পাক খায় অনেক সিগারেটের ধূম্রজাল।

বেয়ারা গোলাপ জল ছিটোয় দূরে দাঁড়িয়ে, রূপোর পিচকারী থেকে। নাচঘরে কথার তুবড়ি ফুটতে থাকে যেন। দমকা হাওয়ায় ছেঁড়া ছেঁড়া কথার টুকরো, জানলার বাইরে বেরিয়ে যায়। হাসির শব্দ ছুটতে থাকে, যেন হাসতে হাসতে।

রুনুঝুনু আওয়াজ নাচঘরের এক দুয়োরে। ঝমা ঝম, ঝমা ঝম ধ্বনি। ঝুমুর-পরা পায়ের পা ফেলার শব্দ। প্রতি পদক্ষেপে শব্দ ওঠে! কথার তোড় আর হাসির হিড়িক মন্ত্রবলে যেন স্তিমিত হয়ে গেল। স্বর্গ থেকে অপ্সরী নামছে, নাচতে নাচতে। মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী না অন্য কেউ? নেচে নেচে এমন এগিয়ে আসছে, পায়ে তাল ঠুকে ঠুকে!

উড়ু উড়ু বাতাসে ওড়না উড়লো মাথার! নূরজাহানের মুখ থেকে যেন মেঘের আবরণ স'রে গেল। পূর্ণচাঁদের মত সোনা-রঙের মুখ যেন নূরজাহানের। টানা টানা চোখের কোনে মিহি স্থর্মার টান। রাঙা অধর। ঠিকালো নাকে এক বিন্দু হীরা জ্বল জ্বল করছে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়।

সাপুড়িয়া সাপ খেলায়, এ চিরদিনের প্রথা। সাপও কখনও কখনও খেলায় আবার সাপুড়েকে। ফণা নাচিয়ে নাচিয়ে এঁকেবেঁকে যখন খেলায়, তখন আর সাপের নাগাল পায় না সাপুড়ে। বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে দম বেরিয়ে যায়, তবুও পোষ মানে না সাপ। মন্ত্র-তন্ত্র বৃথা হয়ে যায়।

এক লহমায় সারা নাচঘরখানা যেন দেখে নেয় নূরজাহানবাঈ। যেন

সোজা তাকিয়ে দেখে না কোন কিছু, তাকায় আড়নয়নে। বাঁকা চোখে। আসমানী রঙের পাৎলা বেনারসী পরেছে নূরজাহান। ফিকে নীল ওড়না। মতিবিবির অঙ্গে ছাইরঙের জঙ্‌লা বেনারসী। ঘাগরার মত কোমরে কুঁচি দিয়ে দিয়ে শাড়ী পরেছে ছ'জনেই। মতিবিবির কালো-কেশ ঢাকা পড়ে না ময়ূরকণ্ঠী রঙ ওড়নায়। বিনুনীর সোনালী জরি দেখা যায়।

জ্যোছনা-ভরা আকাশের তলে যেন সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলো। ওদের মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গে হিল্লোল উঠলো দেহে! ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আর হাসে অল্প অল্প।

কোমরের ঝুলন্ত রেশমী-রুমাল টেনে নিয়ে ঠোঁটের দুই প্রান্ত মুছে নেয় মতিবিবি। মুখে এক গাল পান। নকল না আসল কে জানে, কুঁচো হীরের অলঙ্কার দুজনের সমান সমান। চুড়ি, চিক আর কানে ঝুমকো। বুকে ব্রোচ্‌। হাতের আঙুলে আঙটি মণিমুক্তার। কারা যেন বদলাবদলি করেছে। আঙটি বদল করেছে ওদের সঙ্গে কারা যেন। দিয়েছে হয়তো দিলখোলা বাবুদের দল।

হীরের ছটা ছড়াতে থাকে নাচঘরে। ওড়নার চুমকি যেন আকাশের তারার মত দপ দপ করছে। সাজঘরে ছিল এতক্ষণ, ব'সে বসে ঘাম ঝরেছে সেখানে। হ্যাজাক আলোর উত্তাপে সাজঘরে গুমোট ধ'রেছিল যেন।

সাজঘর থেকে নাচঘর। বদ্ধ কোটর থেকে মুক্ত ফরাসে। হাত-পাখার হাওয়া থেকে বিজলী পাখার ঝড়ে।

নাচঘরে গুঞ্জন চলতে থাকে। নূরজাহান আর মতিবিবির অটুট অক্ষয় যৌবন দেখে কি যেন বলাবলি চলে বাবুদের সঙ্গে, তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের! ওদের চোখে যেন চোখ রাখতে পারে না কেউ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় – কিসের ভয় কে বলবে?

চন্দ্রমোহন বললেন, হেসে হেসে,—বিবিজানেরা নাচতে পারে, গাইতেও পারে অতি অপূর্ব্ব। তাই নয় শিউশরণ?

শিউশরণ ছিল নাচঘরের বাইরে। দুয়োরের পাশে! আসরে নামিয়ে দিলেই তার কাজ চুকে যাবে! খৈনী মলছিল শিউশরণ। বড়বাবুর কথা কানে পৌছতে না পৌছতে বললে—জনাব, ওরা দু'জন আসমানের অপ্সরী। গান ভি বহুৎ আচ্ছা গায়, নাচনেওয়ালী ভি আছে। এক এক বিবির এক এক কুঁড়ি সোনার মেডেল। দিয়েছে সব রাজা-উজীর, আমীর-ওমরাহ। কথা বলতে বলতে ঠোঁটের ফাঁকে খৈনী ভ'রলো শিউশরণ। আবার বললে—বিবিজানরা জনাব যার তার ঘরে যায় না। হাজার হাজার দিলেও নয়। তোয়াক্কাই করে না টাকার। এই শিউশরণ। গোলামকে যখন হুকুম করেছেন, তখন—

কথা আর শেষ হ'তে পায় না। চন্দ্রমোহন ততক্ষণে পা দিয়েছেন ফরাসে। যেখানে ওরা প্রায় সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিজলী পাখার তীব্র বাতাসে চন্দ্রমোহনের আদ্দির পাঞ্জাবী থর থর কাঁপছে। ফরাসে লুটিয়ে আছে কোঁচানো কোঁচা—পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের ধুতি।

—ওদের গায়ে পড়বে না কি বড়বাবু?

কে যেন ফিস ফিস কথা বললে কানে কানে। চুপি চুপি বললে।

লাল চোখ চন্দ্রমোহনের। নাসিকা আর কর্ণমূলও লাল। চুরচুরে নেশায় যেন ঢুলু ঢুলু চোখ। গেলাশের পর গেলাশ জিন-হুইস্কি সোডার কম্বাইনড খেয়েছেন চন্দ্রমোহন। পেগ ফুলই হোক, হাফই হোক, কোয়ার্টারই হোক, পেগের থাকে পরিমাপ। পেগের পরিমাণে আর যা কিছু থাক, অসংযম নেই। পেগের সম্মান রাখলে সেও না কি সম্মান রাখে। গেলাশের মাত্রা নেই কোন কিছু। কত সোডা আর কত আসল ধরা যায় না। গেলাশ যেন বেপরোয়া। চন্দ্রমোহন

লজ্জা পান বন্ধুর সাবধানী কথায়। ইদিক সিদিক দেখেন নেশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। কাকেও দেখেন না, অথচ চোখে যেন কত ব্যগ্র চাউনি! ফরাসে ব'সে পড়লেন চন্দ্রমোহন, ঠিক বিজলী পাখার নীচে।

দূর থেকে গোলাপ জলের ছিটে পড়লো তাঁর মাথায় মুখে। বেয়ারা পিচকারী থেকে জল ছিটালো কতক্ষণ!

ঘেমে উঠেছেন বড়বাবু। চোখ-মুখ তাঁর ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে। তাকিয়ায় হেলান দিলেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—আগে গান তারপর নাচ।

সব যেন থ হয়ে গেছে। প্রথম দর্শনের পর, সূর্য্যের আলোয় ফুল ফুটলে যেমন মধুপের গুঞ্জন শুরু হয়, নাচঘরে তেমনই সাড়া পড়েছিল ওরা আসতেই! এখন আর কারও মুখে কোন কথা নাই। দেখছে, শুধু দেখছে।

নূরজাহানের বুকে ঘন লাল কাঁচুলী। মতিবিবির ভেলভেটের। এঁটেসেঁটে যেন ব'সে গেছে কোমল অঙ্গে।

অখিলমোহন বললেন—বেয়ারা ক'টা আর আসে না কেন? বড়বাবু তুমি যদি একবার হাঁক পাড়ো! ষ্টক ক্লিয়ার হয়ে গেছে না কি এরই মধ্যে?

—এ্যাট্ অল্ নট্।

চন্দ্রমোহন সিরিয়াস্‌লি বললেন। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। ইশারায় ডাকলেন অখিলমোহনকে।

চন্দ্রমোহন ফিস ফিস কথা বলেন অখিলমোহনের কানে। বলেন—আমি মানা করেছি, এখন যেন সার্ভ্ না করে আর।

—কেন? এখন নয়তো কখন? কাল আর কে কাকে চিনবে!

—উহুঁ, তা নয়। বললেন চন্দ্রমোহন।—বলছি যে আজেবাজে কতকগুলো আছে তাদের ভাগিয়ে দেবো গান শেষ হ'লেই।

অখিলমোহন বললেন,—আমাকেও তাড়িয়ে দেবে না কি ? আমি পনেরোটা করকরে টাকা বড়বাবু কবুল করেছি। তোমার মত পঞ্চাশ একশো নাইবা দিতে পারলুম, তা বলে—

চন্দ্রমোহন বললেন.—উঁহুঁ তা নয়। আমাকে আগে বলতে দাও।

—কিছু আর বলতে বাকী রাখলে বড়বাবু? অখিলমোহন নেশার আমেজে কিনা কে জানে, দুঃখ-দুঃখ সুরে কথা বলছেন!

—পঞ্চাশ একশো ওমনি ওমনি বেরিয়েছে ভেবেছো অখিল?

—তবে। তোমাকে তো বড়বাবু নাড়া দিলেই টাকা পড়ে। ফাটকা বাজারের তুমি হ'লে কি না এক পাকা খেলুড়ে।

—সে সব দিনকাল গেছে অখিল। সে দিন আর নেই! জমিদারীটা থাকলেও বুক ফুলিয়ে বলতে পারতুম!

—তবে টাকা পেলে কোথায়? একেবারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা না কি তুমি একাই ঢেলেছো শুনতে পাচ্ছি।

—না হে না। তুমি কিছু জানো না। ফাটকা আর খেলি না। ফাটকায় সব দিয়েছি। আমি দিয়েছি সবসমেত একশো পঁচিশ টাকা। তাও দিয়েছি কোত্থেকে জানো?

—কোত্থেকে?

—তোমার বড়বৌদির গলার একটা জড়োয়া নেকলেশ বিক্রী ক'রে তবে দিতে পেরেছি। না দিলে মান থাকে না। জমিদারীতো যেতে বেসেছে, যাওয়ার আগে একটা রাত ফূর্তি ক'রবো, তাই বিক্রীই করে দিলুম চোখকান বন্ধ ক'রে।

—বড়বৌদি খুব রাগারাগি করলেনতো?

—যাক সে কথা। বললেন চন্দ্রমোহন। ফিসফিসিয়ে বললেন,—

তোমার যদি খেতে মন চায়, সোজা চ'লে যাও ওয়াইন চেম্বারে। সেখানে রতনদা আছে।

হারমনিয়মের নম্রধীর সুর যেন কথায় কথায় চাপা পড়ে যায়। ইতিউতি আড়নয়নে দেখতে দেখতে কি এক গানের প্রথম পঙক্তি বাজিয়ে চললো নূরজাহান। পা মুড়ে বসলো মতিবিবি। ঝাড়লণ্ঠনের তীব্র আলোয় ওদের দেহরেখা যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে।

মুক্তা ঝরলো যেন। আসল না নকল কে বলবে, এক ঝলক হাসি হেসে নূরজাহান বললে,—কসুর মাপ করবেন হুজুর। আমি বাঙলা গান ধরছি।

—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

—যেমন খুসী গাও। যা মন চায়।

—যাত্রা, অপেরার গান গাইবে না কি তাই বলে?

—রেকর্ড সঙ্গীত?

খিল খিল হেসে ফেললো নূরজাহান। মতিবিবির গা টিপলো হাসতে হাসতে। ওদের হাসাহাসিতে যেন মুঠো মুঠো মুক্ত ছড়ালো নাচঘরে।

চন্দ্রমোহন ধমকানির সুরে বললেন,—কথা বললে নাচঘরের বাইরে যেতে হবে, আগে থেকে জানিয়ে রাখছি। ডোণ্ট্ ক্রিয়েট ডিস্টারবেন্স্।

তবলচি তবলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে' হাতুড়ীর ঘা মেরে মেরে সুর বাঁধছে।

হারমনিয়মের নম্রধীর সুর যেন উত্তরোত্তর জোর হ'তে থাকে। নূরজাহান পান চিবোতে চিবোতে হঠাৎ গান ধরলো মিহিমিষ্টি কণ্ঠে। গাইলো,—আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা—

বহু-পরিচিত গান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। বাঈজীর মুখে এ-গানের

প্রথম কলি শুনে বিস্ময় লাগে যেন বাবুদের। বিশ্বাস হয় না যেন, নূরজাহান গাইছে এই গান।

নাচঘরে যেন খুশীর জোয়ার বইলো। খেয়াল, টপ্পা কিংবা ধ্রুপদ বা ধামার গান নয়, বাউল, কীর্ত্তন কিংবা গজল, ঠুংরীও নয়—স্রেফ আধুনিক বাঙলা গান কবিগুরুর—যাঁর গানে সুরমাত্র সম্বল নয়, সুরের সঙ্গে সঙ্গে আছে কবিজনোচিত ভাব আর ভাষা। যেমন সুর, যেমন ভাষা, তেমন ছন্দ।

—আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা—

গানের এক এক কলি গায় আর আড়চোখ দেখে নূরজাহান। বাঁকাচোখের দৃষ্টিতে কেউ পড়ে না, অথচ যেন ঘরের সকলের মুখাকৃতিই লক্ষ্য করে সে। তার নাকের হীরা যেন দ্যুতি ছাড়ায় যখন তখন। কোমল করপল্লব যেন নেচে বেড়ায় হারমনিয়মের বুকে।

চাঁছাছোলা কণ্ঠ নূরজাহানের। তৈরী গলা। তার দরদ মাখানো কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে বাবুরা যেন বিমুগ্ধ হয়ে যান।

বৈশাখের ঝড়ের মত হাওয়ায় নিশীথ রাতের বাদল ধারা ঝরতে থাকে যেন চন্দনপুরে। শান্ত স্তিমিত রাত্রির ঘন আঁধার ভেদ ক'রে গানের সুর কতদূরে ভেসে যায়। সুরের সঙ্গে সঙ্গে ভাসে যুঁই আর বেলফুলের মাতাল গন্ধ। পান আর জর্দ্দার মিঠেকড়া খোসবয়।

বাবুদের যেন অবাক করে দিয়েছে বাঈজীর মুখে রবীন্দ্রনাথের গান।

মতিবিবি চুরিয়ে চুরিয়ে চুপিচুপি বলে,—ঘাবড়াচ্ছিস কেন! ভয় কি তোর!' গাইবি তো গলা ছেড়ে।

মৃদু হেসে নীরব সম্মতি জানালো নূরজাহান। প্রথম লজ্জাটুকু যেন কিছুতেই দূর হয় না। সঙ্কোচ না সঙ্কট যেন মোচন হয় না আর।

সামনে আর আশেপাশে যত অচেনা, অজানা মুখ। তাকিয়ে আছে

যেন পলকহীন চাউনিতে। যেন পৃথিবীর আর এক আশ্চর্য্যের দেখা মিলেছে। ওদের নাম দুটি শুনলে চেনা যায় ওরা জাতে মুসলমানী, কিন্তু সত্যি কি তাই! হিন্দু না মুসলমান কে জানে, দেখায় যেন আরব-বেদুইনের মত। পশ্চিমের মুসলমান না উত্তরের রাজপুতানী ঠিক ধরা যায় না। বেহারী না গুজরাটী, মাড়োয়াড়ী না ভাটিয়া চেনা যায় না যেন এক নাগাড়ে দেখেও।

কবিগুরু যেন এই গানটি কেবল মাত্র নূরজাহান বাঈজীর তরেই র'চে গেছেন। এমন মিষ্টি আর দরদভরা কণ্ঠে কে আর কবে গেয়েছে ব্যথা-ঝরা রোদনভরা এই করুণ গান।

গাইতে গাইতে স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে, শিহরণের মত। যেন নিজের কথা গানের স্বরে ব'লে চলেছে সে। গাইছে যেন কত বিরহিনীর মত। কে যেন মনের মানুষ, ঐ নিশীথ রাতের বাদল ধারার মত, না বলে বিদায় নিয়েছে তাকে একা ফেলে। কেঁদে কেঁদে গাইছে যেন নূরজাহান। ওর সুর্মাটানা চোখ দু'টি কি বারেক চিকচিকিয়ে উঠলো! প্রথম লজ্জাটুকু কাটিয়ে ও সঙ্কট না সঙ্কোচের বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নূরজাহান তার তৈরী-সাধা কণ্ঠস্বর যেন সপ্তমে তুলেছে।

সারেঙ্গী চলেছে সঙ্গে। যেন কাঁদছে চাপা কান্না। রাত্রির মৌননীল আকাশ স্তব্ধ হয়ে শুনছে এই করুণ ক্রন্দন। ফুটফুটে তারাগুলো আর জ্বল্-জ্বল করে না, আভা ঠিকরোয় না,—যেন স্থির হয়ে থাকে।

দুপ দাপ কপাট বন্ধ হয় অন্দরের ঘরে ঘরে। পৃথিবীতে কালারা কত সুখী, বধির কর্ণ কত সুখের!

জানলা আর দুয়োর পড়তে থাকে। যেন ঝড় এসেছে, ঝড় আসছে।

সারেঙ্গীর টানা টানা কান্না শুনতে ভাল লাগে এই জ্যোছনার রাতে। গুমরে গুমরে, কাতরে কাতরে কাঁদছে যেন হারমনিয়ম। তবলার শব্দ যেন নয়, কে যেন কাকে ধ'রে অবিরাম মারাধরা করছে।

জানলা পড়ছে। দরজা পড়ছে। কপাট পড়ছে কারও কারও ঘরে।

চন্দনপুরের নালা-নর্দ্দমা, মজা-পুকুর, আগাছার জঙ্গল, লতাগুল্মের ঝোপ, বাঁশবন আর পড়ো-পড়ো ভূতুড়ে চন্দনধামের কোটরে-কন্দরে অন্ধকার যেন গভীরতর এখন। বৈশাখের দমকা হাওয়া কোথা থেকে যেন অন্ধকার ভাসিয়ে আনছে চন্দনপুরকে একেবারে ঢেকে ফেলতে। আলো নেই, শুধু কালো। আলকাতরার মত আঁধার, স্পর্শে লাগে বুঝি। যেন হাতে ধরা যায়।

অন্দরের দালানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেহাৎ শিশুর মত, আকাশের চাঁদকে লক্ষ্য করছিলেন অনঙ্গমোহন। বসতি আছে না কি চন্দ্রলোকে! কারা আছে কে জানে! কেমন আছে!

অনঙ্গমোহনের মুখে জলন্ত চুরুট। অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ছেন তিনি। বাতাসকে যেন ভারী ক'রে তুলছেন। লোভাতুর দৃষ্টি তাঁর অকেজো চোখে। ভাবছিলেন, যারাই থাক ঐ চন্দ্রলোক আর মঙ্গলগ্রহে, তারা অবশ্য অবশ্য সুখে আর শান্তিতে আছে। জ্বালা আর যন্ত্রণায় ভুগছে না এই পৃথিবীর বাসিন্দাদের মত। পার্থিব সুখ বলতে কিছু আর রইলো না। জমিদার আজ বাদে কাল ফকির হ'তে বসেছে। উজীর থেকে ভূমিহীন বাস্তুহারার দলে যেতে বসেছে। সম্ভ্রান্তের আভিজাত্য ধূলোয় লুটোবে। শোকে। ফকিরদের সঙ্গে সব হারিয়ে ফকিরের মত ফকির হয়ে থাকতে হবে। রাজায় প্রজায় ভেদাভেদ রাখবে না কংগ্রেস। গণতন্ত্রের জয়জয়কার হবে।

অনঙ্গমোহন চুরুট নামালেন মুখ থেকে। কিন্তু আকাশ থেকে চোখ ফেরালেন না। আকাশের বুকে লেখা আছে যেন কত শত কথা, কাহিনী —এক দৃষ্টে তাকিয়ে পড়ছেন অনঙ্গমোহন। রূপকথা পড়ছেন যেন, এতই মনোযোগ।

—হুজুর, খাবার দিই টেবিলে।

শ্যামাপদ প্রশ্ন করলো স্নেহ ভক্তির সুরে। বললে,—দেখতে দেখতে রাত বেশ হয়েছে।

—কেঃ!

অন্ধকার দালানে তিনি একা। হঠাৎ কথা শুনে প্রথমে চমকান। চোখে স্পষ্ট দেখতে পান না। কানটাও হয়তো যেতে বসেছে। শ্যামাপদ না অন্য কেউ কথা বলে, আঁধারে দৃষ্টি চালিয়ে চালিয়ে লক্ষ্য করলেন কয়েক মুহূর্ত্ত। ভুল দেখছেন কি তিনি, ভুল শুনলেন কি! নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—কে? শ্যামা? শ্যাম?

—হাঁ বাবু।

—কি বললে তুমি শ্যাম?

—টেবিলে খাবার দিই?

—খাবার দেবে? তা দাও। রাত কত এখন?

—তা বেশ রাত হয়েছে।

—মণিমোহন ফিরেছে? দাদাবাবু এসেছেন?

—না হুজুর।

—তবে থাক। মণি আগে ফিরুক।

—দাদাবাবুর যদি ফিরতে বিলম্ব হয়!

চুরুট মুখে তুললেন অনঙ্গমোহন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন,—তা হোক শ্যাম। মণি না ফিরলে—

খানিক দাঁড়িয়ে থাকলো শ্যামাপদ। যদি মনিব মত পালটান। না বলেছেন, যদি বলেন হ্যাঁ, সেই আশায় থাকে সে!

বৈশাখের নতুন হাওয়াকে বিষিয়ে তোলেন যেন অনঙ্গমোহন। বড় বেশী ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন চুরুটের! পুড়ে পুড়ে বড় তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে যায় মেয়েদের হাতে তৈরী আসল বর্ম্মা চুরুট।

নতুন হাওয়া ফুলের সুগন্ধ হ'য়ে আনে চন্দনধামের আঙিনা থেকে। একেক সময় একেক ফুলের গন্ধ আসে যেন। চন্দনধামের শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগানে আছে সেকেলে গাছ ক'য়েকটা। ঝড় আর ঝাপটা সামলে এখনও বেঁচে আছে।

কখনও গন্ধরাজের গন্ধ আসে। কখনও কনকচাঁপার। কখনও যুঁইয়ের।

যতই ফুলের সুগন্ধ আনে হাওয়া, চুরুট-তামাকের ধোঁয়ায় যেন সুগন্ধের আমেজ কোথায় মিশে যায়।

মণিমোহন ফিরলো না এখনও। কেন?

বিরাট এক জিজ্ঞাসা অনঙ্গমোহনের বিক্ষিপ্ত মনে জেগে আছে সদাক্ষণ। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না কাকেও। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, তবুও এখনও একমাত্র ছেলে মণিমোহন আসেনি।

—তাসের আড্ডাটা কোথায় শ্যামাপদ?

—কাছেই হুজুর।

—কোথায় তাই বল' না।

বামুনপাড়া থেকে বেরিয়ে আজাদ হিন্দ রোড ধ'রে নাক বরাবর গেলেই হুজুর দাদাবাবুদের তাসের আড্ডা। সুইসাইড ক্লাব।

আঁৎকে উঠলেন যেন অনঙ্গমোহন। বললেন,—সেখানে কি হয়? শুধু তাস খেলা?

থ মেরে যায় শ্যামপদ। তার মুখ দিয়ে যেন আর কথা বেরতে চায় না। কণ্ঠরোধ হয়।

—চুপ করলে যে?

—না বাবু চুপ করি নাই। বলছি যে দাদাবাবুদের ক্লাবের ভিতরে আমি কখনও যাই নাই যে বলবো।

—ভিতরে না যাও আশপাশে তো যাওয়া আসা কর'।

কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন অনঙ্গমোহন। মুখে যেন কি এক আবিষ্কারের অদ্ভুত উল্লাস ফুটেছে। চোখে যেন ব্যর্থ দৃষ্টি কেন কে জানে। ছল্ ছল্ করছে যেন চোখের প্রান্ত। মুখের চুরুটের আগুনে দেখা যায়।

—চল, চল ঘরে চল।

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন অনঙ্গমোহন। শ্যামাপদর একটি হাত নিজের হাতে ধ'রে তাকে যেন টানতে টানতে নিয়ে চললেন নিজের ঘরপানে।

শ্যামাপদর বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড ধুকপুক করতে শুরু করে। মনিবের সদা-মারমুখ একমাত্র ছেলেকে মনে পড়ে তার। মণিমোহনকে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে মণিমোহনের হাতের মুঠো, লম্বা লম্বা আঙুল, চওড়া কব্জি, বুকের ছাতি। ভয় পায় শ্যাম, ভীষণ ভয় পায়, মুখ ফসকে যদি কোন ওলটপালট কথা বেরিয়ে যায়! বেফাঁস যদি ব'লে ফেলে সুইসাইড ক্লাবের ভেতরের কথা।

—ক্লাবে হুজুর তাসই শুধু খেলা হয়।

—শুধু তাস। ঠিক ব'লছো?

—মেম্বার কতজন? কারা কারা আসে সেখানে?

—তা হুজুর জানি না।

—জানো না?

—না হুজুর ?

কেমন যেন হতাশ হয়ে ব'সে পড়লেন অনঙ্গমোহন। আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। খনি আবিষ্কার করলেন মাত্র, হীরা জহরৎ কোন কিছুই লাভ করতে পারলেন না। শুধুই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

ক্লাবে যদি কেবল তাসই খেলা হয়, তাতে আর কি অন্যায় আছে! ভাবছিলেন অনঙ্গমোহন। একেই তো একমাত্র ছেলে হয়েও অভাব আর অনাটনের ভয়ে, দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় চার পায়ে এক হ'তে পারলো না এখনও। একা একা দিন কাটায়। রাত্রিও কাটায়। সুইসাইড ক্লাব, নামটি যেন মনে মনে আওড়াতে থাকেন অনঙ্গমোহন। তিনি তাঁর দীর্ঘ-জীবনে অনেক অনেক ক্লাব দেখেছেন। লজ, ক্লাব, ব্রথেল প্রচুর দেখেছেন।

বেঙ্গল, ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, যোধপুর ক্লাব, কাশীপুর ক্লাব আর পার্ক ষ্ট্রীটের যতেক লজ, ইত্যাদি,—সব কিছুর সঙ্গে একদিন অনঙ্গমোহনের অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ ছিল। আজকেই না হয় জমিদারী আর বয়স হারানোর শোকে মূহ্যমান। অর্থাভাবে মৃতপ্রায়। স্ত্রী হারিয়ে সর্ব্বহারা।

সুইসাইড ক্লাব আবার কেমন ধরণের।

—ক্লাবের ফাংশন কি ? শুধু তাস খেলা ?

উত্তর করে না শ্যাম। চুপচাপ থাকে। মুখে যেন কুলুপ আটকে থাকে। মণিমোহনের বজ্রমুষ্টি মনে পড়ে তার। মনে পড়ে মণিমোহনের কব্জির জোর। দাদাবাবু যদি জানতে পারেন রক্ষা থাকবে না। ক্লাবের ইতিবৃত্ত জানিয়ে দিলে বাঁচোয়া নেই শ্যামাপদর।

সুইসাইড ক্লাবের সভ্য ফুসলে-নিয়ে-যাওয়া মেয়েদের ঘরে ফিরিয়ে আনে। উদ্ধার করে যে কোন দুর্ব্বলকে, সবলের হাত থেকে। যে অত্যাচার করে তাকে অত্যাচার করে। বোমা তৈরী করে।

হাত-বোমা আর এ্যাসিডের বাল্ব্। যেখানে অব্যর্থ মৃত্যু সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুইসাইড স্কোয়াড্। ইলেকশন ক্যাম্পেনে মাতব্বরী করে। দরকার হ'লে মারাধরা করে বিপক্ষ পার্টিকে। ভোট ভণ্ডুল করে।

—ক্লাব কি সারা রাত চলে না কি? নাইট ক্লাব?

—তা বোধহয় নয় হুজুর।

—তবে মণি এখনও ফেরে না কেন? নাচঘরে গিয়ে ব'সলো নাতো?

অনঙ্গমোহন প্রশ্ন করলেন যেন নিজেকেই। কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন যেন। ভেবে কোন কিছুর কুল-কিনারা পান না। এলিয়ে থাকেন আরাম-কেদারায়। মনিবের ভাবগতিক ভাল নয় দেখে শ্যামাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

বৈশাখের বাতাসে গাছে গাছে জড়াজড়ি হয়। পাতার খড়খড়ানি হঠাৎ শুনলে ভুল হয়, কারা যেন কথা বলাবলি করছে! ঝিঁঝির কীর্ত্তন চলেছে অবিরাম। একবার শিয়ালও যেন ডেকেছে দল বেঁধে।

একদিকের দালান থেকে দেখা যায় আরও তিনদিকের। শ্যামাপদ দেখলো, বিপরীতদিকের দালান এক চলন্ত আলোর শিখা। ধীর মন্থর-গতিতে এগিয়ে চলেছে আলো। যেন ভেসে চলেছে ঠিক।

প্রদীপ হাতে কে চলেছে। মনিবের ঘরের বিজলী আলো থেকে অন্ধকারে এসে চোখে ঝাপসা দেখছে নাতো শ্যাম! চুরিয়ে চুরিয়ে দেখে সে, পলকহীন চোখে। শুনতে পায় নিজের শ্বাস ফেলার শব্দ। শুধু আলোই দেখা যায়, দেখা যায় না যার হাতে প্রদীপ, তাকে! পা চালালো শ্যামাপদ। আলো না আলেয়া দেখলো সে। কাকে দেখলো কে জানে।

হাওয়ার বেগে প্রদীপের শিখা থর থর কাঁপছে। সারা দালানটা যেন জোয়ারের বজরার মত দুলে দুলে উঠছে।

····কে রে ?

নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনেছে শ্যাম। চেনা চেনা কণ্ঠ, তবুও চিনেও যেন চিনতে পারছে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দালানের দুয়োরের পাশে। যেন পথ ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে।

—কে? কথা কও না কেন ?

—চোরের মত ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, কে বল্‌তো ভাই ?

—কি জানি ভাই! জানলা দরজাগুলোর যা অবস্থা হয়েছে তাতে বিশ্বাস নেই আর।

একজন নয়, দুজন। শ্যামাপদ শুনলো দুজনেরই পরিচিত কণ্ঠস্বর। দেখলো দুই মূর্ত্তিমতীকে। চোখে দেখেও যেন ঠিক চিনেও চিনতে পারছে না। চন্দনধামের মেয়ে-বৌ না অন্য কোন বাড়ীর বৌ, এসেছে হয়তো কোন' কাজ কর্ম্মে! প্রদীপের আলোয় দু'জনকেই দেখতে পায় শ্যাম, কিন্তু চিনতে পারে না সাজ-সজ্জার বহর দেখে। কত চেনা জানা, তবুও যেন ধরতে পারে না ওরা কারা। সাদা তাঁতের শাড়ী দু'জনের পরণে। একজনের ভোমরা পাড়। লাটিম পাড় আর একজনের। প্রসাধনের দু'জনের মুখশ্রী অপূর্ব্ব দেখায়। একজনের মাথায় অধিক গুণ্ঠন। অন্যজনের নিরাবরণ খোঁপার চতুর্দ্দিকে রজনীগন্ধার মালা।

—কে ?

আগের চেয়ে আরও জোরালো সুর।

—আমি শ্যামাপদ মাঠাকরুণরা।

খিল খিল হাসির শব্দ ভাসলো দালানে। শ্যাম দেখলো দু'জনের সারি সারি পান-লাল দাঁত, ডালিম-দানার মত। চোখে চোখে সূক্ষ্ম সুর্মার রেখা। পাউডার-সাদা মুখ, হাসি হাসি মুখ।

—তাই বল। আমরা ভেবেছি কে না কে! যা অন্ধকার দালানে!

—একটা কাজ করতে পারো শ্যাম ?

সজোর কথার সুর অস্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন ! ফিসফিসিয়ে কথা বলে একজন। কেমন যেন মোহের সৃষ্টি হয়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তো দেখছেই শ্যাম। বললে,—হুকুম করেন।

—তোমাকে হুকুম করলে তোমার মনিব আবার রাগারাগি করবেন না'তো ?

—আপনারাও তো আমার মনিব। বলেন কি বলছিলেন।

শ্যামাপদ বিনয়ের সুরে কথা বলে। যেন কত আপন জনের মত কথা বলে। দেখে দেখে বহুক্ষণ পরে সে চিনতে পেরেছে দুই নারীকে। দেখে চিনেছে চন্দনধামের দুই বৌ—পারুলবৌদি আর কমলাবৌদি—যেন দুই রূপের ডালি। যেমন দুধের মত ফর্সা রঙ, তেমনি গড়ন থোড়ের মত। এত অভাব আর দুরবস্থা চলেছে কে বলবে দেখে। অর্দ্ধাহারে আছে দিনের পর দিন, তবু টসকায়নি যেন এক তিল। আছে ঠিক তিলোত্তমার মতই। দেখলে কে বলবে, ত্রিশ পেরিয়ে গেছে দু'জনের ! সীঁথিতে সিঁদুরের টাটকা পরশ। কপালে টিপ কুঙ্কুমের।

—একবার সদরে যেতে হবে শ্যাম ?

—কেন বৌদিদি ?

—ডেকে আনতে হবে—

কথা যেন শেষ ক'রতে পারলেন না পারুলবৌদি। লজ্জার বাধা লাগলো যেন। মুচকি হাসি হেসে ফেললেন নকল গাম্ভীর্য্যের মাঝে।

—কাকে বৌদিদি ? দাদাবাবুদের ?

আবার হাসলেন পারুল। গা টিপলেন কমলার। মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে বললেন,—না না, দাদাবাবুদের নয়। কাছারী থেকে গমস্তাদের একজনকে ডেকে আনতে হবে।

—নায়েবমশাইকে ডাকবো বৌদি ?

আবার সেই খিল খিল হাসি। দালানে যেন হাসির প্রতিধ্বনি ভাসছে মৃদু মৃদু। কোন রকমে হাসির বেগ সামলে কমলা বললেন,—না না নায়েবমশাইকে নয়। তিনি বুড়ো মানুষ, তাঁকে আর কষ্ট ক'রে আসতে হবে না। তুমি দেবকুমারবাবুকে ডেকে আনো। ক'টা জরুরী খরচা লিখে নিয়ে যাবে।

পারুল বললেন,—আমার দু'খানা চিঠি লেখাতে হবে।

শ্যামাপদ মূর্খের মত, বেরসিকের মত বললে,—আমি তো গমস্তাদের সকলকার নাম জানি না বৌদি। ইনি কি ছোকরামত ? ফর্সা চেহারা ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যাবে আর আসবে। দেরী করবে না এক মুহূর্ত। দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না আমরা।

—তেনাকে ডেকে আনবো বৌদি ?

—হ্যাঁ।

ধমকানির সুর শুনলো যেন শেষ কথায়। তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল শ্যামাপদ। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পারুল আর কমলা দাঁড়িয়ে থাকলেন দালানেই। প্রতীক্ষায় থাকলেন রুদ্ধশ্বাসে যেন।

—প্রদীপটা নিভিয়ে দিই কমলা ?

—নিভিয়ে দেবে পারুলদি ! থাক না। রেখে দাও না এক পাশে। আগে আসুক তারপর দিও'খন নিভিয়ে। যা অন্ধকার !

সত্যিই চন্দনধামের অন্দরের এ তল্লাট বড় বেশী তমসাচ্ছন্ন যেন। বিজলী আলোর লাইন আছে, কিন্তু আলো জলে না। ইলেকট্রিক কোম্পানী সময়ে ট্যাক্স না পেয়ে পেয়ে তার কেটে দিয়ে গেছে। প্রদীপ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিংবা মোমবাতি।

—মুখটা ঠিক আছে আমার ?

কমলাবৌদি প্রশ্ন করলেন নিজের মুখ দেখিয়ে। মুখ তুলে ধরলেন প্রদীপের আলোয়।

অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন যেন পারুল। দেখেন আর মিটি মিটি হাসেন। কি দেখেন কে জানে। দেখতে দেখতে বললেন, —হ্যাঁ চমৎকার দেখাচ্ছে। লাভ্‌লি।

—ইস !

—আমাকে ?

—বিউটীফুল ! মার্ভেলাস !

অস্ফূট ফিসফিস কথার প্রতিধ্বনি ওঠে যেন দালানের অনেক উঁচু কড়িকাঠের আনাচে কানাচে। রাতের অন্ধকারে আলোর আভাষ দেখে খিলানের পায়রা ক'টা ডাক দেয় একেকবার। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা দালানে যেন কিসের সুগন্ধ ভাসতে থাকে। প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে কমলা গুনগুন শব্দে গান ধরেন আপন মনেই। মিহিমিষ্টি সুরে কি এক পদাবলীর পঙক্তি গাইছেন যেন। কীর্ত্তন গান গাইছেন বিদ্যাপতি না চণ্ডীদাসের, জ্ঞানদাস না গোবিন্দদাসের। গাইছেন,—

মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল।
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি, না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী ধরেছেন কমলা-বৌদি। গানের মাঝপথে ধ'রেছেন ! গুনগুনিয়ে গাইছেন শুধু যেন নিজেকে শোনাতে। পারুল-

বৌদির মুখে যেন প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা। বদ্ধ দালানে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে দু'জনেই ঘামছেন বড় বেশী। মুখের পাউডার হয়তো ধুয়ে মুছে যায়! গান গাইতে গাইতে কমলা থামলেন ক্ষণেক। ইতিউতি দেখলেন চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। পারুলবৌদি আঁচল চেপে চেপে মুছলেন মুখখানি। গায়ের পাৎলা জামা ভিজে ভিজে লাগে। কমলা গান ধরলেন আবার। গাইলেন,—

ফুলের উপর চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল।
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।

—কেউ যদি শুনতে পায় কি করবি তখন?

পারুলবৌদি যেন আর না ব'লে পারলেন না। কথা বললেন দুয়োরে চোখ রেখে।

—তুই তখন রক্ষে করবি।

—আমাকে কে রক্ষে করে তার ঠিক নেই!

—থাক থাক ঢের হয়েছে। পান খাওয়া দেখি একটা।

—হাতে নেই, মুখে আছে, খাবি?

—তোর মুখের পান খেতে যাবো কোন্ দুঃখে?

দালানের অনেক-উঁচু কড়িকাঠের কোণে কোণে ফিস ফিস কথার প্রতিধ্বনি যেন। নাকি পায়রার সভয় গুঞ্জন! দালানের নালীতে ঝিঁঝির কলরোল থেমেও যেন থামে না।

—কে কথা বলছে রে কমলা?

—কি জানি কে!

বলতে বলতে কান পাতলো। কান সজাগ করলো! কথা নয়, যেন কে কে গান গাইছে খুব ভারী গলায়। গাইছে অন্ধকার অন্দরে। সুর যেন চলন্ত, গান গাইতে গাইতে কে আসছে না যাচ্ছে কোন্ দিকের দালান ধ'রে! পুরুষ কণ্ঠের গান যেন।

—ন'ঠাকুরপো নয়তো!

—ঠিক বলেছিস। কাণ্ডজ্ঞান নেই আর কি! হয়তো বৌকে মনে পড়েছে। ফেরা হচ্ছে তাই।

—এদিকে আসবে নাতো ভাই?

—না রে না। তোর দেখি বড্ড বেশী ভয়!

দূরেও নয়, কাছেও নয়,—কোথায় কার সচল গান শুনে দু'জনে যেন পাষাণের মত শিলাময়ী হয়ে ওঠেন। কথা থেমে যায়, হাসি থেমে যায়।

দূরেও নয়, কাছেও নয়,—কোথায় কে পুরুষালি গলায় গান ধ'রেছে,—সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী ব'লে।

গানের সুর নেই, কথাও নয় স্পষ্ট। জড়িতকণ্ঠ। ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা! গর্দ্দভরাগিণীর মত শোনায় যেন গানের সুর। কে বলবে যে রামপ্রসাদী গাইছে!

বাবুরা কখন কোন্ অবস্থায় নাচঘর থেকে ফিরবেন তার কিছু ঠিক নেই। যখন ফিরবেন তখন তাঁদের জ্ঞান থাকবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না। একেই অন্দর যেন অন্ধকারে ডুবে গেছে। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে অন্দরও যেন নীরব হয়ে আছে। ঘরে ঘরে দুয়োরের কপাট বন্ধ। নিজের ঘর চিনতে না পারলে কেউ যদি অন্যের ঘরেই অনধিকার প্রবেশ করেন তখন কে বাধা দিতে আসবে! কিংবা যদি

কেউ কারও হাত ধ'রে টানাটানি করতে থাকেন, কি হবে তখন! অথবা কেলেঙ্কারীর ভয়ে ঘরের ঘরণীরা সাবধান হয়েছেন!

সুরপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে—

গানের সুর স্তিমিত হয়ে যায়। আর শোনা যায় না। যিনি গান ধ'রেছিলেন তিনি হয়তো ঘরে ঢুকলেন নিজেই! নেশার আধিক্যে সোজা আর দাঁড়াতে পারছেন না। বমনের উদ্রেক করছে যেন। চোখে স্পষ্ট আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গানের সুর আর শোনা যায় না। নিশ্চিন্তার শ্বাস ফেললেন পারুল বৌদি। কমলা বললেন,—কে এমন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে আবার কোথায়!

—কেন, তুমি কি জানো না? কাঁদছে কল্যাণী। চাবুক খেয়েছে স্বামীর কাছে।

সেজবাবুর পুত্রবধূ, ছোট বৌমা, কল্যাণী। চাবুক খেয়েছেন কখন সেই প্রথম রাত্রিতে, এখনও তাঁর ব্যথা যেন ক'মেও কমছে না। সেজবাবুর কনিষ্ঠপুত্র ক্রোধের বশে চাবুক চালিয়েছিলেন যথেচ্ছা। সোনাদানা কি যেন চেয়েছিলেন তিনি, কল্যাণী দিতে চাননি। কথার অবাধ্য হওয়ায় চাবুকের ঘা খেতে হয়েছে শাস্তিস্বরূপ। কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গে লম্বা লম্বা চিহ্ন চাবুকের! গলার হার ছিঁড়ে নেওয়ায় কতটা কেটে গেছে গলার কাছে। রক্ত ঝরেছে কতক্ষণ! পরণের শাড়ীখানি রক্তের লালিমায় আসল রঙ হারিয়ে ফেলেছে। সেজবাবুর ছোট ছেলে, কল্যাণীর ইহকাল আর পরকাল–মারাধরা ক'রে, গয়নাগাটি ছিনিয়ে নিয়ে সেই যে কখন সদরে স'রে পড়েছেন, আর তাঁর পাত্তা মিলছে না। বৈশাখের এলোমেলো হাওয়ায় চাবুকের দাগ, আর কাটা-ঘা থেকে থেকে জ্বলে উঠছে যেন। কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ছে। কল্যাণী লুকিয়েছেন নিজের ঘরে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এখনও তিনি কান্নাকাটি করছেন। ঘরের মেঝের লুটিয়ে প'ড়েছেন। ডুগরে ডুগরে কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে কত সব কথা ব'লে চলেছেন আপন মনে। বলছেন যেন অভিযোগের সুরে।

কমলা বৌদি বললেন,—চাবুক খেয়ে ম'রলো, নিজ দু'চার ঘা দিতে পারলে না?

—সে কি কথা কমলা! মেয়েজাত কি মারামারি করতে পারে? পারুলবৌদি বললেন ফিসফিসিয়ে।

—কেন পারবে না! খুব পারবে! আমি যদি হতুম দেখতে কেমন না হাত চালাতুম। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া চাই। ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই! কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন কমলা।

—ঘরের বৌ হয়ে স্বামীকে ধ'রে মারবে, এ আবার কেমন কথা? ভাবতেই পারি না।

কমলা কড়া সুরে বলেন,—স্ত্রীকে ধ'রে মারবে, সেই বা কেমন কথা! আমিও ভাবতেই পারি না। হিন্দু কোড বিল চালু হোক, দেখবে এই বৌয়ের ওপর অত্যাচার চিরজন্মের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

—চুপ চুপ।

পারুলবৌদি কমলার মুখে হঠাৎ হাত চেপে ধরলেন।

—কেন চুপ ক'রবো কেন?

—ঐ দ্যাখ্, বড়দি আসছেন। যদি দেখতে পান! ভয়ে ভয়ে বললেন পারুল।

—বড়গিন্নী?

—শুনছিস না, আপনার মনে কত কথা বলতে বলতে আসছেন। বড়দি ছাড়া আর কেউ নয়।

—হ্যাঁ, তাইতো। ইদিকেই আসছেন মনে হচ্ছে!

এক দালান থেকে আরেক দালান দেখা যায়। এক দালানের সারি সারি জানলা থেকে দেখা যায় অন্য দালানের জানলার সারি। প্রদীপ হাতে এক শুভ্র নারীমূর্ত্তি, ঈষৎ স্থূলকায়া যেন—ধীর পদক্ষেপে দালান অতিক্রমণ করতে করতে ব'লে চলেছেন কত কথা। দুঃখকাতর সুরে। বাড়ীর বড়, মান্যেগণ্যে শীর্ষস্থানীয়া—তাই আর লাজলজ্জা নেই। দারুণ গরমে গায়ে আর জামা দেননি। পরিধানে শুধু একখানি চওড়া কালো পাড়ের সাদা তাঁতের জল-ডুরে। শাড়ীর এখানে সেখানে সেলাই-রেখা তবুও ফর্সা ধবধবে।

বড়বাবু চন্দ্রমোহনের স্ত্রী বড়বৌমা! বাড়ীর বড় বৌ। দেখলে কে বলবে যে, ছেলেমেয়ের মা হয়ে চারের কোটায় পা দিয়েছেন তিনি! দেহে যেন কুমারীর লাবণ্য এখনও। কোঁকড়া কেশের রাশি পিঠে এলিয়ে পড়েছে। ঢলোঢলো মুখে যেন বিষাদের কালো ছায়া। হাতের প্রদীপের আলোয় দূর থেকে দেখা যায় তাঁর অপূর্ব্ব মুখশ্রী। যেন ঠিক প্রতিমার মত।

বড়বৌ বলেন,—আমি এ বাড়ীতে সব আগে এসেছি। আমি চন্দনধামের যা দেখেছি, কেউ দেখেছে? আজকেই না হয় জমিদারী মরা-ছেলে হয়ে পড়েছে, বাবুরা রাখতেও পারছেন না, ফেলতেও পারছেন না এমন দিন ছিল না কি, যে অন্দরে পিদীম হাতে ঘুরে বেড়াতে হবে, হাত-পাখার হাওয়া খেতে হবে? আমি তো বড়, তা আমাকে কে দেখছে, তাই শুনি! যে যার ঘরে ঘরে খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে আর সারাদিন খেটে মরেছি। কার মুখে ভাত উঠলো না, কার ছেলে খেতে পেলে না, কার কোথায় ত্রুটি হয়েছে সব দেখবে এই বড়বৌ! পান থেকে চুন খসলে তো হুলুস্থুলুস পড়ে যায় তখন! এক গণ্ডা রুটিতো রাতে

আমি খাই, ভাত নিজে তৈরী করে নিতে হয়। ভগবান কি শুধু শুধুই চোখ-কান দিয়েছেন? সাততাড়াতাড়ি ঘরে খিল এঁটেতো সব শুয়ে পড়া হয়েছে, আমি এখন যাই এত রাতে উনুন তাতের ধারে! মরণও কি নেই এ পোড়াকপালে? ক্ষিধেতেষ্টার জ্বালা জুড়োয় মরণ হ'লে।

নিজের মনে কথা বলছেন, কিন্তু অন্দরের প্রতি ঘরকে শোনাতেই যেন এক নাগাড়ে ব'লে চলেছেন। রুদ্ধদ্বার ঘরের ভেতরের সকলের কানেই পৌছে যায় এই বাক্যধারা।

—দিদি, আমি আপনার রুটি সেঁকে দিচ্ছি। আপনাকে আর এত রাতে যেতে হবে না উনুন ধারে। আপনি আপনার ঘরে যান।

পেছন থেকে কার সস্নেহ কথা শুনে চলতে চলতে থামলেন বড়বৌ। পিছন ফিরলেন। বললেন,—কে রে তুই? মালতী না?

—হ্যাঁ বড়দি।

মধুমালতী মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে এগিয়ে আসে। প্রদীপের স্বল্প আলোয় তার মুখে আলোছায়ার খেলা। ওষ্ঠে যেন খুশীর হাসির ঝিলিক। নাকের শেজ্-জুয়েলাটা চিক চিক করছে দালানের আবছা আঁধারে। মধুমালতীকে দেখলে কে বলবে যে তার ঘরে প্রচণ্ড অভাব, তার স্বামী হরিমোহন রাতে বাড়ী থাকে না।

—মালতী, তুমি এখনও জেগে? স্বামী বুঝি ফেরেনি এখনও? বড়বৌ বললেন সামান্য ধীরকণ্ঠে। আগের চেয়ে আস্তে।

—না বড়দি! আজ ফিরবেনও না। কালও ফিরবেন না। সেই পরশু ফিরবেন জামশেদপুর থেকে।

কেমন যেন নকল হাসি হেসে হেসে বলে মধুমালতী। লঘু কণ্ঠস্বরে।

—জামশেদপুরে কেন? হরিমোহন কি হাওয়া বদলাতে গেল তবে?

প্রদীপের আলো পড়েছে বড়বৌয়ের উর্দ্ধাঙ্গে। বিষাদমাখা মুখ, যেন অপ্রসন্ন প্রতিমার মত। কপালে দু'একটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে আছে। এলো কেশের বোঝা নেমেছে পিঠে।

মধুমালতী দালানের মেঝেয় চোখ মেললো। করুণ করুণ চোখ। আর যেন সব-কিছুকে-তুচ্ছ-ক'রে—দেওয়া নকল-হাসি টানতে পারলো না ঠোঁটের ফাঁকে। বললে,—না হাওয়া বদলাতে যাননি, গেছেন জামশেদপুরে থিয়েটার করতে। কলকাতা থেকে পার্টি গেছে না কি থিয়েটারের।

—থিয়েটার! সে কি কথা মালতী? কিছু ঘরে আনতে পারে হরিমোহন?

মধুমালতী তার বড় বড় চোখ তুললো। বললে,—আর কিছু তো জানে না। লেখাপড়াও শেখেনি কস্মিনকালেও। তাই দেখছে যদি জমিদারী চেহারাটা দেখিয়ে যাত্রা-থিয়েটার ক'রে যদি কিছু উপার্জ্জন করতে পারে।

—হরিমোহন কিছু পায়?

—মাঝে মাঝে পায় বৈকি। তবে ফি মাসে কি আর পায়! পালাপার্ব্বণে যখন ডাক পড়ে পার্টির তখন পায় কিছু কিছু।

এত রাগারাগি, চেঁচামেচি, অভিমানের আক্ষেপ—সব কিছু যেন ভুলে গেলেন বড়বৌ। দালানের এক জানলায় রাখলেন হাতের প্রদীপ। বললেন,—তবে তো ভাল কথা মালতী। চরিত্তিরটাকে ঠিক রেখে হরিমোহন যদি চালিয়ে যেতে পারে তবে তো ভালই।

—তাতে কি আর সংসার চলে বড়দি! কোন' কোন' মাসে দেয় হয়তো বিশ পঞ্চাশ।

মধুমালতীর কথা কেড়ে নিয়ে গর্ব্বের হাসি হেসে বড়বৌ শুধোলেন, —হ্যাঁরে মালু, কি কি পার্ট করে হরিমোহন? কোন্ কোন নাটকে প্লে করেরে?

মধুমালতী বলে,—সে কথা আর বলবেন না, সব আপনার মলাটের পার্ট।

—মলাটের পার্ট? বইয়ের মলাট আবার কি পার্ট করবে! শুনিনি তো কোন'দিন ভাই।

অপ্রস্তুত হয়ে উঠলো মধুমালতী। বললে,—কর্ণার্জ্জুনের কর্ণ, সিরাজদ্দৌলার সিরাজ, দিগ্বিজয়ীতে নাদিরশা, আলমগীরে আলমগীর ও রঘুবীর—

দম ফুরিয়ে যায় যেন মধুমালতার। আর যেন বলতে পাচ্ছে না এক নিশ্বাসে।

—আমরা একদিন দেখতে পাই না মালু?

—না বড়দি। আমি বলেছি ও থিয়েটার যেন আমাকে কোনদিন দেখতে না হয়।

মধুমালতীর কথায় যেন বেদনার সুর। লজ্জানম্র চোখ তুললো কথার শেষে। সুখের সেই মিষ্টি হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। এতক্ষণ ছিল যেন নকল মূর্ত্তিতে, আসল রূপ ধরা পড়লো এখন। মধুমালতীর ঘরে অভাব, দু' বেলা পুরোপুরি খাওয়া নেই,—মুখে যেন তার প্রকট হয়ে ওঠে সেই দুর্গতির ছায়া। অর্দ্ধাহারে থেকে থেকে মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে যেন দিনকে দিন। পরিপূর্ণ আহার নেই, অথচ মধুমালতী পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে রাখে। তার সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। মনের দুঃখ না কি কখনও কখনও মুখে ফুটে ওঠে। ব্যথাহত মনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় মধুমালতীর মুখ-আয়নায়।

—বলা কি যায় মালু, কার ভেতরে কি আছে! হরিমোহনই হয়তো একদিন, বলা যায় না, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমর্ত্ত্য বোস, দানী বাবু কিংবা শিশির ভাদুড়ী হতে পারে।

বড়বৌ আশাভরা স্বরে বললেন। অকৃত্রিম গর্ব্বের অব্যক্ত হাসি যেন মুখে। একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন,—আমার কর্ত্তাই না হয় কোন কাজে লাগলেন না। শুধু ফাটকা বাজারে না শেয়ার মার্কেটে টাকা খেলিয়ে আজ ফতুর হয়ে ব'সে রইলেন। গোদের ওপর বিষ-ফোড়া, জমিদারীটা যেতে বসেছে।

মধুমালতী যেন কোন রকমে সামলে নিয়েছে নিজেকে। শাড়ীর আঁচলে মুখের ঘাম মুছলো চেপে চেপে। বললে,—বড়দি, আমাদের ছোটমুখে বড়দের আলোচনা না করাই ভাল। তিনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন। আপনি চলুন আপনার ঘরে, রুটির ময়দা আর তরকারীর শব্জী দেবেন। আমি এখুনি আনছি আপনার খাবার তৈরী ক'রে।

—কষ্ট করবি ভাই? আমিও আর পারি না সারাদিন পরে। নিজের জন্যে রাঁধতে বসি তেমন মনের অবস্থাও নয়। উনি আর ছেলেমেয়েরা আজ সদরে খেয়ে নেবেন।

বড় বৌয়ের কথাতেও যেন ক্লান্তি। হাল-ছেড়ে-দেওয়া সুর। আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর টেনে টেনে শ্বাস নিতে নিতে বলেন,—শুধু ওঁর জন্যেই তো আজকের এই বেলেল্লাপনা। উনি সবার বড়, উনি নিজেই মেতে উঠে চন্দনধামের সকলকে মাতিয়ে তুললেন। কত ক'রে নিষেধ করেছি, হাতে-পায়ে ধ'রে বলেছি যে, নিজে যা খুশী হয় কর', বাড়ীর আর কাকেও যেন ডেকো না। কথা বলতে বলতে বড়বৌ খানিক থেমে থেমে বললেন,—তা তিনি কি শুনলেন এই অভাগীর কথা? শুনলেন না। আমার শেষ গয়নাখানাও বিক্রী ক'রে দিলেন এই বাবদে। কত নিষেধ করেচি আমি, ইষ্টগুরুর দিব্যি পেড়েছি, তবুও শুনলেন না। কেঁদে যখন পা জড়িয়ে পড়লুম তখন উনি বললেন যে, জমিদারী তো যেতেই ব'সেছে শেষবারের মত একটা দিন, মাত্র

একটা দিন একটু আনন্দ করবো, ফূর্তি করবো, কোন বাধা মানবো না।
আমিও তাই আর—

কথা আর শেষ করলেন না বড়বৌ। কেন কে জানে তাঁর বড় বড় চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। মুখে যেন বিষাদ ফুটলো।

—চলুন বড়দি, ময়দা আর তরকারী দেবেন চলুন।

মধুমালতী অন্য কথা পাড়ে, অন্য প্রসঙ্গ তুলতে চায়। কথার মোড় ফিরিয়ে দিতে চায়। বলে,—চলুন, রাত কত হ'ল সে খেয়াল আছে?

—তুই কষ্ট করবি মালু? এই বোশেখের রাতে উনুন তাতে যাওয়া যে বড্ড কষ্টের!

কথা বলতে বলতে প্রদীপ তুললেন বড়বৌ। চললেন নিজের ঘরের দিকে। ছায়ার মত পিছু পিছু চললো মধুমালতী।

উনি তখন নেশায় চুর। চন্দ্রমোহন সত্যিই নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে হুইস্কি-জিন-সোডার সংমিশ্রণ পান ক'রে ক'রে। চন্দ্রমোহন মনে মনে জেনেছেন, আর হয়তো খেতে পাবেন না কোনদিন, আর যেন ফিরে আসবে না এমন দিন এমন রাত। আর আসবে না ঐ নূরজাহান আর মতিবিবি। ওয়াইন চেম্বারের দরজা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

কখনও খুশীর উল্লাস। উদ্ভাসিত আনন্দ। চিরসুখীর মত বেপরোয়া হাসি আর হাসি। ইয়াকি, ঠাট্টা আর অট্টহাসি।

চন্দ্রমোহন তখন ভুলে যান তাঁর আসন্ন দুর্দিনের দুঃখ, ১লা বৈশাখ ১৩৬২ সাল, কি ভয়ঙ্কর কালো-দিন! বর্ষারম্ভের এই শুভলগ্নে জমিদারী আর জমিদার-নাম ঘুচে যাবে। গণপ্রিয় সরকার গণজনকে নাকি বিলিয়ে দেবে দেশের মাটি। যার হাতে লাঙল তার হাতে তুলে দেবে জমির মৌরসীপাট্টা।

যখন মনে পড়ে, স্মরণে আসে ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ, তখন কেমন স্থির হয়ে যান চন্দ্রমোহন। অন্য এক মানুষ যেন তখন। সর্ব্বহারার আশাহত দৃষ্টি ফোটে চোখে। হতাশ হয়ে পড়েন ভীষণ।

চন্দ্রমোহন যেন ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এখন নাচঘরে। চোখের চাউনিতে যেন দেখতেই পান না, তাঁর সমুখে ব'সে আছে দু'জন রূপবতী। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন ভগ্নমনে, কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন হয়তো। তাঁর স্মৃতিপটে হয়তো জেগেছে কোন দুর্দ্দিনের দুর্ভাবনা —আসন্ন ১লা বৈশাখ, ১৩৬২ সালের।

—বড়বাবু, আপনি এমন চুপচাপ কেন?

বন্ধুদের মধ্যে কে একজন শুধোয় চুপি চুপি। বলে,—গেলাশ আনতে বলবো?

চন্দ্রমোহন যেন হঠাৎ নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন,—না, এখন আর নয়। খানিক বাদে।

নাচঘরে শুধু গানের সুর। প্রথমে একজন ধ'রেছিল একটি গান। এখন দু'জনেই একসঙ্গে গান ধ'রেছে নূরজাহান আর মতিবিবি,—এক-জোড়া ভীরু পাখীর মত এক হয়ে ব'সে আছে লজ্জা আর সঙ্কোচে। একজন যখন থামছে তখন আরেকজন ধরছে সুরের রেশ। চোখ তুলে তাকাতেও বুঝি লজ্জা, তাই দু'জনের বিনম্র চোখ। যেন তাকিয়ে আছে নিজেদের কাঁচুলী-আঁটা বুকের দিকে।

চন্দনধামের আঙিনার গানের সুর যেন তরঙ্গ তুলেছে ঝড়ের মত বাতাসের সঙ্গে তাল রেখে রেখে। নূরজাহান আর মতিবিবি গাইছে,—

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, ফিরে যাও,
কি আর রেখেছ বাকিরে!

মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ্
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু পুরাণো এই গান। খাম্বাজ সুর। দু'জনে একত্র গায় না, একজন থামলে, অন্য জন ধরবে। একজন যখন দম নেয়, তখন আরেকজন সুর ধরে। গান আর বাজনা ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই নাচঘরে। নীরব শ্রোতার দল ব'সে আছেন পলকহীন চোখে। সঙ্গীতসুধা না রূপসুধা পান করছেন, কে জানে।

গানটি শেষ হওয়া মাত্র চন্দ্রমোহন বললেন,—ঘরে বড় বেশী লোকের ভীড় হয়েছে। ভীড় একটু পাৎলা হওয়া দরকার। যাঁরা এখানে রাত কাটাবেন না তাঁরা যদি এখন খেতে যান তো ভাল হয়। বাঈজীদের গান তো শোনা হয়েছে, আর কি চাই! খেয়ে দেয়ে যে যার পথ দেখবেন, কেমন ?

বোমা মারলেন যেন চন্দ্রমোহন। তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো যেন কত কে। তাদের আশা চূর্ণ হয়ে গেল। চোখে লোভানি নিয়ে ফরাস ছেড়ে উঠলো কেউ কেউ। চন্দনধামের বাবুরা ব্যতীত সকলেই উঠলো একে একে। নিখরচায় বেশ চলেছিল গেলাশের পর গেলাশ। চোখের দেখা। বাধ সাধলেন বড়বাবু। তাঁর আজ্ঞা অমান্য করবে এমন কেউ ছিল না।

কোমরে ঝুলানো রেশমী রুমাল টানলো নূরজাহান। রুমালে মুখ মুছলো, অতি সন্তর্পণে। লোকের ভীড় কমতে নিজেকে ছড়িয়ে বসলো যেন মতিবিবি।

চন্দ্রমোহন বললেন,—বেয়ারা ক'টা গেল কোথায় ? আর যে আসেই না! ষ্টক ফুরিয়ে গেল না কি বাবা এরই মধ্যে ?

—বড়বাবু, আপনি মানা করেছিলেন, এখন যেন আর না সার্ভ করে। এখন যদি আপনি হুকুম করেন আবার আসবে বেয়ারার দল।

—আসবে মানে? ক্ষুব্ধকণ্ঠে চন্দ্রমোহন বলেন,—আসবে মানে কি? আসুক, এখনই আসুক। রাত কাবার হয়ে গেলে আসবে না কি?

—বেয়ারা!

—বেয়ারা!

—বেয়ারা!

প্রায় একসঙ্গে অনেকেই ডাক ছাড়লেন। ডাক পাড়লেন বাবুরা।

ট্রে-হাতে বেয়ারা আসে চকিতের মধ্যে। সারি সারি পূর্ণপাত্র ট্রের 'পরে। সারি সারি গেলাশে টলমল করছে সোনালী-রঙ-জল। সোডা-জলের ফেনিল বুদ্বুদ উঠছে গেলাশে। এক উগ্র গন্ধের হাওয়া বইলো যেন নাচঘরে।

চন্দ্রমোহন বললেন,—বেয়ারা কটাকে ব'লে দেওয়া হোক, ওরা যেন কাজে অমনোযোগী না হয়। কাজে যদি মন না থাকে এ্যাট্ ওয়ান্স্ টার্ন দেম্ আউট্। শালারা আমাদের সত্যিকার শালা নয়, ব'লে দেওয়া হোক।

বাঈজীদের গান শুরু হওয়ার সঙ্গেই ঘরের বাইরে যেতে হয় বেয়ারা-দের—চন্দ্রমোহনের হুকুমমত।

চন্দনধামের যত নাবালক কিশোর ঘিরে ধরেছিল বেয়ারাদের। এক আধ ফোঁটা যদি পাওয়া যায়! যদি মিলে যায় দু'এক গেলাশ।

কেউ বলে,—তোমাদের পায়ে পড়ছি, একটা গেলাশ আমাদের দাও।

কেউ বলে,—বকশিশ পাবে আমাদের কাছ থেকে। নগদানগদি।

কেউ বলে,—একটা জামা দেবো। নগদ টাকার বকশিশ আর জামা পাওয়ার লোভে বেয়ারাদের কেউ কেউ যেন লোভাতুর হয়ে ওঠে। বাবুদের ছেলেদের হাতে পাত্র তুলে দেয় লুকিয়েচুরিয়ে। বলে,—যাও যাও ভাগো, তামাম নেশা হো যায়েগা।

কচি কাঁচা দেহ নাবালক কিশোরদের, তবুও নেশা করার জন্মগত

লোভ যেন পেয়ে ব'সেছে। স্পিরিট আর এ্যালকোহল যেন জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ক্লোমনালিকা। কণ্ঠে যেন জ্বালা ধরে।

—গান থামলো কেন বিবিজানেরা ?

চন্দ্রমোহন হেসে হেসে বললেন। চিন্তাগ্রস্ত মুখে এখন আনন্দের অভিব্যক্তি! কপালে আর নেই একটিও চিন্তারেখা।

—হ্যাঁ তাইতো, থামা দিলে চলবে কেন ?

—সবে তো এখন কলির সন্ধ্যে, থামলে চলবে কেন ?

মিষ্টি মিষ্টি হাসলো মতিবিবি। ডালিম দানার মত দাঁতের সারি দেখিয়ে দেখিয়ে। সহাস্যে বললে,—কশুর মাফ্ করিয়ে জী। বাঙলা গান না হিন্দী গান হুজুর ?

—বাঙলা, বাঙলা।

—খেলোয়াতীর পায়ে নমস্কার, বাঙলাই ভাল।

—চন্দ্রমোহন শুধু বললেন,—তোমাদের যা ভাল লাগে সেই গান ধর বিবিজানেরা। জোরজবরদস্তির কিছু নেই।

আবার হাসলো মতিবিবি। মিষ্টি মিষ্টি হাসি। বড়বাবুর চোখে চোখ রাখলো খানিক, অকারণে।

মতিবিবি হেসে হেসে কথা কয় নূরজাহান বাঈয়ের কানে। কি কথা বলে বোঝা যায় না, শোনা যায় না।

নূরজাহান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। কুঁচিয়ে-পরা আসমানী রঙের পাৎলা বেনারসী শাড়ী যেন ঘাগরার মত ছড়িয়ে পড়লো কোমরের চতুর্দ্দিকে। জোছনাভরা আকাশের তলে যেন তরঙ্গায়িত সমুদ্দুর! ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় তার ভেলভেটের আঁটসাঁট কাঁচুলী চিকন তুলছে যেন চাঞ্চল্যে। মাথায় ফিকে নীল ওড়না। নূরজাহান ওড়না টেনে দেয় কপালের 'পরে।

হারমনিয়ম ককিয়ে কেঁদে উঠলো আবার। তবলা কথা বললো। নূরজাহানের পায়ের ঘুঙুর ঝুনঝুনিয়ে ওঠে। নাচতে নাচতে সে গান ধরলো—

এস বঁধু আমার কাছে, আমি তোমারে চাই ;
হৃদি-সিংহাসনে বসায়ে, চরণ ধুয়াই।

নাচঘর পর্য্যন্ত যেন নেচে উঠলো। নূরজাহান অঙ্গভঙ্গী করে নাচের তালে, ফর্সা নিটোল দুই বাহু বিস্তার করে, সর্ব্বাঙ্গে যেন হিল্লোল তুললো। গাইলো—অধর সুধারাশি, রেখেছি যতনে।

কর কর পান বঁধু, শোক তাপ ভুলে যাই।

বাবুদের কারও কারও মুখে হাসির ঝিলিক মারলো। গুছিয়ে বসলেন কেউ কেউ। নির্নিমেষ দৃষ্টি সকলের চোখে, যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আকাশের পৌর্ণমাসী চাঁদ দেখছেন। দেখছেন যেন এক স্বর্গের এক অপ্সরীকে। চোখের পলকটি আর কারও পড়ছে না! ওরা কোন্ মন্ত্রবলে যৌবনকে যে বন্দী ক'রে রেখেছে!

নূরজাহান গায় কণ্ঠে দরদ ফুটিয়ে! গায় যেন অন্তরের সঙ্গে। ছন্দে বাঁধা পদক্ষেপ তার। নাচতে নাচতে নিজেকে ঘুরিয়ে নেয় একেকবার। নাচঘরের যাঁরা যাঁরা আছেন চারদিক ঘিরে তাঁদের প্রত্যেকের চোখেই প্রায় চোখ পড়ে নূরজাহানের। তার হাসি-হাসি মুখ দেখতে পায় সকলে। কেউ বাদ যায় না। গাইতে গাইতে কেমন যেন মোহমাখানো হাসি হাসছে। গাইছে—

জীবন যৌবন, লুটাইব তব পায়
ধর ধর রাখ এ অবলায়
তব সোহাগ পীরিতে সুখ-সাগরে ভেসে যাই।

বাবুদের চোখের পাতা পড়ছে না। মুখে আর কথা ফুটছে না।

ট্রে-হাতে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ, ফিরেও দেখেন না একটিবারও। নাচঘরে পর্দাগুলি কেবল কারও রূপে গুণে যেন ভুলতে চায় না। এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে বিরামহীন লড়াই চালিয়ে চলে।

একবার নয়, একেকটি পঙক্তি বার বার গাইতে থাকে নূরজাহান। তার পেছনে পেছনে ঘোরা ফেরা করে সারেঙ্গী। যেন পোষা কুকুরটি। পায়ে পায়ে ঘুরছে যেন।

—বেয়ারা!

ছোট্ট একটি ডাক পাড়লেন চন্দ্রমোহন। ধীরকণ্ঠে।

—হুজুর!

সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও পেলেন। সাড়া পেয়ে বড়বাবু ইশারায় ডাকলেন বেয়ারাকে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এগোয় বেয়ারা। ট্রের 'পরে সারি সারি পূর্ণ গেলাশে সোনালী-রঙ জল টলমলিয়ে উঠে। চলকায়।

চন্দ্রমোহন বললেন,—গিলাশ দেও বাবুলোককোঁ।

হাতে হাতে পাত্র ধরিয়ে দিতে হয় যেন। একেকটি গেলাশ নামিয়ে দেয় বেয়ারা, একেকজনের সমুখে।

থ্রি ক্যাশেলস্ সিগারেট ধরালেন চন্দ্রমোহন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন নর্ত্তকীর দিকে। বিজলী পাখার সজোর হাওয়ায় ধোঁয়া যেন নাচতে থাকলো। বললেন,—বেয়ারা, রতনবাবুকো বোলাও।

দুয়োরের কাছেই ছিলেন রতনদা। ঘুঙুরের আওয়াজ শুনে যেন আর থাকতে পারেননি ওয়াইন চেম্বারে। ফেলে ছড়িয়ে চলে এসেছেন নাচঘরে। রতনদার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই চন্দ্রমোহন হাতের এক ইঙ্গিত করলেন। যেন নাচের এক মুদ্রা দেখালেন। গেলাশ ধরার মত হাত দেখালেন।

রতনদা বুঝেছেন কি বলতে চান বড়বাবু। সহাস সম্মতি জানিয়ে দরজা থেকে তৎক্ষণাৎ স'রে গেলেন।

চন্দ্রমোহন আর আর সকলের মত একই বস্তু খেতে চান না। তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, স্পেশাল বন্দোবস্ত। শুধু হুইস্কি কিংবা শুধু জিন নয় সোডা জলের সঙ্গে—হুইস্কি-জিন-সোডা কম্বাইন্ড্ একাধারে।

—বহুৎ মিঠা হায়। একেবারে তৈরী গলা!

তারিফের সুরে বললেন সত্যেন্দ্রমোহন। গান শেষ হ'তে, নাচ থামাতেই বললেন।

কেউ বললে,—লে গ্র্যাণ্ডিস্!

চন্দ্রমোহন বললেন,—লোকজন খেতে বসেছে, কেউ একবার খাও তোমরা।

চন্দনধামের বংশধর ছাড়া নাচঘরে আর বাইরের জন নেই কেউ।

—কাউকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

ফরাসের এক পাশে চুপটি ক'রে বসেছিলেন বিরাজমোহন। ভিয়েনের কাজ মিটে গেছে এখন। তাই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। উপরিপড়া হয়ে নিজেই উঠলেন। বললেন,—আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

চন্দ্রমোহন বললেন,—নাচঘরে দু'এক ট্রে চপ কাটলেট পাঠালে ভাল হয়।

—তাই না তাই। কাঁহাতক আর শুধু জল চলে!

কে যেন কথা জুড়লো কোথা থেকে। মুখ লুকিয়ে বললে।

বিরাজমোহন বললেন,—এখুনি পাঠাচ্ছি। আমি সব রেডী করিয়ে রেখে তবে এসেছি। চপ পাঠাবো না কাটলেট?

—দুইই পাঠাও।

—হ্যাঁ, দুইই চাই। শুধু চপ কিংবা শুধু কাটলেটে মুখ মেরে দেবে যে!

বিরাজমোহন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দালানে তিনি বেরুতেই কারা যেন হুড়দাড়িয়ে ছুটে পালালো। পালে যেন বাঘ পড়লো।

চন্দনধামের যত কচি কাঁচা কিশোর। যত এঁচোড়ে-পাকা ছেলে। বেয়ারাদের কাছ থেকে বকশিশের লোভ দেখিয়ে যদি মিলে যায় এক আধ গেলাশ। কিংবা নাচঘরের লাল ভেলভেটের ফাঁক থেকে যদি দেখতে পাওয়া যায় নর্ত্তকীদের! নাবালক, তাই প্রবেশাধিকার মেলেনি। চুরিয়ে দেখতে হয়। বিরাজমোহনকে দেখতে পেয়েই কারা ছুটে পালায়। সদরের ত্রিসীমানায় আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্দরে পালায় এক দৌড়ে।

অন্দর যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনই নীরব। দানবের মত হাঁ করে আছে যেন ঘন তমসাবৃত অন্দরমহল। সদরে আজ আনন্দোৎসব—যার ভয়ে ভীতা হয়ে জানলা দুয়োর বন্ধ ক'রে দিয়েছেন অন্তঃপুরবাসিনীরা। আজ রাতটির মত থাকতে হবে ভয়ে ভয়ে, সাবধান হ'তে হবে, যেন কোন অঘটন না ঘটে।

বাবুরা আজ হয়তো ভুল করবেন পদে পদে। লোক চিনতে পারবেন না। আপ্ত-পর জ্ঞান থাকবে না। নিজের নিজের ঘর ঠাওরাতে না পেরে হয়তো, অন্যের ঘরেই ঢুকে পড়বেন। তখন কে কাকে সামলাবে!

তার চেয়ে আগেভাগে সাবধান হওয়া ভাল। অন্ততঃ আজকের রাতটির মত নাই বা পাওয়া গেল বৈশাখের নতুন হাওয়া। এলোমেলো বাতাস যেন অন্দরের দুয়োরে দুয়োরে হানা দিয়ে যায়।

কিন্তু বাতাসের পরিবর্তে যদি কোন জলজ্যান্ত মানুষ অর্থাৎ বাবুদের কেউ যদি কারও দরজায় ঘা দেন! ভয়ে যেন সিঁটিয়ে থাকেন কেউ কেউ। রাত্রি শেষ হওয়ার আশায় আশায় থাকেন। কখন আকাশ সাদা হবে তারই কাতরপ্রতীক্ষা বিনিদ্র রজনী যেন শেষ হ'তেই চায় না।

সদর আর অন্দরের সঙ্গম যেখানে, সেখানে ছিল কুমারী, কিশোরীর দল। ভিয়েন থেকে আরও যদি কিছু পাওয়া যায়! একবার টাটকা টাটকি চাখতে দিয়েছিল হারাণ। চুল্লী থেকে নামতেই গরমাগরম দিয়েছিল একটু আধটু এটা সেটা। মণিমালা, রাধা শ্যামলী, কেকা, মঞ্জু, কমলা, ধীরা, ইরা, চম্পাবতী আবার কখন এসে ভীড় জমিয়েছে। হারাণকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। হারাণ হালুইকর এখন লুচি ভাজতে বসেছে। সদরে পাত পড়েছে। পঙক্তিভোজনে ব'সেছে চন্দনধামের বাইরের আগন্তুকেরা—বাবুদের বন্ধুবান্ধবেরা। দম ফেলবার অবকাশ নেই এখন হারাণের। পাতে গরম গরম লুচি দিতে হবে যে!

কচি কাঁচা কিশোরদের কারও কারও নেশা ধরেছে সামান্য দু'চার ফোঁটা খেয়ে কি না খেয়েই। মাথা যেন রিমঝিম করছে। পা পড়ছে বেঠিক। কথা জড়িয়ে গেছে। চোখের চাউনি বদ্‌লে গেছে।

কে কার আঁচল ধ'রে টানলো। কে বুঝি কাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের জটলায় ভিড়তে চায় হয়তো। নেশায় না অন্ধকারে হয়তো চিনতো পারে কে আপন আর কি পর।

মণিমালা আর রাধার দল ভয়ে আর ত্রাসে ছুটে পালালো, আঁচলে মুখ লুকিয়ে। বিয়ে হয়নি, সাঁথিতে সিঁদুর ওঠেনি, কুমারী নাম ঘোচেনি। বর্ষার কলাগাছের মত ভরাযৌবনা—তবুও কেন কে জানে, মণিমালা আর রাধাদের মন যেন চায় না এই নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে

মেলামেশা করতে। সাহসের অভাব যাদের, যাদের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি প্রবলতম—শুধু হয়তো তারাই চলাফেরা করে এই গোপন পথে। আপনাআপনিরমধ্যে—এ যেন চরমতম পাশবিকতা। ভাবতেও পারেনা মণিমালারা।

ঝড়ের বেগে হঠাৎ কারা আসে! দালান থেকে ছুটতে ছুটতে ঘরের ভেতর আসে। আসে হুড়দাড়িয়ে।

নিমীলিত চোখে এলিয়ে ছিলেন অনঙ্গমোহন। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আরাম-কেদারায়। কেমন যেন ক্লান্তিতে ডুবেছিলেন। একমাত্র ছেলে মণিমোহন এখনও না ফেরায় যেন অভিমান ক'রে চুপচাপ পড়েছিলেন নির্জীবের মত।

ক্ষেপা হাওয়া ছুটে আসতেই চোখ মেললেন ধীরে ধীরে। বললেন, —কেঃ?

চোখ মেলে দেখেন, কিন্তু যেন চিনতে পারেন না। হঠাৎ ভীতিতে থমকে থাকেন যেন।

—আমরা রাঙাদাদু!

—তোমরা কারা?

—আমি মণিমালা।

—ও, তাই বল'। আর আর কে যেন তোমার সঙ্গে রয়েছে? এসো ভাই এসো, কি ব্যাপারটা বল' তো? এমন ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এত রাত্রে?

মণিমালার ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। বক্ষদেশ কাঁপছে যেন থর থর। হাত পা ঘামছে। এক বুক শ্বাস টেনে নিয়ে মণিমালা বললে,—হ্যাঁ রাঙাদাদু, রাধা, কেকা, মঞ্জু আর ইরা আছে আমার সঙ্গে।

—হঠাৎ আমার ঘরে কেন? এই মাঝরাতে? আমিতো ভাই বুড়ো হয়ে গেছি একেবারে। অনঙ্গমোহনের কথায় ঠাট্টার সুর। ম্লান হাসির রেখা মুখে। এলিয়ে ছিলেন, সোজা উঠে বসলেন।

এখনও ভয় কাটেনি যেন। বুক যেন দুরু দুরু করছে। হাত পা কাঁপছে। বুক-পিঠ ঘামছে। মুখ থেকে যেন কথা সরছে না কারও। কেমন রাগো রাগো দৃষ্টি ফুটেছে ওদের চোখে। প্রতিবাদের উদ্ধত ভঙ্গী যেন।

রাধা বললে,—রাঙাদাদু বুড়োই ভাল, কাজ নেই ছেলে-ছোকরায়। এ বাড়ীর ছেলেরা একএকটা আস্ত—

অনঙ্গমোহন কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন,—কেন রাধাদিদি, কি করলে এ বাড়ীর ছেলেরা?

চুপ ক'রে থাকে রাধা। আর যেন বলতে পারে না। কথা সরে না মুখ থেকে। মণিমালা বললে,—ওসব কথা যেতে দিন রাঙাদাদু। আমরা বেশীক্ষণ থাকছি না, ভয়ের কিছু নেই। ছেলেরা যে যার ঘরে গেলেই আমরা এখান থেকে চ'লে যাবো নিজেদের ঘরে।

—মণিমোহনকে দেখতে পেয়েছো তোমাদের কেউ?

অনঙ্গমোহন ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে।

—না রাঙাদাদু, মণিকাকাকে দেখতে পাইনিতো।

—কোথায় যে গেছে গড্ নোজ্। কথা বলতে বলতে আবার এলিয়ে পড়লেন অনঙ্গমোহন। ভেঙ্গে পড়লেন যেন। সোজা যেন আর বসতে পারছেন না এক মুহূর্ত্ত। কত রাত হয়েছে কে জানে! অনঙ্গ-মোহনের চোখে তন্দ্রা নেমেছে, তবুও চোখে পাতায় এক করতে পারছেন না কোন মতেই। স্থির থাকতে পারছেন না কয়েক মুহূর্ত্ত একটানা। দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরছে যেন।

মণিমোহনের সুইসাইড ক্লাবের নামটি শোনা পর্য্যন্ত যেন অধীর, চঞ্চল

হয়ে উঠেছেন। এত হাজার হাজার নাম থাকতে আর কোন নাম কি খুঁজে পাওয়া গেল না—নামকরণ ক'রতে হয়েছে স্থইসাইড ক্লাব!

এ ক্লাবের ফাংশন কি! নিজের মনকে কতবার শুধিয়েছেন অনঙ্গ-মোহন। কিন্তু একটিও সদুত্তর মেলেনি। স্থইসাইড নাম কেন! আত্মহত্যা! সমগ্র বাঙলা অভিধানে অজস্র শব্দ আর তার প্রতিশব্দ আছে—কিন্তু শুধু মাত্র একটি কথা অনঙ্গমোহন যেন কাণে শুনলে এখনও শিউরে শিউরে ওঠেন। কত কাল আগে অনুপমা অগ্নিদাহনে পুড়ে ম'রেছিলেন, সেই তখন থেকে আজও যেন 'আত্মহত্যা' শব্দটি শুনলে ভীত হয়ে ওঠেন। আত্মহত্যার ইংরেজী অর্থ স্থইসাইড—এই নামে ক্লাবের নাম—সে কেমন ক্লাব! অনঙ্গমোহন তাঁর জীবনে অনেক অনেক ক্লাব, লজ্ আর এ্যাসোসিয়েশন দেখেছেন। ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, যোধপুর ক্লাব, কাশীপুর ক্লাব আর চৌরঙ্গীর পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের যতেক লজ আছে—সবই দেখা তাঁর। কিন্তু—

স্থইসাইড ক্লাব নাকি মানুষের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মরণকে না কি ভয় করে না এ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। যে অত্যাচার করে তাকে আর রেহাই দেয় না! যে হত্যা করে তাকে আর ছাড়ে না যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। হাত-বোমা তৈরী করে। কথায় কথায় সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। পরিত্যক্তা, অসহায়া আর ধর্ষিতাদের উদ্ধার করে। ফিরিয়ে আনে ফুসলে-নিয়ে-যাওয়া নিরুদ্দেশ মেয়েদের। যার কেউ নেই তার জন্যে স্থইসাইড ক্লাব। মণিমোহন এই ক্লাবের মধ্যমণি—লাইফ ফোর্স।

—তোমরা ভাই দাঁড়িয়ে থাকবে! ব'সবে না?

অনঙ্গমোহন চুপচাপ থাকতে থাকতে আবার কথা বললেন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে। বললেন,—সদরের হাঙ্গাম মিটলো?

—কে জানে!

রাগ আর বিরক্তির সঙ্গে বললে মণিমালা। বললে,—এখনই মিটবে? এর মধ্যে?

শিয়াল ডাকতে শুরু করলো আবার। সারা চন্দনপুরের শিয়াল একত্র হয়ে যেন ডাক ছাড়লো তারস্বরে। প্রথম প্রহর কখন উৎরে গেছে, এখন দ্বিতীয় প্রহরের ডাক পাড়লো। চন্দনধামের শিশুরা ঘুমের ঘোরে চমকে চমকে উঠলো।

—হুজুর, খাবার দিই টেবিলে?

শ্যামাপদ কোথায় ছিল কে জানে। দুয়োরের বাইরে থেকে হঠাৎ কথা বললে। শিয়াল-ডাক শুনে সেও বুঝি বুঝলো রাত গভীরতর হয়েছে। কেবল চন্দনধামের নাচঘর ছাড়া সারা চন্দনপুর নিঝুম হয়ে গেছে। আকাশের ঠিক মধ্যিখানে পৌঁছেছে চতুর্দ্দশীর নিটোল চাঁদ। জ্যোৎস্নার জোয়ার আকাশে। ঝির ঝির সোনা পড়ছে যেন আকাশ থেকে।

—খাবার দেবে টেবিলে? তা দাও। মণিমোহন তো এখন ফিরলো না। আর তো আমি ব'সে থাকতে পারছি না।

অনঙ্গমোহন বললেন কেমন যেন নিরাসক্ত নিস্পৃহের মত। কেমন নিরাশ সুরে।

—কে বললে মণিমোহন এখনও ফেরেনি?

বলতে বলতে ঘরে আসে মণিমোহন। গায়ের জামা খুলতে খুলতে।

—মণিমোহন!

—হ্যাঁ।

—কি কর' বল'তো! বুড়ো বাবাকে এই ভাবে দুশ্চিন্তায় ফেলতে হয়? কোথায় ছিলে শুনি এতক্ষণ?

—কোথায় আর থাকবো! ক্লাবে ছিলুম। আজ ক্লাবে কণ্ট্রাক্ট-ব্রীজের ফাইনাল খেলা ছিল, তাই ফিরতে দেরী হয়ে গেল।

—আমাকে যদি তুমি ব'লে যেতে, এত ভাবনায় থাকতে হ'ত না। বলেও গেলে না, অথচ ফিরলে কত দেরীতে!

বাবার কথায় কর্ণপাত করে না ছেলে। জামা আনলায় টাঙিয়ে রেখে মণিমোহন বললে,—হ্যাঁরে তোরা এখানে কেন রে এমন অসময়ে?

লজ্জা নামলো ওদের চোখে চোখে। চোখ নামালো ওরা। সলজ্জ হেসে ইরা বললে,—কেন মণিকাকা, তোমাদের ঘরে বুঝি আসতে নেই আমাদের?

—কে বলছে এমন কথা! এত রাতে কেন তাই শুধোচ্ছি।

মণিমোহন কোঁচার খুঁটে হাওয়া খেতে খেতে কথা বলে।

অন্য কেউ এ প্রশ্ন করলে হয়তো সঠিক উত্তরটা শুনিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মণিমোহনের কাছে যেন কেউ কথা ফাঁস করতে চায় না। মণিমোহন যে ধরণের মানুষ, হয়তো আসল কারণটা শুনলে এখনই খুনোখুনি বাধিয়ে তুলবে। মানবে না কাকেও? ছাড়বে না নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও। কোন অন্যায় নাকি বরদাস্ত করে না সুইসাইড ক্লাবের মধ্যমণি মণিমোহন। অন্যায় যে করে আর যে অন্যায় সহ্য করে দু'জনের প্রতি তার নাকি অসীম ঘৃণা।

রাধা বললে,—রাঙাদাদুর সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলুম। উনি একা একা থাকেন।

ছেলে ফিরেছে সুস্থ অবস্থায়, বুকে যেন বলে ফিরে পেয়েছেন অনঙ্গমোহন। যেখানে খুশী যাক, ফিরতে বিলম্ব হোক—তবুও ফিরেছে তো মণিমোহন। নাচঘরে গিয়ে জ'মে যায়নি। এতক্ষণ মরেছিলেন যেন অনঙ্গমোহন, ছেলেকে ফিরতে দেখে যেন বেঁচে উঠলেন। বললেন,—শ্যাম, টেবিলে খাবার দিলে?

—হ্যাঁ হুজুর। আপনি বসলেই হয়।

—মণিমোহন, তুমি এখন বসবে নাকি?

ছেলেকে সস্নেহে শুধোলেন বাবা। বললেন,—রাত তো বেশ হয়েছে। খেতে দেরী করবে কেন ফর্ নাথিং?

মণিমোহন বললে,—আপনি খেতে বসুন। আমি হয়তো কিছু খাবো না। যদি খাই তার দেরী আছে।

—কেন খাবে না কেন তাই শুনি? কোথাও থেকে খেয়ে এলে না কি?

প্রথমে হাঁ না কিছুই বলে না মণিমোহন! প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বললে,—যা গরম পড়েছে, খেতে যেন, রুচি নেই আর!

—তোমার শ্যাম ভিয়েন থেকে চপ কাটলেট আর কি কি যেন এনেছে। খাবে না, সে কেমন কথা?

অনঙ্গমোহন মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন। উঠে দাঁড়ালেন আরাম-কেদারা ছেড়ে।

—আপনি খান, আমি ও সব খাবো না। মণিমোহন কথা বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে,—স্ত্রীদের গয়না বিক্রীর টাকায় তৈরী চপ কাটলেট, রুচবে না আমার মুখে। শুনলে আমার আপাদমস্তক রি রি করতে থাকে!

—কে আবার কার গয়না বিক্রী করলো?

চোখ বড় করে প্রশ্ন করলেন অনঙ্গমোহন।

—কে তা জানি না! শুনছি আজকের নাচ গান নাকি গয়না বিক্রীর টাকায় হচ্ছে। জমিদারী হাতছাড়া হয়ে যাবে তাই নাকি শেষবারের মত চন্দনধামের বাবুরা—

অনঙ্গমোহনের ভ্রু কুঁচকে উঠলো। বললেন,—লেট দি ম্যাটার স্টপ

হিয়ার। যেতে দাও ও সব কথা। কে কি করলো না করলে তোমার আমার দেখার অধিকার নেই। কি বল, মণিমালাদিদি?

রাতের ভীরু পাখীর মত ওরা বোবা চোখে তাকালো মুখ তুলে। এ ওর মুখ দেখলো। মণিমালা হাসলো মৃদু মৃদু, বিষাদ হাসি।

মণিমোহন রুক্ষস্বরে বললে,—ভাল মন্দ বলার অধিকার রাস্তার লোকেরও আছে।

—তা থাক। বললেন অনঙ্গমোহন।—তুমি আর আমি রাস্তার লোক নয় সেইটেই ভুলে যাচ্ছো তুমি। উই আর ইনটাররিলেটেড্। দশ রাত্তিরের জ্ঞাতি। কি বল্ রাধা?

রাধা বললে,—মণিকাকা কিছু তো অন্যায় বলেননি রাঙাদাদু। মিথ্যে কথাও নয়। কল্যাণীকাকী আর সুমিত্রাকাকীর ঘরেতো খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল এই গয়না নেওয়া নিয়ে। রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

—তাই না কি?

বিদ্রূপের হাসি হাসলো মণিমোহন, কথার শেষে।

—লেট ইট গো। লেট ইট গো। বলতে বলতে ঘরে থেকে দালানে বেরিয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন। দালান থেকে বললেন,—আমি তো আর দাঁড়াতে পারছি না। আমি বসছি খেতে। তুমি এখন খাবে না তো মণিমোহন?

—যা গরম, একেবারে ক্ষিদে হয়নি!

অগত্যা অনঙ্গমোহন টেবিলের ধারে চেয়ারে বসলেন। বললেন,—এসো দিদিরা সব, এখানে এসো। খেতে খেতে আমি গল্প ক'রবো।

—যাই রাঙাদাদু।

সাড়া দেয় মণিমালা। ঘর থেকে বেরোয় দালানে। তার পেছনে আসে রাধা, ইরা, মঞ্জু।

বাবার আরাম-কেদারা ছেলে দখল করে। মণিমোহন বসে পড়লো। অনেক শ্রমের ক্লান্তি এসেছে যেন সারা দিন পরে এতক্ষণে। পাখার তলায় তাই খানিক বসতে ইচ্ছা হয়। চলাফেরায় পা দুটো যেন টন টন করছে। চোখ বুঝি ঘুমে জুড়িয়ে আসছে।

গরমের ওপর দোষ চাপিয়েছে মণিমোহন। ক্ষুধা না হওয়ার কারণটা তার আদপেই সত্যি নয়।

অলকা দেবী খাইছে মণিমোহনকে। হাতে নগদানগদি টাকা পেতেই গঞ্জের হোটেল থেকে মাংস আর কি কি যেন আনিয়ে জোর ক'রে খাইয়েছে মণিমোহনকে। কোন ওজর আপত্তি শোনেনি, বাধা নিষেধ মানেনি! মণিমোহন খেতে আপত্তি জানাতে অলকা বলেছে,—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার কথা রাখো। আমার বুঝি সাধ হয় না তোমাকে খাওয়াতে? অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিয়েটাই না হয়নি তোমাতে আমাতে—

মণিমোহন তখন বলেছিল,—টাকা আমি দিয়েছি তোমার খরচা চালাতে। আমাকে খাওয়াতে নয়।

—একা একা খেতে যে মন চায় না, তুমি কি তা বোঝ না? কেমন যেন দুঃখকাতর সুরে বলেছিল অলকা। বলেছিল,—তোমাকে যদি আমি সদাক্ষণের জন্যে পেতুম, তাও পেলুম না। সমাজের কাছে আমি রইলুম একটা খারাপ মেয়ে, অথচ এ্যাতদিনে তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মনুষকে চিনলুম না। কে বুঝবে আমার মনে কি কষ্ট? শিয়ালদা ষ্টেশনে তোমাকে যখন প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছি তোমার সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক।

—আমি বুঝবো তোমার কষ্ট।

—তুমি আমাকে দয়া করে পায়ে ঠাঁই দিয়েছো তাইই আমার কাছে

যথেষ্ট, আর কিছু আমি চাই না। তুমি শুধু থাকো আমার হয়ে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবো না কোনদিনের তরেও। তোমার ঐ পায়ে যেন মরতে পারি একদিন।

—কি যে বল' অলকা! তোমার মত আরও শত শত মেয়ে আছে যাদের আজ ত্রিসংসারে কেউ নেই! পূব বাঙলা থেকে এসে অনাথ আশ্রম আর নারীকল্যাণ আশ্রমে ঠাঁই হয়েছে তাদের। সহায়সম্বল বলতে কিছু নেই।

—তা আমি জানি! আমাদের নোয়াখালীরই ক'জন মেয়ে রয়েছে এখনও এই চন্দনপুরের অবলা আশ্রমে। তারাও আমারই মত সর্ব্বহারা।

—তুমিও কি তাই? এখনও?

—না না। আমি যে তোমাকে পেয়েছি। আমার বাবা, মা, দাদা সকলকে কেটে ফেলেছে, তাতে আর কোন দুঃখু নেই আমার। তুমি থাক আমার হয়ে।

—তুমি বেঁচে গেলে কিভাবে? চোখ পড়েনি তোমার ওপর?

—আমাদের পল্লীর শামসুদ্দীন চৌধুরী একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। আমার বাবার খুব বন্ধু। আমরা তাঁকে বাবার মতই ভক্তি করি। তিনি নোয়াখালীতে মাষ্টারী করেন। নোয়াখালী প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি বোধ হয় আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন। আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে। তিন দিন তিন রাত্তির লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর রিফিউজীদের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

—মুসলমান জাতটার ওপর তোমার ঘেন্না হয় না অলকা?

—না। মোটেই নয়। কেন, আমাদের মত মুসলমান মেয়েদেরও কি সর্ব্বনাশ হয়নি মহাত্মাজীর এই অহিংস হিন্দুস্থানে?

—তবে কি হিন্দুদের ওপর রাগ হয়? রক্ষা করতে পারলো না তোমাদের তাই জন্যে?

—না না। আমার শুধু রাগ হিন্দু আর মুসলমান লীডারদের ওপর, যারা এই দাঙ্গাটা বাধালে। ইচ্ছা হয় লীডারগুলোকে গুলী করি। হাতের কাছে এখনও যদি পাই—

কেমন যেন প্রতিহিংসার জ্বালা ফুটেছিল অলকা দেবীর মুখেচোখে। সত্যি সত্যিই হাতে একটি কার্তুজভরা পিস্তল আর হাতের কাছে হিন্দু আর মুসলমান লীডারদের পাওয়া গেলে যেন তখনই গুলী করতো অলকা।

—পূব বাঙলার মেয়েকে বড় ডরাই আমি। বলেছিল মণিমোহন। বলেছিল,—আর পশ্চিম বাঙলার মধ্যে মেদিনীপুরের মেয়েদের।

হাসিমুখে শুধিয়েছিল অলকা।—কেন? কি করলো তারা?

—কল্পনা দত্ত আর মাতঙ্গিনী হাজরাদের ভয় করে না? তারাইতো টলিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সিংহদের রাজসিংহাসন।

—ও তাই বল'! বলেছিল অলকা।—আমি ভাবছি বুঝি তোমার ভয়ের কারণটা অন্য কিছু। প্রথম প্রথম তুমি আমার কথার দোষ ধরতে। কত চেষ্টায় কোন রকমে পশ্চিম বাঙলার কথ্য ভাষাটা আয়ত্ত করেছি! তোমার জন্যে আমি—

—আর আমি তোমার জন্যে।

—হ্যাঁ তাইতো! তুমি আমার অকুলের কুল, তুমি আমার সর্ব্বস্ব! দেশে তো আরও অনেক ছেলে ছিল, কেউ তো এলো না আশ্রয় দিয়ে ঘরে তুলতে! তুমি আমার যে কত জন্মের হারনো পরশমণি। আবার খুঁজে পেয়েছি তোমাকে।

—তোমার ভয় করেনি? শিয়ালদা ষ্টেশনে তোমাকে যখন আমি ইশরায় ডাকলুম তুমি তখন ভয় পাওনি?

—ভয় ! ভয় নয়। ভয় আমি পাইনি। যে সব হারিয়ে এক বস্ত্রে চলে এসেছে তার আর ভয় কিসের? তোমার ডাক পেতেই সাড়া দিয়েছি তাই। বাস্তুহারাদের দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছি তখনই ! আগুপিছু না ভেবে তোমার পিছু পিছু চলে আসি অফিসার-ইন-চার্জ্জের চোখে ধূলো দিয়ে ! তারপর—

—মণিমোহন ! একবার শুনে যাও।

খেতে খেতে ডাকলেন অনঙ্গমোহন।

আরাম-কেদারায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল মণিমোহন। ক্লান্ত আর অবসন্ন শরীর যেন আর বইছে না। সারাদিন কলকাতায় টো টো ক'রে ঘুরতে হয়েছে। প্রখর রৌদ্রে টাকার ধান্দায় ঘোরা যে কি দুর্ব্বিসহ কষ্টের ! লোকাল ট্রেণে যাওয়া আসা করতে হয়েছে চন্দনপুর কলকাতা। ফিরতে না ফিরতে যেতে হয়েছে অলকার কাছে। অলকা খাইয়ে দিয়েছে আকণ্ঠ। রুটি, মাংস আরও কত কি সেই সঙ্গে। তারপর অলকাকে খুশী করতে, তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটাতে থাকতে হয়েছে আরও কতক্ষণ !

—মণিমোহন ! ঘুমোলে না কি ?

সাড়া না পেয়ে আবার ডাক পড়লো।

—না ! বলুন কি বলছেন।

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরোয় মণিমোহন। কথার শেষে একটা হাই তুললো তন্দ্রার আবেশে।

—তোমার ভাইঝিরা কি বলছে শোন' একবার।

ছেলে সামনে আসতে হেসে হেসে বল্লেন অনঙ্গমোহন।

—কি আবার বলেছে ? কি রে মণিমালা, কি বলছিস ?

মণিমালা, রাধা, মঞ্জু আর ইরা হাসলো মিটি মিটি। কেউ কোন কথাই বলে না!

অনঙ্গমোহন সহাস্যে বলেন,—বলছে যে কাকার বিয়ে দেবেন কবে আর?

—অ।

সহজ সুরে বলে মণিমোহন। এ ধরণের অনুসন্ধানী প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে বহুবার শুনেছে সে। বললে,—তোরা সব শুতে যাবি না? কত রাত হয়েছে বল্ তো!

—রাঙাদাদুর খাওয়া হয়ে যাক, তারপর যাবো।

মণিমালা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললে। এখনও যেন দুরু দুরু করছে বুকটা। ঘর থেকে বেরুলে আবার যদি বাড়ীর কোন' ছেলে আঁচল ধ'রে টান দেয়! কেউ যদি লুকিয়ে থাকে কোথাও! ফাঁদ পেতে ব'সে থাকে! সদর থেকে মত্ত অবস্থায় কেউ যদি এখন ফেরেন অন্দরে!

অন্দরে পৌঁছলে প্রথমেই অনঙ্গমোহনের ঘর পড়ে। নিজেদের ঘরে যেতেও সাহস হয় না। ছুটতে ছুটতে তাই ওরা এ ঘরে এসে ঢুকে পড়েছে। যতই হোক, এ ঘরে আছেন একজন পুরুষ, যিনি অন্ততঃ মুখের কথায় রুখতে পারবেন বাড়ীর অকালপক্ক ছেলেদের। বাধা দিতে পারবেন তাদের।

—শ্যাম কোথায় গেল? শ্যামাপদ!

মণিমোহন ডাকলো নাতিউচ্চ স্বরে।

—যাই দাদাবাবু। আছি আমি হেথায়।

—আমার খাবার আর রাখিস্‌নে যেন। আমি শুতে চললুম।

—একটু কিছু মুখে দেবেন না দাদাবাবু? কত কষ্ট ক'রে আমি রান্নাবান্না করেছি!

—নাঃ। তুই একবার আসবি আমার ঘরে। গা হাত টিপে দিবি।

মাঝে মাঝে দরকার হয় মণিমোহনের। গা হাত পা টেপাতে হয়। যেদিন বেশী পরিশ্রমে শরীরটা একেবারে কাহিল হয়ে থাকে।

—একখানা চপ কি একখানা কাটলেটও নয় দাদাবাবু?

—নাঃ। ও সব তুই খেয়ে নিস্।

কথা বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চললো মণিমোহন! সিগারেটের প্যাকেট খুলতে খুলতে চললো।

অন্দরের কোথায় কার ঘরে ঘড়ি বাজতে শুরু করে। একসঙ্গে অনেকগুলি ঠুং ঠাং শব্দ হয়ে থেমে যায় ঘড়ি। রাত্রির নীরবতায় শব্দ হয় স্পষ্ট।

—ক'টা বাজলো ভাই?

অনঙ্গমোহন শুধোলেন খেতে খেতে।

—বারোটা বাজলো রাঙাদাদু।

—সদরের আলো নিভেছে ভাই?

—না না। সারারাত ধ'রে না কি আজ নাচ গান চলবে। দু'জন নামকরা বাঈজী এসেছে কলকাতা থেকে।

—বাঈজী!

—হ্যাঁ রাঙাদাদু।

—এই টোয়েন্টিয়েত্ সেঞ্চুরীতে? আন্থিনকেবল্!

নাচঘরে নাচের রুনুঝুনু। মতিবিবি নাচতে উঠেছে। মাথায় ওড়না খুলে ফেলেছে মতিবিবি। নূরজাহান বাঈ গান গাইছে আর মতিবিবি পূর্ণিমার রাতের সমুদ্রের মত অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোল তুলে নেচে নেচে আসর মাৎ করছে!

বাবুদের কেউ কেউ চপ কাটলেট মুখে তুলছেন আর একেক চুমুক সোনালী জল খাচ্ছেন থেকে থেকে। কেউ আপন মনে হাসছেন মৃদু মৃদু। কেউ একেবারে গম্ভীর হয়ে আছেন। ব'সেছিলেন সকলেই, এখন কেউ কেউ গড়িয়ে পড়েছেন তাকিয়া টেনে নিয়ে। অধিক নেশার শৈথিল্যে হয়তো। কেউ আবার নাচের তালে তালে তাল দিচ্ছেন পা নাচিয়ে নাচিয়ে।

ভেলভেটের আটসাঁট কাঁচুলা বুকে। পাৎলা বেনারসী মতিবিবির পরণে। ছাই রঙের। কুঁচিয়ে পরা। তবুও দেখা যায় মতিবিবির দেহরেখা। বাবুদের চোখে চোখে যেন লোভার্ত্ত চাউনি। চোখের পলক পড়ছে কি পড়ছে না। মতিবিবির নিটোল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন সাপের মত এঁকে বেঁকছে। আসমানী রঙের ওড়নায় মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়েছে নূরজাহানের। যেন আধখানা চাঁদ আকাশে। নূরজাহান হারমনিয়ম বাজিয়ে বাজিয়ে গাইছে,—

দেখা হলে তারি সনে, আমার কথা বোলো বোলো।
যে যাহারে ভালবাসে, তারে কি কাঁদানো ভাল ॥
আমি মরি যার তরে, সে ভালবাসে না মোরে।
তবুও যে আমি তারে, এখনও যে বাসি ভাল ॥
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে ঝুরে কি মম লাগি।
বোলো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায় না ব্যথা
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভাল ॥

বাবুরা যেন দৃষ্টি স্থির রাখতে পারেন না। কাকে ফেলে কাকে যে দেখবেন যেন ভেবে পান না। গান শুনবেন না নাচ দেখবেন! নূরজাহানকে দেখবেন, না মতিবিবিকে!

দেখা হলে তারি সনে, আমার কথা বোলো বোলো—এই অনুরোধ

নূরজাহান যেন নাচঘরের প্রত্যেককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে গানের সুরে। মুখে তার কাকুতি-মিনতির ভাব ফুটে আছে। গান গাইছে যেন দুঃখভারাক্রান্ত করুণ সুরে। সঙ্গে সঙ্গে সারেঙ্গী কাঁদছে এক টানা। মতিবিবি মিনতি জানায় চোখের ইশারায়। হাতের ইঙ্গিতে। দেহভঙ্গীতে। তার পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে সারঙ্গী। যেখানে যায় সেখানে যায় পেছন পেছন।

বেয়ারা কখন হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে কাচের গেলাশ। চন্দ্রমোহন যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন তাঁর হাতে পূর্ণপাত্র—হুইস্কি-জিন-সোডার সংমিশ্রণ। গেলাশে ক' টুক্‌রো বরফ ভাসছে। দেখা মাত্র পাত্র মুখে তুললেন। এক চুমুকে পান করলেন অনেকটা। মুখখানা বিকৃত করে বললে,—আমি একবার উঠি। ভদ্রলোকরা সব খেতে বসেছেন। দেখে আসি কি পড়লো না পড়লো।

পাত্র হাতে ধীরে ধীরে উঠলেন তিনি। নেশা হয়তো কেটে গিয়েছিল তাঁর, চললেন স্বাভাবিক পদক্ষেপে, মিহি-কোঁচানো কোঁচা লোটাতে লোটাতে।

মতিবিবি শুধু দেখে দেখে চিনেছিল চন্দ্রমোহনকে, যে ইনিই এই জলসার হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা—যাঁর হুকুমে সকলে উঠছে বসছে। দেখে দেখে কেন কে জানে ভাল লেগেছিল মতিবিবির। পাৎলা আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবী, মিহি-কোঁচানো ধুতি। হাতে একটি নবরত্নের আঙটি জামার বোতাম সাদা মুক্তোর—চন্দ্রমোহনকে মানিয়েছে চমৎকার।

নাচতে নাচতে হঠাৎ স্থির দাঁড়িয়ে পড়ে মতিবিবি। গমনোদ্যত চন্দ্রমোহনকে উদ্দেশ ক'রে বলে,—হুজুর, এক গিলাশ ঠাণ্ডা পানি মিলানা।

চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ালেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—জরুর মিলেগা। বেয়ারা! বেয়ারা।

পায় না কেউ।

নর্ত্তকীর এক বাঁকা চোখের দৃষ্টিবাণে জর্জ্জরিত চন্দ্রমোহন মনে মনে আক্ষেপের হাসি হাসলেন নাচঘর থেকে বেরিয়ে। কোথায় ছিলে তুমি? যখন দিন ভাল ছিল তখন ছিলে কোথায় তুমি? তোমার নীরব আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্যে যে আজ আর কুলাবে না! আমার দর্জ্জির তৈরী ধোপ দুরস্ত জামা কাপড় দেখেই ঠাওরালে বুঝি, আমি অনেক টাকার মালিক? শেয়ার মার্কেট আর গড়ের মাঠে ঘোড়ার পেছনে আমি আমার লাষ্ট ফার্দিং পর্যন্ত ঢেলে ফেলেছি, পকেট শূন্য আজ। বোতলের মদ ফুরিয়ে গেছে, শূন্য পেয়ালা।

হুইস্কি আর জিনের এককালীন প্রতিক্রিয়ায় চন্দ্রমোহনের মত ফাটকাবাজও যেন কেমন দার্শনিক হয়ে ওঠেন। কত কথা মনে হয় তার। ঐ নর্ত্তকীর সঙ্গে যেন মনে মনে আলাপচারী করতে থাকেন দালানে বেরিয়ে।

—বড়বাবু।

—হুআরউ? (হু আর ইউ?)

—এমন দেওয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

রতনদা দেখতে পেয়েছিলেন ওয়াইন-চেম্বারের দরজা থেকে। দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছেন। জামার হাতা গোটাতে গোটাতে।

চেনা চেনা সুর শুনেছেন কানে। চন্দ্রমোহন তাঁর বন্ধ চোখ মুক্ত ক'রে দেখতে দেখতে বললেন,—রতনদা?

—ইয়েস্ ব্রাদার। ডু ইউ ফীল্ আনওয়েল্?

—নটাটল্। (নট্ অ্যাট্ অল)

—ছাট্‌স্‌রাইট্। বললেন রতনদা সস্নেহে। চন্দ্রমোহনের পিঠে হাত রেখে বললেন,—কোথায় চললে কোথায়?

—তোমার কাছে? আমাদের হারাণো রতনের কাছে।

—ডু ইউ ওয়ান্ট্ ড্রিঙ্ক্স্?

—নাথিং বাট্ ড্রিঙ্ক্!

চন্দ্রমোহন কথা বললেন কেমন যেন বিষণ্ণ কণ্ঠে। বুকে যেন তাঁর ব্যথা বেজেছে, নাকি বাইজীর নয়নবাণের আঘাত পেয়েছেন।

—আসর থেকে উঠলে কেন তুমি?

—ফর্ এ গ্লাশ্ অন্‌লি?

—তুমি তো হুকুম করবে। রতনদা কথা বলেন চন্দ্রমোহনের পিঠে হাত রেখে। বলেন,—আসবে তুমি না থাকলে ভাল দেখায় না। ওয়েট্, আই এ্যাম্ কামিং। ওয়াইন চেম্বারে ছুটলেন রতনদা।

কথায় কথায় ইংরাজী বলেন চন্দ্রমোহন, যখন এক-আধ পাত্র পান করেন। বাঙালী রাগ করলে হিন্দী বলে, প্রেমের কবিতায় ফরাসী কিংবা ফার্সী কথা ব্যবহার করে, আর মদ খেলে বোধ করি ইংরেজী আওড়ায় কথায় কথায়।

না না, চন্দ্রমোহন সত্যি সত্যিই ইংরেজী জানেন। লিখতে জানেন না, বলতে জানেন নির্ভূল ফিরিঙ্গী ভাষা। লেখার ভাষা নয়, কথার ভাষা।

ছেলেবেলায় খাস-ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর অভিভাবক না কি আদপেই পছন্দ করতেন না। স্কুল কলেজে যাওয়া। সাধারণের ছেলেদের সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে, জমিদারের ছেলে পড়বে? তেলে আর জলে মিশ্ খায় না। যাই হোক, শিক্ষা দেওয়ার কায়দা ইংরেজের মত জানে না এ দুনিয়ায়। খাস-ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী চন্দ্রমোহনের কাণ ধ'রে ইংরেজী কথ্য ভাষাটা শিখিয়ে দিয়ে গেছে, আর কিছু শেখায় নি। সেই বিদ্যের এ যাবৎ ক'রে খাচ্ছেন। এক প্রায়-যুবতী ইংলণ্ডবাসিনী,

আবছা আবছা মনে পড়ে চন্দ্রমোহনের। ফিকে নীল গাউন থাকতো তার শ্রীঅঙ্গে। সোনালী চুলের অপূর্ব্ব কবরীতে থাকতো জেড্ পাতরের ব্রোচ-পিন। কাণে সোনার মাকড়ি। নকল মুক্তোর মালা বুকের খাঁজে; চন্দ্রমোহনের মনে আছে এখনও, সেই ইংরেজ ললনার কথা বলার ধরণ, উচ্চারণের মাধুর্য্য। নাম ছিল তার ক্যাথারিনা।

কলকাতা থেকে ক্যাথারিনা আসতো চন্দনপুরে, ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায়। প্রতি হপ্তায় চারদিন আসতো। মাসে মাসে মাইনে নিতো একশোটি মুদ্রা। তা ছাড়া আসা যাওয়ার ট্রেন ফেয়ার।

—আঃ!

এক চুমুক খেয়ে বললেন চন্দ্রমোহন। তাঁর হাতে পাত্র ধরিয়ে দিয়েছেন রতনদা। এক চুমুক পানের পর তৃপ্তির সঙ্গে বলেন,—আঃ!

কণ্ঠ যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। বুকে যেন জ্বালা ধরেছিল। আগুনে পুড়ে যাওয়ার অনেক পরে যেমন খুব বেশী জ্বালা ধরে, ঠিক যেন সেই অন্তর্জ্বালায় জ্বলছিলেন চন্দ্রমোহন। সেই পুরাণো ব্যথাটা হঠাৎ যেন চাড়া দিয়ে উঠলো একবারের জন্যে। পেটের সেই পুরাণো ব্যথা? বিষে বিষক্ষয় করবেন চন্দ্রমোহন। অন্ততঃ আজের রাতটির মত তিনি থামবেন না।

—রতনদা, তুমি ভাই ফ্যাক্টরী ম্যান্। ইউ ক্যান্ ষ্ট্যাণ্ড! চন্দ্রমোহন পর পর কয়েক চুমুকের পর কথা বলেন আবার।

দিলখোলা হাসি হাসলেন রতনদা। জামার হাতা গুটিয়ে জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলেন,—ফারনেসের সামনে থাকতে হয় ভাই আমাদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিন কেটে যায়। আমরা ষ্ট্যাণ্ড করতে পারবো না?

সংসারে রতনদার মত কষ্টসহিষ্ণু মানুষ হাজারে একটি মেলে না। দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্য করেন না, শোকতাপ, অভাব-অনটনে ভেঙ্গে পড়েন না যেমন, তেমন উপর্যুপরি মদ খেলেও মাতলামি করেন না কখনও।

চন্দ্রমোহন বলেন,—আমিও এককালে পারতুম বৈ কি রতনদা। এক বোতল হোয়াইট লেবেল একা একদিনে খেয়েছি। তখন দিনকাল অন্য ছিল, এখনকার মত ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল না আমার। নাউ আই অ্যাম ব্রোকেন্, ডিজাপয়েণ্টেড্, ডেস্পন্ডেণ্ট্।

তার ওপর জমিদারীটাও বেহাত হ'তে চললো। যদি একটা চাকরী ফাকরী করতে।

চন্দ্রমোহন সদন্তে বললেন,—সাত পুরুষে ব'সে খাচ্ছি রতনদা। চাকরী করা এই শেষ বয়সে পোষাবে না বেরাদার।

—তা তো বটেই। তা তো বটেই।

রতনদা পকেট থেকে নিভাঁজ রুমাল বের করেন আর বলেন।

—তবে এখন আমাদের ফ্যামিলির কেউ কেউ চাকরী করছে। চন্দ্রমোহন বলেন,—কি লজ্জার কথা বল'তো রতনদা ?

—তা তো বটেই। তা তো বটেই।

—কেউ ক্যারানিগিরি করছে দশটা পাঁচটা। কেউ অফিসের পিওনের কাজ নিয়েছে। কেউ আবার ইদিক উদিক কাজ নিয়েছে কলকারখানায়। কেউ কাজ নিয়ে চ'লে গেছে বাইরে। কথা বলতে বলতে শ্বাস ফেললেন চন্দ্রমোহন। অনুতাপের হতাশা ফুটলো যেন মুখে। বললেন—কাকেও বলতে গেলে মাথাটা কাটা যায় রতনদা, চন্দনধামের ছেলে চাকরী করছে !

—তা তো বটেই। তা তো বটেই।

রতনদা কথা বলেন আর বাম হাতের আঙুল চালিয়ে ঠিক করেন

বেঠিক, অবিন্যস্ত ব্যাক্‌ব্রাস চুল। জামার আস্তিন প্রায় পুটে গিয়ে মিশেছে। রতনদার এক বদ অভ্যাস, যখন তখন জামার হাতা গুটিয়ে ফেলেন। তখন দেখা যায় তাঁর হাতের বাইশেপের মাস্‌ল্‌। বোতাম-খোলা-সার্টের কলার থেকে উঁকি মারে যেন বৃষস্কন্ধ। রতনদা একজন বিখ্যাত এ্যথেলেট্‌, মাস্‌ল্‌ কণ্ট্রোলার, যদিও এখন সে-লাইন থেকে অবসরপ্রাপ্ত। বার আর বারবেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, রিং ধ'রে আর ঝোলাঝুলি করেন না, স্প্রিং ধ'রে টানাটানিও নয়। তবুও এখনও রতনদার লৌহমানবের মত আকৃতি। দরজায় মাথা ঠেকে! ডান পায়ের একটি সটে ফুটবল আকাশে পাঠাতে পারেন। ক্রিকেটের ব্যাট ধ'রলে ওভার-বাউণ্ডারী হাঁকাতে পারেন।

একবার ক্যারমের একটি ঘুটিকে ষ্ট্রাইক ক'রে দু' আধখানা ক'রে দিয়েছিলেন। জলকলের কোন্‌ এক ট্যাঁস ফোরম্যানকে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছিলেন তার পেটে মাত্র একটি ঘুঁষি চালিয়ে। এই কিছুদিন আগেও আটশো আশী গজের এক ফ্ল্যাট রেসের ওপেন টু অল্‌ কম্পিটিশনে টেনেছিলেন রতনদা। সেকেণ্ড্‌ হয়েছিলেন।

—গতর খাটিয়ে তোমরা খেতে পারো রতনদা। চন্দ্রমোহন হেসে হেসে বলেন,—আমরা তা পারবো কেন? ধাতেই সহ্য হবে না।

রতনদা বললেন,—তা নয় বড়বাবু। তোমার স্বপ্ন হয়তো রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহ, জমিদার আর জমিদারী। আমার ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন ছিলেন জিতেন ব্যানার্জ্জী আর গোবর গুহ,—গোষ্ঠ পাল আর বলাই চাটুজ্জ্যে!

কথার শেষে হো হো শব্দে হাসলেন রতনদা। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল হাসি। বললেন,—যাও বড়বাবু, তুমি নাচঘরে যাও। তুমি না থাকলে, এভ্‌রিথিং বিকাম্‌শ্‌ ডার্ক!

হতাশ, ম্লান হাসি চন্দ্রমোহনের সিক্তঠোঁটের প্রান্তে। মুখ যেন রক্তবর্ণ। চক্ষুও ঘোর লাল। তিনি বললেন,—নাচঘরে যেতে আই অ্যাম্ ফীলিং সাই।

—কেন? তুমি যে হাসালে বড়বাবু।

—না না, তা নয়। সত্যিই লজ্জার কারণ আছে। বড়বাবু কথা বলেন ফিসফিস। বলেন,—বাঈজী দু'টোর চরিত্তির ভাল নয়।

হেসে ফেললেন রতনদা! সহাস্যে বললেন,—এতক্ষণে আবিষ্কার করলে?

—হ্যাঁ।

আরও জোরের হাসি। রতনদা হাসতে হাসতে বলেন,—সেই ভয়ে তুমি অন্দরে পালাবে না কি বড়বাবু?

—পালাবো? আমি পালাবার ছেলে রতনদা?

কথার শেষে গেলাশ মুখে তুললেন বড়বাবু। এক চুমুকে বাকীটুকু শেষ হয়ে যায় সোনালী জলের।

—এত ঘন ঘন খেও না বড়বাবু। মারা যাবে?

—ফরগেট্ মী নট্। প্লীজ—

রতনদার হঠাৎ মনে হয়, তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বড়বাবুর শূন্য গেলাশ। কখন তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছেন বড়বাবু।

চন্দ্রমোহন অন্দরের দিকে গেলেন না, চললেন নাচঘরে। লাল ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সদর গমগম করছে যেন এত রাতেও। আজ রাতে আর অন্দরে ফিরবেন না। হারমনিয়ম আর তবলা চলছে জলদ। হাওয়ায় সিগারেটের গন্ধ ভাসছে। টুকরো টুকরো কথা আর মাঝে মাঝে দিলখোলা অট্টহাসির ঐকতান। সোডার বোতল খোলা হচ্ছে পটাপট। রাত্রি যত গভীর হয় তত যেন হুকুমের

মাত্রাটাও বেড়ে যায় বাবুদের। বেয়ারাগুলো হিমসিম খেয়ে ওঠে যেন। রতনদা ওয়াইন্ চেম্বারে একা যেন ম্যানেজ করতে পারছেন না।

আজ রাতের মত জোর ক'রে অন্দরকে ভুলে আছেন চন্দ্রমোহন। আজ আর ফিরছেন না। জমিদারী লাটে উঠে যাওয়ার আগে আজ শেষবারের মত এক হয়েছেন চন্দনপুরের বাবুরা। যেন লাষ্ট্ সাপার খেতে বসেছেন।

চন্দনধামের অন্দরমহল আজ এই গহন রাতেও জেগে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম নেই কারও চোখে, যাদের জ্ঞান হয়েছে। ঘুমিয়ে আছে শুধু নবজাত শিশুর দল। আর সব কে কোথায় কেউ বলতে পারবে না। খোঁজাখুঁজি করলেও ধরা যাবে না কে কোথায় আছে। সিঁড়ির তলার ঘরগুলো যেন আজ মুখর হয়ে আছে। পরিচারিকা ঝিয়ের দল ডেরা বেঁধেছে একেক কুঠরীতে। ওৎ পেতে বসে আছে যেন। বাবুদের চপলমতি ছেলেদের একেকজনকে যদি কেউ কেউ বশ করতে পারে, অনেক লাভ হয় নাকি। বলা যায় না, টাকাকড়ি কিংবা সোনাদানাও মিললে মিলতে পারে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে তারা। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়। আকাশের চাঁদ যদি হাতে পাওয়া যায়। কত দিকে কত সুখ, যদি বশ মানে বাবুদের বংশধরেরা! পরিচারিকার দল ধোয়া কাপড় পরেছে; পান খেয়ে মুখ রাঙিয়েছে; পাতা কেটে চুল বেঁধেছে। কারণে অকারণে হাসছে খিলখিলিয়ে। ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষায় থাকতে হবে, তবেই না টোপ্ গিলবে মাছে। ওৎ পেতে ব'সে থাকে যেন ওরা। পা বাড়িয়ে শুধু ইশারার অপেক্ষায় থাকে। জঘন্য, অশ্লীল গান ধরে। যেমন সুর তেমনি গানের ভাষা।

অন্দরের কোথাও কোথাও জানালা আর দরজায় কপাট পড়ছে বাতাসের বেগে। ক্ষনেক ব্যবধানে একেকবার শব্দ হয় হঠাৎ বিশ্রী, বিরক্তিকর। কপাট পড়ার শব্দে ঘুমন্ত শিশুরা জেগে ওঠে।

বিদ্রূপের হাসি হাসে যেন বৈশাখী হাওয়া। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও ঠিক ঝড়ের বেগ ধরে। রাশ্-আলগা ঘোড়ার মত উদ্দাম গতিতে ছুটছে যেন।

নীরবতা পালনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। জেগে জেগে ঘুমিয়ে আছেন বৌয়েরা। কান পেতে শুনছেন, কোথাও যদি কেউ কথা বলতে থাকে। শুনছেন, সদরের নাচঘরের গান-বাজনার ধ্বনি এখনও চলেছে, না থেমে গেছে। নাচঘরে কি আলো জ্বলছে এখনও।

দলছাড়া হয়ে গেছে রাধা। দলের আর আর সকলকে দেখতে পাওয়া যায় না। খুঁজে মেলে না। মণিমালা, ইরা, বীরা, চম্পা, মঞ্জুদের কোথাও সাড়া পায় না। তারা হয়তো নিজেদের ঘরে ফিরে গেছে। কিংবা আছে হয়তো অন্যের ঘরে।

রাধা দ্রুত পায়ে অন্ধকার দালান পেরিয়ে চলেছিল। কোথায় কে জানে। রাধার ম্লান মুখ, চোখে বিনিদ্রা। চোরের মত শব্দহীন পায়ে এগিয়ে চলেছে।

—ছোট্‌ঠাকুমা!

শুকনো গলায় ডাকলো রাধা। শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে আছে কণ্ঠ। মন হয়ে আছে বিক্ষিপ্ত। বিচার-বিবেচনা হারিয়েছে।

—ছোট্‌ঠাকুমা!

বুড়ীর তখন অর্দ্ধেক রাত। ঘুমিয়ে যেন কাদা হয়ে গেছেন। ঘরের এক কোনে জ্বলছে টিমটিমে হারিকেন। শিখা জ্বলছে কি জ্বলছে না।

আরও যেন আঁধার সৃষ্টি করেছে ঐ নিবু নিবু হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোকশিখা। তেমনি কি কালি পড়েছে চিমনিতে!

—ও ছোট্ঠাকুমা! জেগে আছো না ঘুমিয়েছো?

রাধা ঘর কাঁপিয়ে কথা বললে। বুড়ীর কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে দেখলো।

সাড়া নেই বুড়ীর মুখে। চন্দনধামের যে মহলটি বিক্রীর পর বেহাতে চ'লে গেছে সেই শূন্য ও পরিত্যক্ত মহল থেকে যেন অন্ধকার ভেসে আসছে। কালো তরঙ্গ আসছে একের পর এক।

কোথায় অর্গলহীন জানলার কপাট পড়ছে আছড়ে আছড়ে। সাথী-হারা অদৃশ্য বিড়ালটা এখনও কোথায় ডাকাডাকি করছে। শিশুর এক টানা কান্নার মত শোনায় যেন ঠিক।

রাধা এই তল্লাটে এসেছে রাতের নির্জ্জনতায়। তপন যদি তখন ফিরে না গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকে এখনও। থেকে থেকে রাধার কুমারী-মন যেন হু হু ক'রে উঠছে। তখন এত কড়া কড়া কথা ক'টা তপনকে না শোনালেই পারতো রাধা। গায়ের জ্বালায় মুখ ফসকে বলেছিল তখন। কিন্তু তারপর থেকে একটি মুহূর্ত্তের তরেও স্থির থাকতে পারলো কৈ! এমন চাঁদনী রাতে ভাল লাগে কি ছাই একা একা থাকতে! মনে মনে আঙুল কামড়ায় রাধা। আর হয়তো আসবে না তপন। অপমান করে যাকে বিতাড়িত করলো, সে হয়তো আর ডাকলেও আসবে না। বুক যেন খালি খালি ঠেকছে; পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে; চোখ ফেটে জল আসছে। রাধাকে যারা চেনে জানে তারা জানে রাধা ছাড়তে চায়নি তপনকে! ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল তার বুকে। দু' হাত যদি এক করতে না পারে, বিয়ে ক'রে যদি বধূরূপে ঘরে তুলতে না পারে—তবে শুধু শুধু মজা লুটতে দেবে না রাধা!

একজনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, আরেকজনকে বিয়ে ক'রে তার জীবনটাকে বিপন্ন করে তুলতে চাওয়ার মত মেয়ে নয় চন্দনপুরের রাধা। তবুও বুক যেন খালি খালি ঠেকছে, চোখ ফেটে জল আসছে কেন? আরেকবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে তপনকে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে তপন কি করছে কে জানে!

জানলার কপাট পড়লো আর চমকে উঠলো রাধা। ছোটঠাকুমাও যেন ঘুম থেকে জাগলেন। বিকট শব্দটা কানে যাওয়ায় বারেক চোখ মেলে আবার গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন।

ভাগ্য ভাল, চোখে দৃষ্টি নেই বুড়ীর। চোখ চাইলেও দেখতে পাবে না কিছু। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে রাধা। উন্মাদিনীর মত রূপ হয়েছে যেন তার। মাথার চুল আলুথালু হয়ে গেছে। বুকের কাপড় লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেয়।

—ছোটঠাকুমা!

আবার ফিস ফিস ডাকে রাধা। সাড়া পাওয়া যায় কিনা তাই যেন ডেকে পরীক্ষা করে।

গভীর ঘুমে ডুব দিয়েছে বুড়ী। খেয়ালই নেই কে ডাকছে না ডাকছে।

বাতাস যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে থেকে থেকে। সোঁ সোঁ হাওয়া চলেছে এলোমেলো। কোথায় মুক্ত কপাট ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলছে। নালীনর্দ্দমায় ছুঁচো ছোটাছুটি করছে।

চোরের মত রাধার চোখে লোভ আর ভয়ের চাউনি ফুটেছে। চুরি করার লোভ আর ধরা পড়ার ভয় ফুটেছে। সাহস হয় না সহসা, ছোটঠাকুমার মাথার বালিশের তলায় হাত চালাতে। সেখানে হাত চালাতে না পারলে মিলবে না গুপ্তধন।

বুড়ীর দিকে চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে রাধা। বিতৃষ্ণায় ভরে আছে যেন তার মুখের আকার। সমগ্র দুনিয়া যেন এখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। এমন কি সে নিজেও যেন নিজের কাছে ঘৃণার পাত্রী হয়ে উঠেছে। হায় হায়; চন্দনপুর তথা সারা বাঙলায় এত ছেলে থাকতে রাধার মত মেয়ের একজন সৎপাত্র জুটলো না!

বিয়ে না হওয়ার দুঃখে রাধা কোন-দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে কাঁদাকাটা করেনি। রাত্রে শয্যায় একাকিনী থাকতে হয় এখনও এই বয়সে—তবুও একরাতের জন্যেও সে জেগে ব'সে থাকেনি। কিন্তু লোকে যখন বলাবলি করতে থাকে তাই নিয়ে, তখন যেন চোখের জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা হয়। উঠতে বসতে খিঁচুনি সহ্য করতে হয় নিজের মায়ের কাছে। রাধাকে কাছে পেলেই রাধার পোড়াকপালকে দোষ দেন। অকথা কুকথা বলেন। বলেন,—দিন দিন ধিঙ্গী হয়ে উঠছিস, একটা পাত্র জুটছে না কেন? একটা কানা খোঁড়া হাবা কালা ছেলে পেলেও তো বেঁচে যাই আমি। বুকের পাতর নামাই!

নিজের মা যখন এই নিয়ে কটূক্তি করতে থাকেন, তখন রাধার আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। লোকে যা খুশী বলে বলুক। গর্ভধারিণী মা যখন বলেন, তখন চোখ ফেটে জল আসতে চায় যেন। তবুও যা হোক, ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে একটু যা হয় পুষে রেখেছিল, তাও আজ ঘুচে গেল। অযথা কথা শুনিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে তপনকে। কথা বলেছে অপমানের সুরে। আর হয়তো কোন দিন দেখা পাওয়া যাবে না তপনের। আসবে না সে রাধার কাছে। সোহাগের সুরে কথা বলবে না। ডাকবে না রাধাকে, তার নাম ধ'রে। হাতে হাত দিয়ে গল্প করবে না রাতের নির্জ্জনতায়।

তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা পড়লো রাধার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বুকে। উষ্ণ শ্বাস পড়ছে থেকে থেকে।

সোঁ সোঁ বাতাস চলেছে রাতের। যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে প্রকৃতি দেবী। সাথীহারা বিড়ালটা কাঁদছে টেনে টেনে। গভীর থেকে গভীরতর হয় অন্ধকার। ঘন কাজল মাথে যেন চন্দনপুর।

বালিশ থেকে ছোটঠাকুমার মাথাটি যদি ঘুমের ঘোরে নেমে পড়ে! সেই আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে রাধা। দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের দুয়োরে ঠেস দিয়ে।

কার পদশব্দে যেন চমকে ওঠে রাধা। এত রাতে চন্দনধামের এই পরিত্যক্ত মহলে আবার কার পদধ্বনি। তপন ফিরে এলো নাকি আবার, রাধাকে তার শেষ কথা জানাতে?

ঘরের দুয়োরে ছিল রাধা। বিদ্যুতের ঝলকের মত নিমেষের মধ্যে ঘরের দেওয়ালের আড়ালে লুকালো সে। কে বা কারা আসছে যেন এ মহলে! দরজার কপাটের ফাঁক থেকে চোরাদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে রাধা। হ্যারিকেনের অল্প আলোয় দেখা যাবে অস্পষ্ট। এ ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে হবে, যে যেখানেই যাক।

কে যায়! রাধা দেখতে পায় যেন দু'জনকে। একজন পুরুষ, একজন নারী। জলে-ভেজা-চোখে পলক পড়ে না। রাধা দেখছে তো দেখছেই। যারা আসছে তাদের চলার ভঙ্গী দেখে চিনতে পারে। দেখতে দেখতে চোখ যেন কপালে ওঠে তার। চোখে না দেখলেই যেন ছিল ভাল। দেখে যেন মন তার ঘৃণায় ভ'রে যায়।

শোভা দাসী না? চন্দনধামের মেজ তরফের ঝি। শোভার পেছনে কে? চন্দনধামেরই বিয়ে-না-হওয়া একটি ছেলে, রাধার ভাই হয় সম্পর্কে। বড়তরফের ছেলে মুরারীমোহন? কোথায় চললো দু'জনে।

কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! দেকে যেন চেঁচিয়ে উঠতে চায় রাধা। কে যেন তার গলা চেপে ধরে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে এখন!

দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ওরা। ভেবেছে হয়তো কেউ কোথাও নেই যে দেখতে পাবে ওদের এই নিশাঅভিসার। শোভা দাসী আজ ধোয়া কাপড় পরেছে। টেনে হিঁচড়ে চুল বেঁধেছে। কপালে চিক চিক করছে তার কাঁচপোকার টিপ। আঁটসাঁট সেমিজ।

পাশ ফিরে শুলেন ছোটঠাকুমা। ঘুমের ঘোরে অচেতন তিনি। মশার ঘন ঘন কামড়ে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। নড়াচড়ায় মাথা নেমেছে বালিশ থেকে। সাপের মত নিঃশব্দে এগোয় রাধা ছোটঠাকুমার মাথার দিকে এগোয় পা টিপে।

বাইরে কোথায় খোলা-জানলার কপাট পড়লো বিকট শব্দে। একটানা ডাকছে বেড়াল একটা, কাকে হারিয়ে যেন কাঁদছে, শোক-কান্না। জানলা পড়ার শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠলো রাধা। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বুক দুরদুরিয়ে ওঠে। হাত পা কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

ছোটঠাকুমাও জানলার কপাট পড়ার শব্দে জেগে ওঠেন। বজ্রপাতের মত শুনলেন যেন তিনি ঘুমের ঘোরে। দৃষ্টিহীন চোখ মেললেন। রাধা ভয়ে কাঠ হয়ে যায় যেন। ভরসা এই, দৃষ্টিশক্তি নেই বুড়ীর ছানি-কাটা চোখে ঘুম ভাঙতে বিড়বিড়িয়ে কি যেন সব বলেন। ইষ্টনাম বলেন হয়তো।

মলিন চিমনীর অল্প-আলোর হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের কোনে। লজ্জায় যেন মুখ লুকিয়ে আছে এক কোণে। রাধা ভাবছিল, হ্যারিকেনের আলো যদি আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়! একেবারে যেন অন্ধকার ঘর, কোথায় যে কি আছে ঠাওরান যায় না।

ঝড়ের হাওয়া যেন নিজের খেয়ালে বইছে যেমন খুশী। মদ-খাওয়া মাতালের মত কখনও উগ্র হয়ে ওঠে, কখনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। কখনও উচ্ছ্বাস, কখনও মৌনশান্ত।

ক্ষণেক হাওয়া থামতে নূপুরের কিঙ্কিনী স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন। রুনুঝুনু

বাজে যেন অনেক দূরে। ক্ষীণতম আওয়াজ আসে ছোটঠাকুমার ঘরের খোলা-জানলার বাইরের আকাশ থেকে।

জলসা ব'সেছে সদরের নাচঘরে। সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো রাধার বাঈজীর চরণধ্বনি শুনে। যে-বাড়ীতে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে, সে-বাড়ীর মানুষ নাচের আসর জমায় কোন আক্কেলে!

উবে যাওয়া গন্ধের মত বছরগুলো কত চটপট পেরিয়ে যায়! যেন দেখতে দেখতে কেটে যায় এক এক বছর। বয়সটাও সেই সঙ্গে বছরে বছরে এগিয়ে গেছে, ভাবলে যেন জ্ঞান থাকে না রাধার। বয়স হ'তে হ'তে বুড়িয়ে গেলে তখন যদি কেউ ঘরে না নেয়! কপালে যদি ইহ-জীবনে সিঁদুর না ওঠে! নারী হয়ে যদি নারীত্বলাভ বরাতে তার না থাকে।

ভেবে ভেবে যেন কুল-কিনারা মেলে না। রাধার বাবা আর মায়ের চেষ্টারও অন্ত নেই। তবুও ঘর মেলেতো, বরের মত বর মেলে না। আবার বর যদিও বা দু' একজন মিললো, টাকার কথা উঠতেই কেঁচে গেল সম্বন্ধ। দর কষাকষিতে পেরে ওঠেন না কন্যাপক্ষ।

নূপুরের রুনুঝুনু শুনে কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয় রাধার। হাওয়া বইতে থাকে কখন। আর যেন শোনা যায় না না নাচের ছন্দ। সোঁ সোঁ হাওয়া চলেছে শুধু। জানলার কপাট পড়লো আবার।

রাধার বুক কনকনিয়ে ওঠে। কি এক ব্যথা সদাক্ষণ যেন কষ্ট দেয়। মনের ব্যথা কিনা কে জানে! থেকে থেকে মনে মনে বেপরোয়া হয়ে পড়ে! ভয় থাকে না আর তখন, রাধার কাজল-কালো চোখে ফুটে ওঠে সর্ব্বহারার চাউনি। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাধা। হাতের শক্ত মুঠো।

অন্ততঃ আজকের রাতটুকুর মত রাধা আর তার সমজুটীদের বিয়ের ভাবনা মনের কোনাতেও ঠাঁই দিতে পারবেন না চন্দনধামের বাবুরা। জমিদারী চ'লে যাওয়ার দুঃখে এই শেষবারের মত তাঁরা একত্র হয়ে ফুর্ত্তি করছেন চুটিয়ে।

যারা বাইরের, যারা অনাত্মীয়, তাদের খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় ক'রে দেওয়া হয়েছে। বাইরের কাকেও বাঈজীর নাচ দেখায় ভাগ বসাতে নারাজ বাবুরা। নাচঘরে এখন শুধু চন্দনধামের কর্ত্তাব্যক্তির দল। গা ছাড়িয়ে বসেছেন নিশ্চিন্তায়। বেলফুল, হুইস্কি, সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিসেছে তাজা চপ্ কাটলেটের উগ্র গন্ধ।

কাঁহাতক শুধু আর জল খাওয়া যায় গেলাশের পর গেলাশ! একটু আধটু আনুষঙ্গিক ছাড়া শুধু জল!

নাচঘরের দেওয়ালে বটিচেলী আর র‍্যাফায়েলের নধরনিটোল নগ্ননারীর রঙীন ছবি। আর রেনল্ডের ছবি। আজ আর নাচঘরে এসে ওদের দিকে ফিরে দেখেন না কেউ! বিখ্যাত শিল্পীর আসল ছবির অনুকরণে দেশী শিল্পীদের আঁকা, তা হোক, তবুও সম্পূর্ণ উলঙ্গ রমণীদের ছবি। কতদিন বাবুরা কেউ কেউ মন ভাল না থাকলে নাচঘরের ছবি দেখে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

মতিবিবি আর নূরজাহান বাঈয়ের রূপের অনলে বাবুরা আজ পতঙ্গ! কেউ বা অত্যধিক মদ্যপানের ঠ্যালা স্যমলাতে না পেরে বার বার উঠে যান। যান আর আসেন। যে বিষ খেয়েছেন, গলায় আঙুল চালিয়ে সেই গরল উগরে আসেন।

বড়বাবু চন্দ্রমোহনও দুঃখে না নেশায় আপনাতে যেন আপনি ছিলেন না। কেমন যেন মনমরা হয়ে ছিলেন। জমিদারী যাওয়ার দুঃখ যেন যখন তখন ভেঙ্গে দেয় চন্দ্রমোহনকে মুষড়ে পড়েন তখন।

শুধু ঐ বাঈজীর এক চোখ দেখার পর থেকে যেন কেমন লুপ্ত-উদ্যম ফিরে পেয়েছেন। মুখে হাসি ফুটেছে।

ঝড়ের মত হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। লাল ভেলভেটের পর্দা আর কুঁচিয়ে-পরা শাড়ী উড়ছে নাচের তালে তালে। নাচের সঙ্গে গান চলেছে। নূরজাহান গাইছে যেন কত দরদ দিয়ে। হাত আর চোখের ইশারায় গানের ভাব ফুটছে। নূরজাহান গান ধ'রেছে ঝিঁঝিট সুরের। গাইছে—

বাঁশী তুমি আর বেজোনা, আর বেজোনা।
বাঁশীরে তোর পায়ে ধরি,
আর দিও না দাগাদারি,
আমি যে নারী, সইতে নারি
আমার বুকে আর সহে না॥
সদাই বল' রাধা রাধা, রাধা বৈ কি নাম জানো না॥
শ্যাম, অমন করিয়ে বাঁশী বাজায়োনা বাজায়োনা।
আমি যে নারী, সইতে নারী,
বুকের ব্যথায় মরি মরি,
রাধা নামের ডাক শুনে যে পাই শুধু যাতনা॥

গান শুনে আর নাচ দেখতে দেখতে বাবুরা যেন হতবাক হয়ে আছেন! নূরজাহানের মুখে যেন সত্যিই রাধা-রাধা ভাব ফুটেছে। কেমন বিষাদের সুরে গাইছে। রুখু চুলের কুন্তল খ'সে পড়েছে কপালে। লুটানো আঁচল উড়ছে। কাঁচুলীর ফিতে আলগা হয়ে আছে।

হাতের পাত্র আর মুখে ওঠে না। চোখের পলক পড়ে না! যেমনকার তেমনি বসে থাকেন ঢুলুঢুলু নেশাচ্ছন্নের দল!

গান থামতে এক ঝলক হাসে নূরজাহান। ক্লান্ত হাসি হেসে তাকায় মতিবিবির পানে। মতিবিবি বললে, বহুৎচ্ছা! বহুৎচ্ছা!

নূরজাহানের বুক ওঠা-নামা করে নাচ গানের শান্তিতে। লজ্জার সঙ্কোচে। পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে বললে,—লেও বানো।

কাঁচুলীর ফিতে আলগা হয়ে গেছে। বেঁধে দেয় মতিবিবি, পেছন থেকে। ঠোঁট টিপে টিপে পান চিবোয় আর এঁটে সেঁটে বাঁধে। কোমর থেকে রঙীন রেশমী রুমাল টেনে নিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে থাকে নূরজাহান।

বড়বাবু চন্দ্রমোহন সেন মতিবিবির চোখে চোখ রাখতে পারছেন না কিছুতেই! আবার যদি দেখতে পান সেই চোখের ইশারা। ভুল দেখেননি তো চন্দ্রমোহন! হয়তো চোখে কুটো পড়েছিল মতিবিবির! কোথা থেকে এক দুর্বুদ্ধি এসে মাথায় চাপে যেন চন্দ্রমোহনের। হঠাৎ নিজের মনের কাছে শপথ ক'রে বসেন, চোখাচোখি হ'লে তিনিও ঠিক ঐ ধরণের চোখ-ইশারায় ডাকবেন। যদি সাড়া পাওয়া যায়, তখন বোঝা যাবে সত্যিমিথ্যা। আর সাড়াই যদি মেলে তখন আছে তার অন্য ব্যবস্থা।

নাচঘর দেখে ঠাওরানো যায় না, বাইরে রজনী গভীর। ঝাড়লণ্ঠনের আলো আর রূপের আলোয় যেন আলোকময় হয়ে আছে। ফুল, সিগারেট, হুইস্কি আর চপ কাটলেটের গন্ধ ভাসছে নাচঘরে।

বিরতির অন্য নাম বিশ্রাম। নীরব বিশ্রাম যেন সহ্য হয় না এ জাতের ধাতে। হাফ-টাইমের অর্থই যেন চেঁচামেচি আর বিক্ষোভ। নাচ থামতেই তাই বাবুদের চেতনা যেন ফিরে আসে! কথার গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় নাচঘরে। হাতের পাত্র মুখে ওঠে। ঠাট্টা, তামাসা আর হাসাহাসি চললো আবার! কেউ বা কারও গায়ে ঢলে পড়ছেন নেশাধিক্যে।

চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায় যেন। জোড়া জোড়া লোভাতুর চোখ। তাকিয়ে থাকেতো তাকিয়েই থাকে। মাঝে মাঝে সলজ্জায় মুখ নামায়

নূরজাহান। মতিবিবির চোখে এমনই এক যাদু ভরা চাউনি, যেন সকলকেই দেখছে, অথচ কাকেও দেখছে না।

চন্দ্রমোহন বললেন,—সত্যি কথাটা বল'তো, তোমরা হিন্দু না মুসলমান!

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করলো পরস্পরে। ঠোঁট টিপে টিপে হাসলো দু'জনে। জবাব দিলো না কিছু। শুধু হাসে মৃদু মৃদু।

—জাত তুলে কথা কও কেন বড়বাবু!

—জাতে কি বা যায় আসে!

কারা কথা বলেন কোথা থেকে, দেখা যায় না। শুধু শোনা যায় কানে। বাবুদের কেউ কেউ আপন আপন মতামত বলে ফেলেন।

খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন চন্দ্রমোহন।

তাঁর গোপন ইশারার সাড়া মিলেছে তাই যেন হাসি হাসি মুখ। মতিবিবি সাড়া দিয়েছে। শিশুর মত আনন্দের আতিশয্যে অকারণে হাসতে থাকেন নিজের মনে। চন্দ্রমোহন গেলাশ তুললেন মুখে। মুখের সিগারেট নামিয়ে। কে কি বলছে সে-কথায় কান নেই।

মতিবিবি সহাস্যে বলে,—আমরা না হিন্দু, না মুসলমান। আমাদের কোন জাত নেই।

—তোমরা বজ্জাত!

—না না, খাঁটি হিন্দু। গান শুনে বুঝলে না? বাঙলা গান এমন মিঠে গাইতে পারে তাই যদি নাই হয়!

—উর্দ্দু গানও আমরা জানি।

মতিবিবি হেসে হেসে বলে। আসল না নকল কে জানে, তার নাকের নাকচাবি ঠিক হীরার মত আভা ঠিকরোয়।

—আর কি কি গান জান মতিবিবি?

চন্দ্রমোহন বলেন কণ্ঠে প্রেম ফুটিয়ে। নেহাত আপন জনের মত কথার সুর।

—বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, উড়িয়া, আসামী, এমন কি ইংরিজি গানও জানি।

মতিবিবি বলতে বলতে হেসে ফেললো খিলখিলিয়ে। হেসে উঠলো যেন তার উর্দ্ধ দেহ। নাকের হীরা চিকচিকিয়ে ওঠে ঘন ঘন!

—তবে একখানা উর্দ্দু হোক, কি বল'?

চন্দ্রমোহন বলেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। কেমন যেন গা ঘেঁষে বসলেন বাঈজীদের। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নিজেকে এগিয়ে দিলেন।

হঠাৎ কথা হঠাৎ অট্টহাসি। নেশার ঘোরে কখন কে যে কি ক'রে বসেন তার কিছু ঠিক নেই। অন্য মূর্ত্তি যেন আজ বাবুদের। রাঙা চোখ। উড়ু উড়ু ভাবভঙ্গী।

মতিবিবি এক ঝলক হেসে উঠে দাঁড়ালো। সারেঙ্গী ককিয়ে ওঠে আবার। সেই একটানা গোঙানির সুরে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আরেক পায়ে ঝঙ্কার তোলে মতিবিবি। সুরের সঙ্গে তাল মেলায় পা ফেলে ফেলে।

ইতিউতি দেখে আর একটি পা ফেলে ফেলে নূপুরের ঝঙ্কার তোলে মতিবিবি।

চন্দ্রমোহন তৃষ্ণার্ত্ত চোখ। তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টে। রূপসুধা পান করেন যেন।

মতিবিবি ওড়না সরায় কপাল থেকে আর ধীরে ধীরে গান ধরে।

বাবুল মোরা নইহার ছুট্‌হি যায়—
চার কাহারোঁ মিলে ডলিয়া সাজায়ে,
মেরা আপনা বেগানা সব ছুটহি যায়॥

পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে চলেছে মেয়ে। যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে

পিতাকে বলছে,—আমার তো যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। আমার নাঈয়ের কাল হয়েছে শেষ। ঐ দেখো, চার কাহার আমার ডুলী সাজাচ্ছে। খানিক পরেই তো আমাকে চলে যেতে হবে আত্মীয় আর অনাত্মীয়দের ছেড়ে।

বহু পরিচিত গান শুনছেন বাবুরা। গান ধরতে না ধরতে তাঁদের কথা আর হাসিতে ছেদ প'ড়ছে।

খাঁটি উর্দ্দু সুর মতিবিবির কণ্ঠে। নাচের তালে নাচে না। দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকে শুধু। বার বার গায় একটি পঙক্তি বাবুল মোরা নইহার ছুট্‌হি যায়—

মতিবিবির গান গভীর রাতের আকাশ কাঁপিয়ে তোলে। সারা চন্দনপুরে যেন ছড়িয়ে পড়ে তার কণ্ঠ। পিতৃগৃহ ছেড়ে চ'লে যাওয়ার ব্যথা তার মুখে। দুঃখভরা সুর। সারেঙ্গী কাঁদতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। মতিবিবি গেয়ে যায়—

বাবুল মোরা নইহার ছুটহি যায়—
অঙ্গনা তো পর্বত ভয়া
দেহরা ভয় বিদেশ
চল বাবুল তূ ঘর আপনো
ময় চলি পিয়াকী দেশ॥

আবার যে কবে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে, জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে এইমাত্র যে-দেউড়ীটুকু পেরিয়ে এলাম, তা আমার কাছে দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতসদৃশ। আমিতো চললাম পতিগৃহে, তুমি আর আমার সঙ্গে এসে কি করবে? বরং ঘরে ফিরে যাও।

গাইতে গাইতে কণ্ঠ যেন সপ্তমে তোলে মতিবিবি! নাচঘর ফেটে পড়বে না কি! 'বাবুল মোরা' ডাক যেন শোনা যায় অন্দর থেকে।

আকাশের বুক থেকে অন্ধকার গৃহকোণে ছোটাছুটি করে জোরালো গানের সুর। কণ্ঠ কত উঁচুতে তুলতে পারে তারই কি পরীক্ষা দেয় মতিবিবি!

এলোমেলো হাওয়া আসে গভীর রাতের। নির্মল বাতাস চলে রাতের নীরবতায়। লাল ভেলভেটের পর্দাগুলি যেন যুদ্ধ চালায়। বাইরের কোন কিছুকে যেন আসতে দেবে না ঘরে।

'বাবুল মোরা' ডাক যেন চন্দনধামের ইঁট-বেরিয়ে-পড়া দেওয়ালে-প্রাচীরে আছড়ে আছড়ে ফেরে। কাতর স্বরের আহ্বান গানের ভাষায়। পিত্রালয় থেকে পতিগৃহে যাত্রার সময়ে কেঁদে কেঁদে দুঃখ জানায় মেয়ে। শুধু পিতাকে জানায় না, স্বরের কান্না শোনায় যেন সমগ্র পল্লীর আকাশ আর বাতাসকে। প্রত্যেক পল্লীবাসীকে।

অন্দরের এক অন্ধকার ঘরের জানলায় কে এক বধূ। যেদিকে চোখ যায় শুধু কালো আঁধার গভীর রাতের। কোথায় মাটি আর কোথায় আকাশ দেখা যায় না! ঝড়ের মত এলোমেলো হাওয়া চলছে।

ঘরের খোলা-জানলায় সুমিত্রা। রাঙাবাবুর বৌ।

চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন যেন নিদ্রা দেবী। কোথায় ব্যথা সারাবেন, ছ'ড়ে-যাওয়া কনুইয়ে কোথায় ওষুধ লাগাবেন, তার কোন চেষ্টা নেই। অন্দরের ঘরে ঘরে দুয়োর পড়তে, নিজের ঘরের দরজায় ছিটকিনি আটকে খোলা জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

খাটে মেয়ে সুচিত্রা। ঘুমের ঘোরে এখনও যেন শিউরে শিউরে উঠছে। ছোট্ট মেয়ে, নিজের চোখে দেখছে সে, তার মা কাঁদছে। তাজা রক্তের ছাপ দেখেছে মায়ের পরণের সাড়ীতে। দেখেছে তার বাবা রাঙাবাবুর রাগ আর মারাধরা। ক্রোধান্ধ মূর্ত্তি।

আলমারী দেরাজের চাবি চেয়েছিলেন রাঙাবাবু। গালমন্দ আর গায়ে হাত উঠতেও সে চাবি তবু স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারেননি।

সদরে সমন। পাওনাদারের নালিশে সমন এসেছিল রাঙাবাবুর নামে। আদালত থেকে না থানা থেকে ডাক এসেছিল। তকমা-আঁটা পেয়াদা এসেছিল।

পেয়াদার হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে ডাক পিছিয়ে দিতে হয়েছে রাঙাবাবুকে। আর তাই সুমিত্রাকে শেষ পর্য্যন্ত দিতে মেয়ের মুখ-দেখা হাফ-গিনিখানা। চিত্রার জন্মের পর রাঙাবাবু গিনিখানি দিয়ে না কি মুখ দেখেছিলেন।

ঐ ভেসে-আসা গানের সুর যেন উদাস ক'রে তুলেছে সুমিত্রাকে। দেহের ব্যথা ভুলিয়ে দিয়েছে বেমালুম। চিহ্ন থাকলো বা, রক্তের ধারা শুকিয়ে গেছে! শিরশিরে হাওয়ায় থেকে থেকে জ্বলে উঠছে যদিও। কনুই আড়ষ্ট হয়ে আছে সুমিত্রার। অন্ধকারে চোখ মেলে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছেন উদাস মনে। চোখের প্রান্তে শুধু তপ্ত অশ্রু। নীরব কান্না।

কোথায় ফেলে এসেছেন সেই ঘর-আঙিনা! সুমিত্রার মনে পড়েছে হয়তো তাঁর শৈশব আর কৈশোরের বেলাভূমি, যেখানে শুধু স্নেহ আর সোহাগের হাসিভরা কথা। তিরস্কার কাকে বলে জানতেন না।

সুমিত্রার পিত্রালয় প্রবাসে। বাঙলার ভিজে মাটি থেকে অনেক দূরের দেশে। ট্রেণে যেতে যেতেই আড়াই দিন। ভারতের উত্তরপ্রদেশের এক বাঙালী-বিহীন দেহাতী পল্লী—রায় বেরিলীতে। জনার আর ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যিখানে।

মেয়ে জমিদারের ঘরে পড়েছে সেই আনন্দেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সুমিত্রার বাবা। তাই জেনেই নিশ্চিন্ত আছেন তিনি। মেয়ে কোনদিন জানায়নি কোন দুখের কথা। পাছে ভাবনায় ভাবনায় বুড়ো বয়সে কষ্ট

পান সেই ভয়ে একটি দিনের তরেও লেখেনি একখানি এক লাইনেরও চিঠি।

রায় বেরিলীতে ডাক্তারী করেন সুমিত্রার বাবা।

হাজার বিশেক গ্রাম-বাসীর জন্য জনা পাঁচ ছয়ের মধ্যে তিনিই একা বাঙালী চিকিৎসক। সেযুগের এল্, এম্, এস্।

খোলা-জানলায় সুমিত্রা। মধ্যরাতের আকাশে ছাড়া ছাড়া তারা। একলা-সঙ্গী একেকটি ম্লান নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে। এলোমেলো বাতাসে সুমিত্রার কপালের পরে নেমে আসা রুখুচুল নাচানাচি করছে।

রায় বেরিলী বাঙলা দেশ নয়। তা না হোক। হোক ধূলিমলিন, ধূসর, শুষ্ক। বাঙালীর মুখ দেখা যায় না। সেখান থেকে পঞ্চাশ একশো মাইল দূরে চলে গেলেই মিলবে লক্ষ্ণৌ আর দিল্লী, কানপুরের বাঙালী সঙ্ঘ। কালী বাড়ী। দুঃখ কি!

মহালয়া দুর্গোৎসবের বালাই নেই সেখানে। নেই সরস্বতী পূজো আর রবীন্দ্র জয়ন্তীর হিড়িক। সেই দশহরার দিন ওদেশী পরব আছে শুধু।

তা হোক, তবুও সুমিত্রার জন্মভূমি। শৈশব আর কৈশোরের লীলাভূমি।

তখন ফ্রক প'রতেন সুমিত্রা। কিশোরী বয়স। জমিদার ঘরের পাত্র পেয়ে বধূ সাজতে হয় তাঁকে। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে হয়ে যায় অকালে। সুদূর উত্তর প্রদেশের নিরালা গাঁয়ের জনার আর ভুট্টা-ক্ষেত থেকে চলে আসতে হয় স্যাঁতসেঁতে বাঙলা দেশের এক মফঃস্বলের জমিদারবাড়ীর অন্দরে। আজই না হয় ডায়নামোর বিজলী জ্বলছে চন্দনধামে; সুমিত্রা প্রথম যখন আসেন তখন ছিল ঝাড়লণ্ঠনের পালা। তৈলদীপ। এখন এই অবস্থা, চন্দনধামের জাঁকজমকে একদিন আবার মানতে হ'তো। সুমিত্রা দেখেছেন সেই বিত্ত আর বৈভবের প্রাচুর্য্য।

এখন দেখছেন যেন অন্য এক পৃথিবী এই চন্দনধাম—যেখানে এখন অভাব দৈন্য প্রকট।

অন্দরের নাড়ী ধ'রে ব'সে আছেন অনঙ্গমোহন।

ঘুম আসছে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুমও তাঁর আয়ুর মত ফুরিয়ে আসছে। সারারাত ঘুম আসে না চোখে। সেই ভোরের দিকে, যখন ঠাণ্ডা বাতাস চলবে, তখন সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হয়তো ঘুম আসতে পারে।

ইন্‌সম্‌নিয়ার কত ট্যাব্‌লয়েড্ আর ক্যাপ্‌সুল্ খেয়েছেন অনঙ্গমোহন। একটার পর একটাকে পরীক্ষা করেছেন রাতের পর রাত, যদি কাজ হয়!

রুদ্ধদ্বার ঘরে আলো জ্বেলেছেন অনঙ্গমোহন। আরাম কেদারায় এলিয়ে গভীর মনোযোগে দেখছেন ফ্রান্সের এক সাময়িক পত্র। সচিত্র কাগজে আছে নগ্ননারীর আলোকচিত্র।

ঘরের দেওয়ালে ঘড়ি বাজতে শুরু করলে প্রথমে একবার চমকে ওঠেন। নিজের নির্লজ্জতায় নিজে যেন শিউরে ওঠেন। অনুপমার শ্বাস ফেলার শব্দ পান না কি! পরলোকবাসিনীর আত্মা হয়তো আজও মুক্তি পায়নি! অনুপমা সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছিল সকল জ্বালা যন্ত্রনা। মার্গারেটের সঙ্গে মেলামেশার আধিক্য চোখে দেখতে পারলো না অনুপমা।

ঘড়ি বাজতে শুরু করলেই কাগজ বন্ধ ক'রে ফেলেন সহসা। লুপ্ত-যৌবনের আভাষ মিলিয়ে যায় মুখ থেকে। নিভে-যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে নেন আবার।

ঘরের ওয়াল ক্লকে টং টং তিনটে বাজলো। দেখার যেন শেষ নেই! তবুও এক হাতে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাশ! যা অস্পষ্ট তা স্পষ্টতম দেখা যায়।

কোথায় খোলা জানালার কপাট পড়ছে সশব্দে! বেড়াল ডাকছে শিশু-কান্নার মত। গভীর রাতের বাধাহীন হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ। কোটি কোটি বাহু বিস্তারে যেন আষ্টেপিষ্টে জড়াবে চন্দনধামকে!

অন্ধকার ভিয়েনে কুকুরের লড়ালড়ি। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক-ফোকর পেরিয়ে রাস্তার কুকুরগুলো এঁটোকাঁটা খেতে এসেছে গন্ধে গন্ধে। জাতজন্মের ঠিক নেই, তাই মারামারি কাটাকাটি করছে, এক টেবিলে খেতে এসে। মাংস আর মাছের হাড়গোড় কাঁটা-কাণকো যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। একটা কেউ কিছু পারতো আরগুলো কাড়াকাড়ি করতে আসে। কামড়াকামড়ি করে এক টুকরো হাড় নিয়ে। আকাশ কাঁপিয়ে প্রতিবাদ জানায়।

—একটা পেন্‌সিল্ নয়তো কলম দিবি জয়াবৌদি?

দরজা খুলে ঘরে ঢুকে কথা বললে রাধা। বাইরে থেকে দেখেছিল রাধা, ঘরে আলো জ্বলছে। একেবারে বন্ধ নয়, ভেজানো দুয়োর। রাধা আরও জানতো জয়াবৌদি সারারাত্রি ব'সে থাকে অথর্ব্ব অসুস্থ স্বামীর পাশে। রাতে জাগে আর দিনে ঘুমিয়ে নেয়!

জয়ার স্বামী দুরারোগ্য ব্যাধির রোগী। তিনি মৃত না জীবিত দেখে কে বুঝবে। পয়সা খরচা ক'রে সুন্দরী রমণীর দেহ থেকে ব্যাধি কিনেছিলেন তিনি।

—এত রাত্রে কি করবি কলম পেন্‌সিলে?

জয়াবৌদি বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুললেন। এক ময়লা বিছানায় ব'সে ব'সে পড়ছিলেন খবরের কাগজ। পড়বার মত কিছু নেই ঘরে, নেই বইয়ের মত বই। অভাবে তাই কাগজ পড়তে হয় হয়তো।

জয়ার স্বামী তাপসমোহন থাকেন নিদ্রায় অচেতন। মশারীর মধ্যে।

স্নায়ুর মত, নড়াচড়ার শক্তি নেই। মুখে কথা বলতে পারেন না। বেঁচে এক রকম ম'রে আছেন তাপসমোহন। কীটদষ্ট শরীর।

—তোকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, ভাবছিস কেন?

নকল হাসি রাধার মুখে। কথায় যেন জড়তা। ঘুম ঘুম চোখ।

—তোমার মাথা ফাথা খারাপ হয়েছে না কি রাধা ঠাকুরঝি!

হেসে হেসে কথা বলে জয়াবৌদি। বৈশাখের গ্রীষ্মের গভীর রাতে গায়ে আর জামা নেই তাই। শুধু সাড়ীর আবরণ জয়াবৌদির।

—অতশতয় দরকার কি! থাকে তো দাও। রাধা বললে আস্তে আস্তে। কথায় যেন শুধু কোমলতা। অস্পষ্ট হাসি যেন মুখে।

—প্রেমপত্র লিখবে না কি ঠাকুরঝি?

কেমন যেন হেসে হেসে বলে জয়া। বলে,—তাই যদি হয়তো বল' পার্কারটা বের ক'রে দিই। প্যাডের কাগজ খাম দিই! গন্ধ মাখিয়ে দিই চিঠির কাগজে!

ব্যর্থতার ম্লান হাসি হাসলো রাধা। সহাস্যে বললে,—ধ্যেৎ! চাই না আমার কিছু। চললাম আমি।

আঁচল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল রাধা। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল জয়াবৌদির। ঠাট্টার ছলে কথা বলে নিজেই যেন লজ্জা পেয়েছে রাধার বিষণ্ণ মুখ দেখে। কোলের 'পরে নামিয়ে-রাখা বই আবার তুললো জয়া। অনিদ্রার রোগ নেই, তবুও যাপন করতে হয় বিনিদ্র রজনী। রাঙাবাবু দুরারোগ্য ব্যাধির পুরাণো রোগী। কখন কি হয় কেউ বলতে পারে না। প্রথম প্রথম ছিল মেডিকেল কলেজের নারী-নার্স্। রাত্রি কাটিয়ে দিয়ে যেতো সেবা আর শুশ্রূষায়। এখন নার্সের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না জয়া।

সোঁ সোঁ হাওয়ায় খোলা কপাট পড়ছে অন্দরের কোন এক অন্ধকার সিঁড়িতে!

রাত্রি আরও ঘন আর গভীর হ'তে গানের সুর যেন মাঝে মাঝে বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অন্দর থেকেও এতক্ষণে যেন সুস্পষ্ট শোনা যায়, পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যেতে মেয়ে বলছে,—বাবুল মোরা নইহার—।

কোথায় যে এক ফালি চাঁদ লুকিয়ে আছে আকাশে, আর দেখা যায় না। জমাট আঁধার, গানের সুরে আর বৈশাখী বাতাসে যেন থান থান হয়ে যায়। শিশুকান্নার মত বেড়াল কাঁদছে অন্দরে। অমঙ্গলের ডাক ডাকছে যেন গভীররাতে। নালী-নর্দ্দমা ছেড়ে উঠেছে এক পাঁচিলে। খুঁজে মরছে আর ডাকছে একেকবার, বড় বিশ্রী সুরে।

অনেক রাতে যখন আর কোন শব্দ থাকে না সারা নন্দনপুরে, তখন একেক রাতে বেড়ালের ডাক শুনলে আর পড়া এগোয় না জয়াবৌদির। কেমন যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। হাতের বই বন্ধ হয়ে যায় আপনা থেকে।

জয়া আজ রাতে পড়ছে, বাঙলা গল্প সঙ্কলন। আধুনিক সাহিত্যের খ্যাতিমান বিভিন্ন লেখকের লেখা একেকটি উৎকৃষ্ট গল্প আছে বইয়ে। তেরোশো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় করুণরসের লেখা। দুর্ভিক্ষের দুঃখের রূপকথা।

দেখে দেখে, বেছে বেছে বই পড়ে জয়া। পড়ে যত দুঃখের কাহিনী, করুণ রসসিক্ত গল্প-উপন্যাস।

মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না পঞ্চাশে। অনাহারে থেকে পরপারের পারাবারে চলে যাওয়ার নিখুঁৎ চিত্র। মিথ্যা বর্ণনা নেই কোথাও। রাঙিয়ে বলার চেষ্টা নেই। যেমন দেখা তেমন লেখা। মানুষের

মৃত্যুর বাস্তবধর্ম্মী ছবি দেখতে দেখতে না বেড়ালের কান্না শুনে কে জানে, চমকে চমকে ওঠে জয়া। নীরব সহ্যের তিলে তিলে মরণের নগ্নরূপ, কি ভয়ঙ্কর! কি প্রবল সহিষ্ণুতা সমগ্র বাঙালী জাতের। আধুনিক সাহিত্য, লেখায় এতই আকর্ষণ যে আজ পড়তে পড়তে চমকায় বটে জয়া, কিন্তু বই বন্ধ করতে পারে না যেন। চোখ ফেরাতে পারে না, পঞ্চাশের পট থেকে।

—যম আবার কাকে দয়া করেন কে জানে!

অন্দরের কোন্ ঘরের টুকরো টুকরো কথা। কে যেন বললো নিজের মনে। বললে,—এমন রেতের বেলায় বেড়াল ডাকলেই চন্দনধামে কেউ না কেউ—

ঝড়ের আভাষ রাতের বাতাসে।

সহস্র বাহু মেলে ছুটে আসছে হাওয়া। চন্দনধামকে গ্রাস করবে, তাই আষ্টেপৃষ্টে বাঁধতে চায় অদৃশ্য বাহুবন্ধনে। খোলা-জানালার কপাট পড়ছে যখন তখন, যেন অট্টহাসি হাসছে চন্দনধামের অসহায়তায়। জমিদারী চলে যাচ্ছে সরকারের হাতে। যা ছিল সব যেতে বসেছে। বাকী আছে চন্দনধাম, তাও তার পড়োপড়ো যায়-যায় অবস্থা। শরিকরা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। মামলা চলেছে পুরোদমে। চন্দনধামকে কেটে কটে ভাগ করে দিতে হবে, দিতে হবে যার যেমন পাওনা। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত কেউ কিছুই পাবে না, দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবে চন্দনধাম। তখন ঘর-দোর ছেড়ে হয়তো আশ্রয় নিতে হবে গাছতলায়।

বাতাস চলেছে সোঁ সোঁ, না চন্দনধাম দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, ঠিক বোঝা যায় না যেন।

নাচঘরের বাবুদের সকলেই তন্ময়চিত্তে গান শুনছেন আর নাচ

দেখছেন, শুধু মাত্র চন্দ্রমোহন ছাড়া। নূরজাহান যেন মন্ত্র পড়েছে গানের। বশীকরণ করেছে একেকজনকে। হুইস্কির নেশায় কেউ কেউ আর বসতে না পেরে তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছেনে। ঢুলু ঢুলু চোখ বাবুদের। টলো টলো মুক্তি।

বড়বাবু আজ যেন হঠাৎ তাঁর লুপ্তযৌবন ফিরে পেয়েছেন, বহুকাল পরে। জমিদারী হারাণোর শোকে মনমরা হয়ে থাকেন সদাক্ষণ। আজ হঠাৎ তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে কেন কে জানে। জিন আর হুইস্কির উগ্রতম নেশায় কখনও কখনও ক্লান্ত কাহিল হয়ে থাকলেও অন্যদিন অপেক্ষা আজ যেন অনেক বেশী খুশী রয়েছেন। চোখে চোখে কথা বলছেন যেন কার সঙ্গে। অন্য সকলে নূরজাহানের গান শুনে তন্ময় হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বড়বাবুর চোখ নেই তার দিকে।

—বড্ড বেয়াদপি করছে ভাই।

চন্দ্রমোহন ফিস ফিসিয়ে বললেন পাশের একজন অন্তরঙ্গকে। ঠোঁটের কোনে হাসি লুকিয়ে বললেন।

—উসখুস করছে তো? দেখে দেখে চিনেছে, তুমিই মহড়া আগ্‌লেছো!

সারেঙ্গী, গান আর ঝুমুরের রুনুঝুনু আওয়াজে শোনা যায় না অস্ফুট কথা। কইলো কে।

সিগারেটের ধোঁয়ার জাল তৈরী করলেন নিজের মুখের সামনে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চন্দ্রমোহন বলেন,—আসর থেকে ওটাকে যদি আমি তুলে নিয়ে যাই, তোমরা অপোজ করবে কি?

—কক্ষণও নয়। এতে অপোজ করার কি আছে? তবে বড়বাবু, ইউ মাষ্ট্‌ বি ট্যাক্ট্‌ফুল! ক্লেভারলি ম্যানেজ্‌ করতে হবে তোমাকে, কেউ যেন অনুমানেও ধরতে না পারে।

যে কখনও রক্তের ধারা দেখেনি সেও বোধকরি রাগের মাথায় কখনও মানুষ খুন করতে চায়। আর যে পাকাপোক্ত. খুনের লাল রক্তে যার হাত দুটি রাঙানো, সে কেন রক্তপাতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবে! শ্মশানের গাছ ডরাবে কেন মৃতজনদের দেখে!

নূরজাহানের গান শেষ হ'তেই হারমনিয়ম টেনে নেয় মতিবিবি। তার আগে রেশমী রুমালে মুছে নেয় পান-লাল অধর। মুখে তার একমুখ পান। কড়া জর্দা। আর দুষ্টামির হাসি!

চন্দ্রমোহন বললেন,—অনেক্ষণ তো গাওনা নাচনা হয়েছে, এবার বিবিজানরা কিছু খাওয়া-দাওয়া করবে না? রাতও বহুৎ হয়ে গেছে।

কোমর দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো নূরজাহান। গাল গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। বুকের দ্রুত ওঠা-নামায় যেন হাঁফিয়ে কথা বলে। বলে,—বহুৎ জোর ভুখ্ লেগেছে হামার। দ্যান কুছ খানা খাইয়ে দ্যান।

নূরজাহানের কথার ধরণে চপল-হাসি হাসলো মতিবিবি। কেমন যেন অর্থপূর্ণ চটুল হাসি।

বড়বাবু বললেন,—একে একে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। নাচগানে ইতি দিয়ে উঠলে চলবে না।

—যো হুকুম হুজুর!

কথা বলতে বলতে পা বাড়ালো নূরজাহান। সত্যিই যেন সে ক্ষুধাতুর হয়ে আছে। পা বাড়িয়েই আছে। চন্দ্রমোহনের পিছু পিছু চললো নূরজাহান। ঝমাঝম শব্দ তুললো পায়ের ঝুমুরের।

মতিবিবি ফিরে ফিরে দেখলো হারমনিয়ম বাজাতে বাজাতে। কোন্ পথে যে তারা চললো তাই যেন দেখে নেয় কেমন লোভের দৃষ্টিতে। ঘরে আর আর যাঁরা আছেন, তাঁরার দেখলেন ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

হারমনিয়ম বাজাতে বাজাতে হঠাৎ গান ধরলো মতিবিবি। মুখের চটুল হাসি মাখিয়ে গাইলো—

ওলো সই তুইতো একা নয়।
পড়লে ফেরে আপন হারা অমনি সবাই হয়॥
ধরা ধরি মনের ফাঁদে ধরা দিলে কাঁদায় কাঁদে,
বাঁধা পড়ে বাঁধে, এ বাঁধে
ব্যথা দিয়ে, ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, ব্যথা কত সয়॥

গানের স্থর ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল খেমটা। গানের রচনাকার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গান শুনতে শুনতে বাবুদের মধ্যে যেন হাসির হিল্লোল উঠলো। তারিফের মন্তব্য শোনা যায় কারও কারও মুখে। তালে তাল দিয়ে যান কেউ কেউ।

মতিবিবি হেসে হেসে গেয়ে যায়,—ওলো সই তুই তো একা নয়। যেমন জোরালো কণ্ঠ, তেমন স্থস্পষ্ট উচ্চারণ। যেন এক নতুন উদ্যমে গান শুরু করেছে গহরজান। গাইতে গাইতে গলা খুলে গেছে হঠাৎ।

—বহুৎচ্ছা! বহুৎচ্ছা!

মাঝে মাঝে অনেকের সমবেত কণ্ঠে শুধু ঐ এক কথাই শোনা যায়।

বেয়ারা আসে গেলাশভর্ত্তি ট্রে নিয়ে। হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায় বাবুদের। জিন আর হুইস্কি হয়তো ফুরিয়ে গেছে, তাই গেলাশে দেওয়া হয়েছে কুঁইয়া।

—বেয়ারা!

বাবুদের কে একজন কথা বললেন ধমকানির কড়া স্থরে। বললেন, এক চোখ ঈষৎ মুদিত করে বললেন,—বেয়ারা! ষ্টুপিড, নন্‌সেন্স, ওল্ড ফুল্!

—হুজুর !

—রতনবাবুকে বল' ভ্যাট্‌ সিক্স্‌টি নাইন্‌ দেবে।

ম্লানমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বুড়ো বেয়ারা। পুরাণো লোক, বহুদিন সেবা করছে চন্দনধামে। এই জমজমাট ঘরে, এত লোকের সমুখে, গালমন্দ খেয়ে বেয়ারার চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে !

—রাঙাবাবুর এ কি অবস্থা ! স্রেফ্‌ অজ্ঞান ?

কে একজন বলতেই নাচঘরের সকলে সজাগ হয়ে ওঠেন ! মতিবিবির ঊর্দ্ধদেহ থেকে চোখ ফিরলো বাবুদের।

রাঙাবাবু সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছেন। তাকিয়ায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছেন। অধিক নেশায়। চিমটি কাটলেও হয়তো সাড়া মিলবে না তাঁর। অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে রাঙাবাবুকে। আদালতের পেয়াদাকে ঘুষ দিয়ে ভাগাতে কত কিই না করতে হয়েছে তাঁকে। আলমারী আর দেরাজের চাবির গোছা চেয়ে না পেয়ে রাগারাগি আর বকাবকি ক'রেও যখন কোন কাজ হয়নি, তখন সুমিত্রার মত স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে হয়েছে ! মারাধরায় রক্তপাত হয়েছে সুমিত্রার দেহ থেকে। তারপর সুমিত্রাই বাঁচিয়েছে আজকের রাতের মত দেরাজ থেকে একখানা হাফ-গিনি বের করে দিয়ে। সে তার শেষ সম্বল হয়তো মেয়ের মুখ-দেখানি সেই গিনি !

পেয়াদাকে ভাগিয়ে ভগ্নমনে নাচঘরে এসে ব'সেছিলেন রাঙাবাবু। তারপর থেকে এক নাগাড়ে গেলাশের পর গেলাশ কড়া মদ খেয়ে খেয়ে এখন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সম্পূর্ণ নিশ্চেতন হয়ে পড়েছেন।

সামান্য একটু কলরোলের পর আবার যেমনকার তেমনি। রাঙাবাবুকে তুলিয়ে দেওয়া হয় নাচঘরের ফরাস থেকে। রতনদা একাই ধরাধরি করে

নিয়ে গেলেন। হয়তো মাথায় আর পায়ে বরফ দেওয়া হবে রাঙাবাবুর। লেবু কিংবা তেঁতুলের জল হয়তো খাওয়ানো হবে, নেশা ছোটাতে।

বেয়ারাকে গালিবর্ষণ, কে নেশার ঘোরে বেসামাল হয়ে জ্ঞানহারা—কোন'দিকে যেন দৃকপাত নেই মতিবিবির। এক মনে গান গাওয়ার আনন্দে যেন গেয়ে চলেছে,—ওলো সই তুই তো একা নয়।

অন্দরে নিজের ঘরের এক খোলা জানলায় এখনও সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছেন। জেগে জেগে রাত্রি কাটে কত কার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে দেওয়া যায় তাই যেন প্রমাণ করতে চান সুমিত্রা দেবী। বাঙলা দেশ থেকে বহু দূরের উত্তরপ্রদেশের এক দেহাতি গ্রামে আছে সুমিত্রার ফেলে-আসা পিত্রালয়। বছরান্তেও একটিবার যাওয়া হয় না রায়বেরিলীতে। হোক না ফাঁকা অরা ধূলিমলিন গ্রাম ; নাই বা থাকলো সেখানে দোল-দুর্গোৎসবের আনন্দ কোলাহল, নাই বা দেখা গেল বাঙালীর মুখ—তবুও সেটা সুমিত্রার জন্মভূমি। তার ছেলেবেলার লীলাখেলার কত জড়িয়ে আছে রায় বেরিলীর সঙ্গে। সেখানে আছেন সুমিত্রার প্রায়-বৃদ্ধ বাবা আর মা। আর আছে ভাই বোন। কতদিন আর কত রাতে খণ্ড-প্রলয় হয়ে যায়, রক্তপাত পর্য্যন্ত হয়, তবুও যদি চিঠিতে এক ছত্র লিখে জানায় সুমিত্রা! হাজার কষ্টেও এখনও লেখে,—'তোমরা আমার জন্য কেহ ভাবিও না। আমি সুখেই আছি।'

কি নিদারুণ সহ্যশক্তি সুমিত্রাদের! বুক না কি ফেটে যায়, তবুও মুখ ফোটে না। গারদের কয়েদীরাও প্রতিবাদ জানায় মধ্যে মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা একটি দিনের তরেও কিছুই জানায় না, তার বাবা আর মাকে।

কি জানি কেন, ব্যথাতুর দেহে আর কষ্টে কাতর মনে আজ বড় বেশী

ভেসে উঠছে রায় বেরিলী। উত্তরপ্রদেশের রাজস্থানী ধূলো আর জনারের ক্ষেত দিগন্তবিস্তৃত, ভেসে উঠছে যেন বার বার, সুমিত্রার সজল চোখে। রাতের আকাশে চোখে তুলে নীরব কান্না কাঁদছেন অবিরাম !

—রাঙাবৌদিদি !

দরজার বাইরে থেকে কার ডাক শোনা যায়। ধীরে ধীরে কে ডাক দেয় আবার ;—বৌদি, দরজা খুলুন।

বেশ ছিলেন সুমিত্রা। কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিলেন। ডাক শুনে যেন বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। জানলা থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে ভেতর থেকে বন্ধ দরজার কাছে। বলতে হয়,—কে ? কে ডাকছে ?

—বৌদি, আগে খুলুন তারপর বলছি। দেরী করবেন না।

বাইরে থেকে অস্পষ্ট কথা শোনা যায়। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি নয়, সংযত অথচ ব্যগ্র আহ্বান।

বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দিতে হয়। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতে হয়। সামনে কাকে দেখে মাথায় ঘোমটাও টানতে হয়। এবং দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে হয় তখনই।

—কি হয়েছে ওঁর ?

ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন সুমিত্রা।

—কিছু হয়নি। ওভারড্রিঙ্ক, আবার কি! আপনি সরুণ, ওঁকে আমি শুইয়ে দিয়ে যাই।

রতনদা বললেন সহজ সুরে। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন রাঙাবাবু! কোন রকম সাড় নেই, চোখ বন্ধ। রাঙাবাবুর মুখে নেশা আর ক্লান্তির কালিমা।

—ভয়ের কিছু নেই তো ?

ভয়ে ভয়ে শুধোলেন সুমিত্রা। এক পাশে স'রে দাঁড়ালেন।

—না না, ভয়ের কিছু নেই।

খাটের পরে শুইয়ে দিতে দিতে বলেন রতনদা। বলেন,—আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন বৌদি? কাল সকালে আর বোঝা যাবে না কিছু। নেশাটা একটু বেশী হয়ে গেছে।

—নাচঘরের আসর চুকে গেছে রতনঠাকুরপো?

ভয়ে ভয়ে বললেন সুমিত্রা। আকপাল ঘোমটা টানলেন কথা বলতে বলতে।

—না বৌদি! নাচগান চলছে এখনও। চলবে হয়তো আরও খানিক। আপনি ভাববেন না কিছু। রাঙাদার একটু-ওভার ডোজ হয়ে গেলেই আর ঠিক থাকতে পারেন না যে! কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে রতনদা আবার বলেন,—আমি তবে সদরে যাই?

—আমিতো ভেবে ভেবে মরছি এদিকে। যাক, ঘরে আপনি পৌঁছে দিয়ে গেলেন এই রক্ষে! নয়তো কোথায় প'ড়ে থাকতেন কে জানে! সুমিত্রার কথার সুরে প্রচ্ছন্ন ব্যথা।

—আমি যাচ্ছি বৌদি। রতনদা বলেন আর ঘরে থেকে বেরিয়ে অন্দরের গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়ে যান। খাটের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন সুমিত্রা।

বাইরে সজোর হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ। কি এক রাতের পাখী ডাকাডাকি করছে, কোথায় কোন গাছে। যেন বিদ্রূপের ডাক ডাকছে?

দিনের ক্রমবিকাশ দেখা যায় চোখে। রাত্রির পদক্ষেপের কোন শব্দ নেই। নাচঘর দেখলে কে বলবে যে রাত গড়িয়ে এখন শেষের মুখে। দিনের উজ্জ্বল আলো যেন নাচঘরে।

রেশমী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে নূরজাহান ঘরে আসে। তার পেছনে চন্দ্রমোহন। পাহারা দেওয়ার কাজ যেন তার।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ সুরে গান গাইতে গাইতে হয়তো ক্লান্তি জাগে মতিবিবির কণ্ঠে। গান থামতেই ঠেলে সরিয়ে দেয় হারমনিয়ম।

চন্দ্রমোহন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,—এবার তোমার পালা বিবিজান। উঠে পড়, কিছু খেয়ে আসবে চল।

অনিচ্ছা না বিরক্তির কুঞ্চনরেখা দেখা দেয় মতিবিবির মুখে। বলে,—রাত বহুৎ হয়ে গেছে। কিছু খেতে যেন আর মন চাইছে না।

কি এক চোখের ইশারায় ডাকলেন চন্দ্রমোহন। বললেন,—তাই কি হয়! তাই কি হয়! একটু কিছু খেতেই হবে।

যেন নাচের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো মতিবিবি। চললো বড়বাবুর পিছু পিছু। নূরজাহান আবার বসলো হারমনিয়মের সামনে।

সদরের এক ঘর। চারি দিকের জানলা বন্ধ। ভাগ্য ভাল যে বিজলী পাখা ঘুরছে ঘরের কড়িকাঠে। ফরাস বিছানো ঘরের মেঝেয়। অযত্ন আর অব্যবস্থার চিহ্ন রয়েছে ঘরে। ধূলোয় ময়লা ফরাসে।

—এ আবার কোথায় আনলেন বাবু মশাই ?

মতিবিবি ঘরের ইদিক সিদিক দেখে মিহিমিষ্টি স্বরে প্রশ্ন করলে। সহাস্যে। কটাক্ষ হেনে হেনে দেখলো, ঘরের মেঝেয় কলাপাতায় লুচি, মাংস, চপ, কাটলেট আর মিষ্টি।

—তোমাকে যে খাইয়ে দেবো আমি। অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রমোহন বলেন। কথা বলতে বলতে নিজের হাতের একটি আঙটি খুলে তুলে ধরলেন। বললেন,—এটি তোমাকে পরিয়ে দেবো। দেখি তোমার হাত।

মোমের মত নধরনরম হাত তুললো মতিবিবি। খুশীর হাসি ফুটলো

তার মুখে। আঙটি দেখে যেন আনন্দে উপচে পড়লো। চার রতি মুক্তোর আঙটি মতিবিবির হাতের আঙুলে পরিয়ে দিলেন বড়বাবু। বললেন,—এটি তুমি নিয়ে নাও। ফেরৎ আর দিতে হবে না।

হাতে হাত পেয়ে যেন আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। চাঁপার কলির মত মতিবিবির হাতের আঙুল। মোমের মত নরম হাত। মতিবিবি হেসে হেসে বললে,—আপনি বুঝি সবার ওপরে?

—হ্যাঁ। কোথা থেকে জানলে তুমি?

—দেখে দেখে চিনেছি যে। আমরা একবার দেখলে সব বুঝতে পারি।

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো তুমি। কিন্তু, এখন আর ছাড়ছি না তোমাকে।

প্রতিবাদ জানায় না মতিবিবি। কোন রকম আপত্তি প্রকাশ করে না। সাহস মুখ তার। চটুল হাসি যেন মুখে আর চোখে। হেসে হেসে মতিবিবি বলে,—একটি হাতের মত ধ'রে রেখে কি আর পাবেন বাবু মশাই?

—যা পাই তাই লাভ।

কথার শেষে হঠাৎ দুই বাহুতে মতিবিবিকে যেন বেঁধে ফেললেন চন্দ্রমোহন, সাহসে বুক বেঁধে। বললেন,—বল' দেখি সত্যি কথা, তোমরা হিন্দু না মুসলমান?

হেসে ফেললো মতিবিবি। এক ঝলক হাসি হেসে বললে,—আপনি তো অনেক দেখেছেন, আপনিই বলুন না কেন।

নিবিড় আলিঙ্গন নিবিড়তর হয়। চন্দ্রমোহন বললেন,—ঠিক ধরতে পারছি না আমি।

আবার এক ঝলক হাসলো মতিবিবি। পান-লাল ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বললে,—আমরা হিন্দু, নাম নিয়েছি মুসলমান। তা না হ'লে যে ব্যবসা চলে না আমাদের।

—তবে আমার আন্দাজ মিথ্যে নয়। ঠিকই ধরেছি আমি।

কথা বলতে বলতে মতিবিবির মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যান চন্দ্রমোহন। নিবিড়তর বাহুবেষ্টন নিবিড়তম হয়।

মতিবিবি ফিসফিসিয়ে বলে,—দরজাটা খোলা রয়েছে।

স্বর্গের পথে যেন চলেছিলেন চন্দ্রমোহন। মুক্তদ্বার বন্ধ করতে এগোলেন, ফরাসে মতিবিবিকে বসিয়ে দিয়ে। ধীরে ধীরে বন্ধ করলেন দুয়োর। ভেতর থেকে অর্গল তুলে দিলেন।

তমসাচ্ছন্ন রাতের আকাশে কি এক রাতের পাখী উড়লো ডাকতে ডাকতে। পাখীর ডাকে যেন বিদ্রূপের হাসি! সারেঙ্গী আবার কেঁদে উঠলো নাচঘরে।

কিছুকাল অতীত হয়ে যায়।

সেদিন সকালে চন্দনপুরের মানুষ যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে গানের সুরে নয়, প্রচণ্ড জোরালো যান্ত্রিক শব্দে। চন্দনপুরের যত দামাল কিশোরের দল ভিড় জমায় চন্দনধামের আশপাশে। গ্রামের লোক কৌতূহলী হয়ে ঘরের কাজ ফেলে বাবুদের বাড়ীর সমুখে ভিড় জমায়।

চন্দনধামের ফটকে সেদিন আর দেখা যায় না প্রথম মহাযুদ্ধের যোদ্ধা দিলবাহাদুরকে। সঙ্গীন হাতে সামরিক কায়দায় পায়চারী করে না ফটকের সামনে। মেশাপটামিয়ায় রণক্ষেত্র-ফেরৎ দিলবাহাদুর বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছিল। বারুদের গন্ধে একদিন মাতাল হয়ে উঠতো, ঘ্রাণশক্তি নেই এখন আর। পল্টন দিলবাহাদুর চিরকালের মত ছুটি পেয়ে দূর নেপালের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। ক'মাসের মাইনে না পেয়ে হঠাৎ এক ভোরে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে চলে গেছে সকলের অলক্ষ্যে। চন্দনপুর ষ্টেশনে

ট্রেনে উঠে শেষ স্যালুট দিয়ে গেছে সে। চলন্ত ট্রেনের পিছনে বিন্দুর আকারে মিলিয়ে গেছে চন্দনধামের মত বিশাল প্রাসাদপুরী।

সেদিন চন্দনপুর কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে।

গ্রামের যত লোক আর দামাল শিশুর দল কাতারে কাতারে ভীড় জমায় চন্দনধামের আশপাশে।

শহর থেকে লোক আসছে পিঁপড়ের সারির মত। ভোরের রাঙা আলো ছড়িছে তখন চন্দনধামের শিখরে। শহর থেকে আসছে যত সব বিশ্বকর্ম্মার বংশধর। তাদের হাতে ঝুড়ি, কোদাল, কর্নিক আর দুরমুশ। পাল পাল কুলীর দল টেনে আনছে গুরুভার রোলার। সব আগে পৌছে গেছে কয়েকটা অদ্ভুতাকৃতি যন্ত্র। মানুষের চেয়ে নাকি বড় কর্ম্মী তারা, অনেক বেশী শক্তিমান। কংক্রীটের গ্রাইণ্ডিং মেশিন আর ডিনামাইটের ব্যাটারী। মোষের গাড়ী আসছে একের পর এক। আসছে লম্বা লম্বা শালের গুঁড়ি আর রাশি রাশি বাঁশ। যেন সুদীর্ঘ এক ক্যারাভান আসছে শহর থেকে, যার শেষ নেই।

শোলার টুপি মাথায় ক'জন ইঞ্জিনিয়ার আর ওভারসিয়ার পৌছে গেছে সেই ভোর থাকতে। চন্দনধামের মানচিত্র খুলে বসে গেছে শলা-পরামর্শ করতে। নীল রঙের প্লান, চন্দনধামের এ্যানাটমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়।

চন্দনপুরের আকাশে হঠাৎ কামানের গর্জ্জন।

সশব্দে মূলচ্ছেদ হয়ে পড়েছে মহলের পর মহল। ডিনামাইট চার্জ্জ করা হচ্ছে জনশূন্য চন্দনধামে। খিলানের পায়রাগুলো উড়ে পালাচ্ছে

বিশ্রীর শব্দটা শুনে। প্রাকৃতিক বজ্রপাতের চেয়ে যেন ভীষণ। তাতে খড়ের বাসা আর নবজাতক শাবকপাল খ'সে পড়ছে, মিশে যাচ্ছে ধ্বংস-স্তূপে। চূর্ণ, বালি আর ইটের গাদায়। দেওরাল প্রাচীর ধ্ব'সে পড়ছে সশব্দে। ঘরের কাঠের ঘুনধরা কড়ি ছটকে ছিটকে পড়ছে। ব্যাটারীর সাহায্যে ডিনামাইট চার্জ্জ করা হচ্ছে একের পর এক। হাজার হাজার কুলীর কাজ করছে সামান্য ক'টা ব্যাটারী। একবারে যখন মাটির সঙ্গে যখন মিশে যাবে চন্দনধাম, তখন এগোবে কুলী আর মজুরনীর দল। ভিতরে মাটি তুলতে হবে। শালগাছের গুঁড়ি পোঁতা হবে।

কুলীর দলে হঠাৎ কলরব উঠলো একটা। সজোর চীৎকার।

জনতাও ছুটলো সেদিকে। ছুটলো দস্যি ছেলের দল। কিন্তু বাধা পড়লো। হাত উঠলো। ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি এগোতে দেওয়া হবে না কোন লোককেই!

কুলীরা হঠাৎ দেখতে পেয়েছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি জীবন্ত মানুষ আহত হয়ে পড়ে আছে। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত, মুখের দু' দিকে রক্তের ধারা নেমেছে তার। প'ড়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

চন্দনধামের বয়োবৃদ্ধ অনঙ্গমোহন লুকিয়ে ছিলেন দোতালার এক ঘরে। বাড়ী বিক্রী হওয়ার পরেও কোন রকমে ক'টা দিন থাকতে চেয়েছিলেন। সকলে চলে গেছে চন্দনধাম ত্যাগ ক'রে, শুধু তাঁকে কেউ নিয়ে যায়নি। একমাত্র ছেলে মনিমোহন থাকলেও না হয় একটা যা হয় উপায় হয়ে যেতো। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগ মণিমোহনকে একদিন গ্রেপ্তার করেছে ইতিমধ্যে। নোট জালের দায়ে ধরা পড়েছে মণিমোহন!

মুঠোয়-ধরা সিগারেট সজোরে টান দিয়ে বামচক্ষু বুজে চাপা

গলায় অর্ডার দিলো এক কোটিপতি গুজরাটী। বললে,—গো অন্, কাম চালাও। কাজ বন্ধ্ মাৎ করো শালা শূয়ারলোগ!

ওদিকে তখন আবার কামানের গর্জ্জনধ্বনি! ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। বজ্রপাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ। চন্দনপুরের আকাশে উড়ছে বনেদী ধূলো। অনঙ্গমোহনের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ আর শোনা যায় না এই প্রলয়লীলায়।

ম্যাঞ্চেষ্টারকে চ্যালেঞ্জ ক'রে আবার কাপড় জোগানো হবে সারা ভারত আর ভারতবাসীকে। চন্দনপুরের শ্যামল মটিতে মিল তৈরী হবে কয়েকটা।

সকল শব্দ ছাপিয়ে কিন্তু শোনা যায় ঐ কোটিপতি গুজরাটীর হুকুম-নির্দ্দেশ। মুঠোয়-ধরা সিগারেটে টান দিয়ে বামচক্ষু বুজে অর্ডার দেয় মিল-মালিক,—গো অন্, কাম চালাও!

কে আবার নেয়, মরা মানুষের ভার! খুনের দায়ে ধরা পড়তে হবে না? ক্ষতিপূরণ দাবী করবে না মৃতের পরিবার! তার চেয়ে বরং ভাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কবর দেওয়া। তাই বা কে দেয় বেওয়ারিশ লাশের! ক্ষতি কি মিলের কঠিন ভিতে তার চেয়ে থাকে যদি ক'ফোঁটা ফিউডাল রক্ত!